বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সীতারাম

টীকা টিপ্পনী ও বিশদ ভূমিকাসহ

*   *   *   *

সম্পাদন :

অধ্যাপক শ্রীরঙ্গিনচন্দ্র হালদার

এবং

অধ্যাপিকা শ্রীঅরুণা হালদার

এ. [illegible]খার্জী এণ্ড কোং লিঃ

প্রকাশক : শ্রীঅমিয় রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
মুদ্রক : শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস, ২নং ন্যায়রত্ন লেন,
কলিকাতা

১৯৬০

মূল্য তিন টাকা মাত্র

বঙ্কিমচন্দ্র

(১৮৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিম জন্মিয়াছিলেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়া গ্রামে। নৈহাটী জংশনের পূর্বদিকে 'বঙ্কিমভবন' রেলগাড়ী হইতে বসিয়াও দেখা যায়। তাঁহার পিতা ছিলেন যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সঞ্জীব নিজে সুলেখক মজ্‌লিসী মানুষ ছিলেন; আর তিনিই ছিলেন বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের প্রধান উৎসাহ-দাতা;—শ্রোতা, পরামর্শদাতা, গর্বিত অগ্রজ। শুনা যায় শৈশবে বঙ্কিম একদিনেই বাঙলা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ': কিন্তু সাহিত্য-চর্চায় বঙ্কিমের হাতেখড়ি হইয়াছিল দীনবন্ধু মিত্রের মত—ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'। প্রভাকরে তিনটি কলেজীয় স্ফুটনোন্মুখ লেখকে কাব্যযুদ্ধ চলিত,—বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু এবং দ্বারকানাথ অধিকারী। সে কালের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার নাম হয় 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ'। বঙ্কিমের সেই সময়কার 'পদ্যাবলী' ঈশ্বরগুপ্ত-প্রভাবিত গতানুগতিক নিষ্প্রাণ সৃষ্টি। তখনো বাঙলা আধুনিক কবিতার বনিয়াদই তৈয়ারী হয় নাই, তাই অসাধারণ কাব্য প্রতিভা ও অসামান্য প্রয়াস না থাকিলে সেই সময়ে কেহ এখনকার বিচারে 'চলনসই' কবিতাও লিখিতে পারিত না। আজ যে-কোনো সাধারণ পদ্যকারকেও মনে হইবে বঙ্কিম-দীনবন্ধু অপেক্ষা কবি-শক্তিতে বড়। আসলে কারণটা তাহা নয়। রবি-প্রতিভার প্রোজ্জ্বল আলোকে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য গত কয়েক দশকের মধ্যে কয়েক যুগ অতিক্রম করিয়াছে। তাহার ভিত্তি আজ সুদৃঢ়, তাহার যে স্তরে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, সেখানে ব্যঞ্জনাময় বাগ্‌বিন্যাস ও ভাববিস্তার একেবারে মাতৃদুগ্ধের মতই আমাদের পক্ষে সহজলভ্য। বাঙলা কাব্য-সাহিত্য অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে বঙ্কিমের প্রয়াসে গঠিত হয় নাই, কিন্তু বঙ্কিম আধুনিক বাঙলা সাহিত্যেরই প্রধান ভিত্তি-স্থাপয়িতা,—তাঁহার কাব্য-সমালোচনায়, সাহিত্য-সমালোচনায় পরবর্তীদের দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন হয়, আর তাঁহার রসসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে বাঙলা

গদ্য-সাহিত্যের এবং পরোক্ষভাবে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যেরও নূতন প্রভাত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মনে রাখা প্রয়োজন—বঙ্কিমের পরবর্তী কালের কবিতা ও গীত-রচনা (আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' গীত ও মৃণালিনীর তিনটি কবিতা) মোটের উপর সার্থকসৃষ্টি।

প্রথম বি-এ : ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করেন। সেই বৎসরই প্রথম বি-এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হয় এবং মোট দুইজন ছাত্র উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট্, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের একটা বড় গৌরবের কথা। সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয় তাহা স্মরণ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছে।

চাকরি জীবন : সেদিনকার সরকারের আশ্বাস মত বঙ্কিম পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-পদে নিযুক্ত হন। তৎকালীন দেশীয় লোকের পক্ষে ইহা বড় চাকরি, বঙ্কিমেরও জীবনযাত্রা ইহাতে স্বচ্ছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু এই তেজস্বী পুরুষ বিদেশীয় সরকারের দাসত্বের গঞ্জনা কখনো ভুলিতে পারেন নাই। আবার, এমন শক্তিধর পুরুষ এই চাক্‌রির অলক্ষিত প্রভাবে ও নিয়মেই বিদেশী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট করিয়া আপনার বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারেন নাই,—নিজের বুকের জ্বালাকে প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহাকে অহিফেনসেবী 'কমলাকান্তের' ছদ্মবেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুদ্ধারই যে ভারতের আত্মশক্তি ফিরিয়া পাইবার পথ ও মুক্তির পথ, জাতীয়-আন্দোলনের প্রথম পুরোধাদের মত এই বিশ্বাসই বঙ্কিম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই মুসলিম যুগ সম্পর্কে তাঁহার সাহিত্যে কিছু দ্বিধা আছে। কিন্তু এ জন্য বঙ্কিমকে সম্পূর্ণ অপরাধী করা যায় না। বিজয়ী ইংরেজ বিজিত মুসলমানের যে নিন্দাপূর্ণ কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, তাহার প্রভাবও অনিবার্যভাবেই বঙ্কিমের উপর আসিয়া পড়ে। কিন্তু তিনি মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন—এ অভিযোগ মূলত স্বীকার করা চলে না। হিন্দু-সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির অনুধ্যান করিতে গিয়া পরাজিত জাতির অন্তর্জ্বালা কখনো কখনো হয়তো তাঁহার লেখনীতে একটু তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তবু এ কথা মানিতেই হইবে যে তাঁহার শিল্পক্ষেত্রে উদারচেতা, বীর্যবান মুসলমানদের অভাব নাই।

সরকারী চাকুরে হিসাবে অনেকক্ষেত্রে তাঁহাকে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে পড়িয়াই

লেখনী নিয়ন্ত্রণ করিতে হইয়াছে। প্রয়োজনমতো তাঁহার স্পষ্টভাষিতাকে সীমাবদ্ধ করিতে হইয়াছে তির্যক শ্লেষোক্তির মাধ্যমে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, বঙ্কিমের স্বদেশানুরাগ—হিন্দুপ্রেম ও মুসলমানবিদ্বেষের একটি যোগফল নয়—ইংরাজকেও তিনি সর্বদা প্রত্যক্ষ শত্রু মনে করেন নাই। তাঁহার দেশাত্মবোধ অধ্যাত্মবাদের দ্বারা নির্দেশিত, বিশ্বাত্মবোধের সহিত সম্মিলিত, তাঁহার আদর্শ জীবানন্দ, ভবানন্দ নয়, সত্যানন্দ। বঙ্কিম-সম্পাদিত ১২৮৫ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র পৌষ সংখ্যায় 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, কালিদাস ও বায়রণের উপর যে তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশিত হয়, তাহাতে এই সত্যই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাই হিন্দু-সভ্যতার স্বপ্ন-সন্ধানী এবং বিদেশী শাসনের অপমানে মর্মপীড়িত বঙ্কিম সমস্যা-সমাধানের যে পথ ভগবদ্‌গীতার মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা মণ্ডিত গীতোক্ত কর্মযোগের রসায়নে রসায়িত। তাঁহার সাহিত্যের ফলশ্রুতিতে বিদ্বেষ নাই—তাহা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের শান্তি দ্বারা অভিষিক্ত।

সাহিত্য জীবন—বঙ্কিমের প্রধান কীর্তি বাঙলা গদ্যসাহিত্য-সৃষ্টি। ইংরেজি 'রাজমোহন্‌স্‌ ওয়াইফ্‌' নামক অসমাপ্ত উপন্যাসটি ছাড়িয়া তিনি প্রথম বাঙলা উপন্যাস রচনা করিলেন 'দুর্গেশনন্দিনী'। উহা ১৮৬৫তে প্রকাশিত হয়। এক মুহূর্তে বঙ্কিম বাঙলা সাহিত্যের প্রধান ঔপন্যাসিক বলিয়া পরিগণিত হন—অবশ্য তাহার পূর্বেই মধুসূদনের অপূর্ব প্রতিভা কাব্য-জগৎ আলোকিত করিয়াছে (১৮৫৯—৬১), এবং দীনবন্ধুও নাটক রচনা ('নীলদর্পণ', বেনামীতে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯-এ) করিয়া সেই জগৎকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে বাঙলা সাহিত্যের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৭), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ইহার পরে নূতন প্রত্যাশাকে বাড়াইয়া দিল।

বঙ্গদর্শনের যুগ—তারপর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমের সাহিত্যিক জীবনের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ইহারই পাতায় প্রথম প্রকাশিত হইতে লাগিল বঙ্কিমের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। 'বঙ্গদর্শনে'র এই যুগ বঙ্কিমের জীবনেরও মধ্যাহ্নকাল, আর বাঙলা-সাহিত্যে 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব যে কত বড় ঘটনা, তাহা তখনকার দুইজন তরুণ পাঠকের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি—সে পাঠকের একজন রবীন্দ্রনাথ

অপরঞ্জন রামেন্দ্রসুন্দর। কত কল্পনা, কি অধীর আগ্রহ লইয়া তখনকার এই পাঠকেরা "বিষবৃক্ষ" প্রভৃতি পড়িবার জন্য মাসের পর মাস অপেক্ষা করিতেন, আজ আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী', যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি চলে বঙ্কিম-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর। আর সঙ্গে সঙ্গে মাসের পর মাস 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যের নব উদ্বোধন চলিতে থাকে। সেই সবল ব্যক্তিত্ব আপনার মনীষা, মর্যাদা-বোধ, এবং সাহিত্যিক সূক্ষ্ম রসবোধ ও শিল্পজ্ঞান—সমস্ত দিয়া বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের প্রায় নূতন এক মানদণ্ড স্থির করে। বলা বাহুল্য, এই মানদণ্ড আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের (বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যের) আবিষ্কার—সংস্কৃত আলঙ্কারিকের কাব্যাদর্শ ও কাব্য-কৌশল নয়, প্রাচীন কোনো সাহিত্যেরই প্রস্তুত মানদণ্ড নয়। কিন্তু বঙ্কিম তাহা এমনি করিয়া অনুধাবন করিলেন, এবং সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যদৃষ্টির এমনি সঙ্গতি সাধন করিলেন যে, ইহার পরে বাঙলা সাহিত্য-সৃষ্টিতে আর কেহ মুখ্যত প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতি-নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইবার কথা ভাবিতে পারিলেন না; বাঙলা ভাষায় পৃথিবীর সর্বগ্রাহ্য রস পরিবেশনের পক্ষে কাহারও আর বাধা রহিল না। বাঙলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আসন গ্রহণের প্রবেশপত্র সংগ্রহ করিল।

বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবন :—কিন্তু ইহার মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন অসঙ্গতি ছিল—আর তাহাও বঙ্কিমের সূক্ষ্ম বোধশক্তিকে এড়াইয়া যায় নাই। পাশ্চাত্ত্য আধুনিক সাহিত্য ও উহার সাহিত্যিক মানদণ্ড আধুনিক কালের পাশ্চাত্ত্য সমাজের জীবনযাত্রার তাগিদেই নির্ধারিত হইয়াছে। উহার পিছনে অবশ্য গ্রীক-রোমক-হিব্রু ত্রিধারার কিছু উপাদান আছে, কিন্তু উহার আসল ভিত্তিভূমি পাশ্চাত্ত্য সমাজে বণিক-শ্রেণীর জাগরণ, তাহাদের রাজক্ষমতা লাভ—আর জাতীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের 'মানুষের অধিকার' (Rights of Man) সম্বন্ধে সমাজে নূতন চেতনা ও নূতন ব্যবস্থা। ইংরেজের ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান হইতেই আমরা এগুলির সাক্ষাৎ পাইলাম এবং ইহাদের স্পর্শে আমাদের সাহিত্য-প্রয়াস শতধারে উৎসারিত হইল। অথচ ইংরেজ-শাসনের ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে

এই সব ব্যবস্থার প্রয়োগ দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া রহিল। কোথায় জাতীয় স্বাধীনতা, মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের সুযোগ আমাদের! পরাধীনতায় পঙ্গু জাতি আপনার জীবন হইতে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো মহৎ সৃষ্টিরই রস-সংগ্রহ করিতে পারিল না। বঙ্কিম অনুভব করিতেছিলেন—আমাদের সৃষ্টি যতই নূতন ও সার্থক হউক, উহার মূলে মাটি নাই, জীবনের রস তাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে সঞ্চারিত হয় না।

'প্রচারের' যুগ :—এই মৌলিক অসঙ্গতি ঔপন্যাসিক রসসৃষ্টির কালেও বঙ্কিম অনুভব করিতেছিলেন; তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ জাতীয় মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করিয়া স্বস্তি পাইতেছিল না—এই কারণেই প্রথমাবধিই তিনি 'বাঙালীর ইতিহাস' ও 'বাঙালীর গৌরব' আবিষ্কারে উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। এই জন্যই দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি, সভ্যতা, সাহিত্য, সব কিছুকে তিনি আধুনিক (পাশ্চাত্ত্য) বিচারবোধের দ্বারা অম্লান, উজ্জ্বল, সুমহৎ প্রমাণ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। ইহারই বিশিষ্ট প্রকাশ বঙ্কিমের জীবনের তৃতীয় যুগে দেখি। সেই যুগটি 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) 'সীতারাম' (১৮৮৭) এই তিনখানি এক পর্যায়ের প্রধান উপন্যাসের সৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল।

এই তিনখানি উপন্যাস তাঁহার প্রচারধর্মিতার স্বাক্ষরও বহন করে। ১৮৯৩ সালে তৃতীয় সংস্করণ 'রাজসিংহে'র প্রকাশ—বঙ্কিম ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপে আখ্যা দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমের এই প্রচার-যুগ আরম্ভ হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর; 'বঙ্গদর্শন' ইহার মধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর বঙ্কিম 'প্রচার'-পত্রের সম্পাদনা গ্রহণ করেন। এই 'প্রচারে'ই তাঁহার 'সীতারাম' প্রকাশিত হয়। প্রচারক ও গীতাতত্ত্বের প্রবক্তা হিসাবেই বঙ্কিমের ইহ-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে।

বঙ্কিমের হিন্দুত্ব—'প্রচার' ও অক্ষয়কুমার সরকার পরিচালিত 'নবজীবনে' বঙ্কিম যে ব্রত গ্রহণ করেন—তাহা মূলত "স্বাদেশিকতা'র ব্রত; কিন্তু উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুইটি। প্রথমত—বিশুদ্ধ বা আদর্শ 'হিন্দুধর্ম' ব্যাখ্যা। বঙ্কিমের মতে 'হিন্দুধর্ম' আর কিছু নয়, গীতার 'নিষ্কাম ধর্ম' বা 'কর্মযোগ', আর এইরূপ ধর্ম বা কর্মযোগই আসলে অনুশীলন বা কালচারের

মূল কথা—মিল-কোঁৎ-বেন্থাম-সীলি প্রভৃতি সমকালীন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরাও যাহার অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের কথা চিন্তা করিতে পারেন নাই। এই আদর্শ ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যান করিয়া ব্যক্তি ও জাতির জীবনেও রূপায়িত করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই ভারতীয় ভাবধারার আদর্শ মানব। বঙ্কিম ইহার ব্যাখ্যা করেন 'অনুশীলন তত্ত্ব', 'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রভৃতিতে, এবং ইহা সাহিত্যে রূপলাভ করে 'আনন্দ মঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'।

বঙ্কিমের বাঙালীত্ব :—বঙ্কিমের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল—'বাঙ্গালার কলঙ্ক-মোচন'। হিন্দু হিসাবে সমগ্র ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকার লইয়া বঙ্কিম গর্বিত বোধ করিতেন।

তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' গানে তিনি বিশেষভাবে সুজলা বঙ্গমাতার রূপেরই ধ্যান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহার ব্যঞ্জনা নিঃসন্দেহে সমগ্র ভারতবর্ষকেই দ্যোতিত করে, সপ্তকোটির সংকীর্ণার্থ অতিক্রম করিয়া চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়কেই অভিব্যক্ত করে। এই সঙ্গীতের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার সন্ধান পান, তাঁহারা একটি ঐতিহাসিক তত্ত্বকে লক্ষ্য করিতে পারেন না—জাতীয়তার প্রথম উদ্বোধনে স্বাধীনতা-বোধের সহিত হিন্দুত্ব বোধের অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ অপরিহার্য ছিল। নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা' হইতেই ইহা প্রমাণিত। এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমের নিকট হইতে পূর্ণ জাতীয়তাবাদের সমর্থন আশা করা বিড়ম্বনা, তাহা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত বিরোধী।

বঙ্কিম কি মুসলমান-বিরোধী ছিলেন? এ সম্পর্কে মতভেদ অপরিহার্য। হিন্দুত্বের উপাসক হিসাবে তাঁহার কিছুটা আচ্ছন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে, তাঁহার প্রচেষ্টা আক্রমণাত্মক নয়—আত্মরক্ষামূলক। এই আত্মরক্ষার প্রেরণা-হেতু হয়তো তিনি কিয়ৎ পরিমাণে অভিযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আর একটু সতর্কভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, তিনি আসলে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছেন বিজয়ী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে, অক্ষম রাজতন্ত্রের বিপক্ষে। সাধারণ মুসলমানের উপর তাঁহার বিশেষ কোনো আক্রোশ নাই—তিনি আর যাই হোন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-তন্ত্রের প্রবর্তক বা পরিপোষক নন।

বঙ্কিমের দান :—বঙ্কিম-সাহিত্য-দর্শনের সম্পর্কে কাহারও কাহারও কিছু মতভেদ থাকিলেও একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার দান অপরিমেয় অতুলনীয়। তাঁহার হাতেই বাঙলা ভাষা ও বাঙলা গদ্যসাহিত্য

গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চিন্তায় যুগোচিত অস্পষ্টতা কিছু থাকিলেও তাহাতে পুরুষোচিত বলিষ্ঠ বিচারবুদ্ধি আছে : তাঁহার সৃষ্টিতে হিন্দুত্বই প্রধানত উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও সেদিনের হিন্দুয়ানী তাহাতে প্রশ্রয় পায় নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে মানুষকে সর্বাগ্রে মানুষ বলিয়া বুঝিবার চিনিবার ও স্বীকার করিবার যে দাবী তিনি তুলিলেন, তাহাতে প্রাচীন সমাজের মধ্যে বিপ্লবের ছোঁয়া লাগিল, সেই সমাজের নূতন দৃষ্টিও খুলিয়া গেল,—যদিও এই দৃষ্টি লাভ করিল সেই যুগের বঙ্কিমের পাঠক মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী, কিন্তু এই 'দৃষ্টিদান', মানুষকে ব্যক্তি বলিয়া অবধারণ, একটা বিরাট, সুমহৎ সামাজিক কর্ম নয় কি ?

শুধু ইহাই নয়। বাংলা-সাহিত্যের প্রথম কলাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। রুচিবিগর্হিত 'fun'-এর পঙ্ক হইতে মেধাদীপ্ত নির্মল wit এবং humour-এর সৃষ্টিকর্তাও তিনিই। তাঁহার হাতেই বাংলা-ভাষা সাহিত্যের তীর্থসলিলে প্রথম শুচিস্নান করিয়াছে। অসীম শক্তি, অসামান্য মনস্বিতা এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বঙ্কিম বাঙালীর রেনেসাঁস্'-এর একজন প্রধান পুরোহিত। মাইকেল, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ—এই ত্রিস্তম্ভই বাঙলার বাণী-মন্দিরকে সগৌরবে ধারণ করিয়া আছে।

'সীতারাম' বঙ্কিমের পরিণত বয়সের রচনা—'আনন্দমঠ' (১৮৮২) 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭), এই তিনখানি উপন্যাস 'ত্রয়ী' বলিয়া খ্যাত। এই 'ত্রয়ী' লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। অন্তত 'সীতারামের' মনোযোগী পাঠক অন্য দুইখানি উপন্যাস না পড়িয়া পারেন না। ইহার মধ্যেও আবার 'দেবী চৌধুরাণী'র সঙ্গেই 'সীতারামে'র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। 'আনন্দমঠে' যে ভাবনা দানা বাঁধিতেছিল তাহা এক হিসাবে সম্পূর্ণ হইয়াছিল এই দুইটি উপন্যাসে। 'সীতারাম'ও পূর্বোক্ত দুইখানির ভাবধারারই বাহক—ইহা বঙ্কিম নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তখন 'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, প্রফুল্ল নিষ্কামকর্মের পাঠ লইয়া রাণীর ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া পল্লীগৃহে, 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী' হইয়াছেন—সেই ১৮৮৪ সালের জুলাই মাসেই (শ্রাবণ, ১২৯৯) প্রথম সংখ্যা 'প্রচার' প্রকাশিত হয়। উহার প্রথম সংখ্যা হইতেই 'সীতারাম' আত্মপ্রকাশ করে। এই সংখ্যাতেই অন্য দুইটি প্রবন্ধও বঙ্কিম লিখিয়াছেন—'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ও 'হিন্দুধর্ম'। 'সীতারামে'র ভাববস্তু ও

কথাবস্তু যে কি তাহা এই প্রবন্ধ দুইটি হইতেও অনুমান করা যায়। যত্নশীল পাঠক নিশ্চয়ই প্রবন্ধ দুইটি বঙ্কিমগ্রন্থাবলী হইতে পাঠ করিবেন ('বাঙ্গালার কলঙ্ক'—'বিবিধ প্রবন্ধ' ২য় ভাগ পঃ সঃ ৩১৪-৩১৫ ; 'হিন্দুধর্ম' পঃ সঃ—'বিবিধ' পৃ ১৮৭ অনু) ; প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমের প্রবন্ধাবলী, অনুশীলন-তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি না পড়িয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। তথাপি 'সীতারামে'র সাধারণ পাঠকও মনে রাখিবেন—বঙ্কিম 'সীতারাম' লিখিবার কালে কি ভাবিতেছিলেন :—

"সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রী-স্বভাব, চিরকাল ঘুঁসি দেখিলেই পালাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্ধ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীযের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙালীরও এরূপ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে বাঙ্গালী চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।"

বঙ্কিম বলিলেন, "বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বহুবলশালী তেজস্বী, বিজয়ী ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাই"—'সীতারাম' তেমনি একটি প্রমাণ ; সীতারাম রায়, মেনাহাতী (মৃন্ময়) ইহারা ঐতিহাসিক পুরুষ। কাজেই সীতারামের আলোচনায় এই ইতিহাসের দিকটিও বিবেচ্য, এবং বঙ্কিমের বাঙালী স্বাদেশিকতার কথাও আলোচ্য।

কিন্তু ইহা 'সীতারামের' কথাবস্তুর দিক—এবং উহারও বাহিরের দিক মাত্র। সীতারামের ভাববস্তুর দিক হইতে উল্লেখযোগ্য 'প্রচারে'র দ্বিতীয় প্রবন্ধ, 'হিন্দুধর্ম্ম'। উহার প্রধান কথা এই :—

"জাতীয় ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস।···

যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সর্ব্ববিধ

উন্নতি হয়, তাহাই ধৰ্ম্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে।

'দেবী চৌধুরাণী'র সূচনাতেই বঙ্কিম অধ্যাপক সীলির ও কোঁৎ-এর ইংরেজি বাণী উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়াছিলেন 'ধর্ম' বলিতে তিনি কি বুঝেন: "The substance of religion is culture; the fruit of it, Higher Life." 'সীতারামে'র ললাটে তিনি এইবার গীতার দুইটি সুদীর্ঘ বাণী অঙ্কিত করিয়া দিয়া জানাইলেন—নিষ্কাম কর্মযোগ, তাঁহার মতে আদর্শ সাধনা; বিষয়গত কর্মেই মোহপাপ প্রভৃতি জন্মে, এই তত্ত্বপ্রচারই সীতারামের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'সীতারাম'-পাঠকালে তাই বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয় বঙ্কিমের প্রচারিত ধর্মতত্ত্বের কোন বিশেষ বক্তব্যটি এই গ্রন্থে রূপায়িত হইয়াছে—'দেবী চৌধুরাণী' ও 'আনন্দ মঠের' পরেও বঙ্কিম কি বলিতে চাহিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নেরও সম্মুখীন হইতে হয়,—উপন্যাসে বা সাহিত্যে উদ্দেশ্যমূলক রচনা সঙ্গত কিনা, অর্থাৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, এবং 'সীতারাম' উপন্যাস হিসাবে সার্থক কিনা, সার্থক হইলে কি জন্য।

'সীতারাম' ও ঐতিহাসিক উপন্যাস

'সীতারাম' রায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু সীতারামের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম জানাইয়াছিলেন, "এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই; গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।" একমাত্র 'রাজসিংহ'কেই তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং স্পষ্ট করিয়া আবার জানাইয়াছেন—"দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।" ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে বঙ্কিমের কি ধারণা ছিল তাহা রাজসিংহ, 'সীতারাম' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন হইতে বুঝিতে পারা যায়। শুধু সমসাময়িকদের নানা তর্কবিতর্কের হাত এড়াইবার জন্যই তিনি 'সীতারাম' প্রভৃতিকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলিতে চাহেন নাই এমন নয়—

'সীতারামের' মধ্যে (৩য় খণ্ড, ১ম পরিঃ) বঙ্কিম ঐতিহাসিক তথ্যাংশ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "সে সকল ঐতিহাসিক কথা। কাজেই আমাদের

নিকট ছোটকথা।—উপন্যাস লেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন—ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন।" ইহা হইতে বুঝিতে পারি বঙ্কিম মনে করিতেন যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের মূল ঘটনাকে অবিকৃত রাখিতেই হয়, এমন কি উহাকেই করিতে হয় উপন্যাসের কথাবস্তু; অধিকন্তু সেই বিশেষ কালের বিশেষ দেশের চিত্রকেও বিশ্বস্তরূপে চিত্রিত করিতে হয়। 'সীতারাম', 'দেবীচৌধুরাণী' প্রভৃতি উপন্যাসে ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা বা ব্যক্তির উল্লেখ থাকিলেও বঙ্কিম ঐতিহাসিক চিত্র আঁকিতে ততটা উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। তাঁহার আগ্রহ ছিল জটিল জীবনচিত্র অঙ্কনে, চরিত্র উদ্‌ঘাটনে ('দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য); হয়ত বা সেই সূত্রে তাঁহার জীবনদর্শন বা জীবনতত্ত্বের পরিস্ফুটনে বা প্রতিফলনে ('সীতারাম' 'দেবীচৌধুরাণী' 'আনন্দমঠ' দ্রষ্টব্য); একমাত্র 'রাজসিংহে' এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল,—ঐতিহাসিক একটি ঘটনাকে এবং ঐতিহাসিক কয়েকটি ব্যক্তিকে চিত্রিত করা। তাই, অন্য উপন্যাসগুলিকে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে উৎসুক ছিলেন না। তথাপি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বিচার করিয়া ইতিহাসবিদ্ যদুনাথ সরকার এই উপন্যাসকে ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—"সীতারাম ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য" (পঃ সঃ 'ঐতিহাসিক ভূমিকা')। সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের' বিষয় আলোচনা করিয়া বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহকে চারটি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন—'সীতারাম' ও 'দেবী চৌধুরাণী'কে তিনি "খাঁটি পারিবারিক উপন্যাসের" শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন—ইহার পারিবারিক অংশের তুলনায় ঐতিহাসিক অংশ নিতান্তই গৌণ বলিয়া (দ্রঃ 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ৪র্থ অঃ, পৃঃ ৩৪)। এই দুই মনস্বীর বিচারে আসলে বিরোধ নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে কে কি বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতে চাহেন, তাহা স্মরণ রাখিলেই আমরা এই কথা মানিতে পারি। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার চাহিয়াছেন, সাহিত্যের উপর ইতিহাসের দাবীকে যথা সম্ভব সহনীয় ও নমনীয় করিয়া দিতে; সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চাহিয়াছেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইতিহাসের সেইরূপ গৌণ প্রভাবকে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য না করিতে।

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস কি? সাধারণ ভাবে সেই উপন্যাস লইয়াই এই বিচার প্রয়োজন যাহাতে ইতিহাস কোনো উপন্যাসের একটা বড় বিষয়বস্তু, কিংবা কোনো ঐতিহাসিক মানুষ,—পুরুষ বা নারী,—উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তখন প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন—ঐতিহাসিক উপন্যাস শুধু উপন্যাস নয়, শুধু নিছক উপন্যাস বা কথা-কল্পনাও নয়। ইতিহাসের কাজ অতীতের তথ্য-বর্ণনা, তাহার সত্য আবিষ্কার। বৈজ্ঞানিকের বিচারপদ্ধতিই তাহাতে প্রয়োজন। তাই ঐতিহাসিক নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখিবেন, ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখ জীবনযাত্রা তাঁহার নিকট বিশেষ গ্রাহ্য নয়, সমসাময়িক কালের অবস্থা বুঝিবার জন্যই উহার গুরুত্ব, অন্য তথ্যাভাবে তিনি সেগুলি মানিতে পারেন (যেমন, প্লুটার্কের জীবনীসমূহ, কিংবা মুঘল বাদশাহদের রোজ-নামচা); কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের আবেগ-আনন্দ-ভাবনা-কল্পনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য নয়। উপন্যাসের কাজ প্রধানত ঐ ব্যক্তি লইয়া,—বঙ্কিমের ভাষায় 'অন্তর্ব্বিষয়ের প্রকটন',—নানা ঘটনাজালের মধ্যে কেমন করিয়া ব্যক্তিজীবন ভাঙে গড়ে; বাহিরের সঙ্গে, পরিবারের ও সমাজের কেমন ঘাত-প্রতিঘাত হয়; নানা মানুষের সম্পর্কে ব্যক্তির অন্তরের সূক্ষ্মস্থলে আবেগ-কল্পনা কেমন জাগে; কেমন আলোড়ন বিলোড়ন ঘটে কোনো ঐতিহাসিকের সাধ্য নাই এই জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন—তাই, ইতিহাসের শত সার্থকতা সত্ত্বেও একটা অভাব থাকিয়া যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসকেও খাঁটি উপন্যাস হইতে হইলে মানুষ ও তাহার জীবনচিত্র অঙ্কিত করিতেই হইবে, শুধু তথ্য বলিলে চলিবে না,—উপন্যাসের এই বনিয়াদ ছাড়িয়া দিবার উপায় নাই। কিন্তু এই ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে হইলে সেইসব ব্যক্তিকে হয় কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে দাঁড় করাইতে হইবে, সেই ঘটনার সংঘাতে কেমন করিয়া তাহারও জীবন আলোড়িত বিলোড়িত হয়, তাহা দেখাইতে হইবে, আবার তাহার ব্যক্তিচরিত্রও কেমন করিয়া তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহাও দেখাইতে হইবে। কিন্তু যাহাই দেখানো হউক, মোটের উপর (এই মোটের উপর কথাটি লক্ষণীয়, বেশি কড়াকড়ি করিয়া নয়, বেশি শিথিল ভাবে নয়) ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুটিকে ঔপন্যাসিক বিকৃত করিতে পারিবেন না, তাঁহার গল্পে সেই তথ্য একেবারে তুচ্ছ ও নগণ্য হইবে না। ইংরেজীতে যাহাকে

historical fidelity বলে, তাহা আমাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে মানিয়া লইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে গ্রীক্ পণ্ডিত আরিষ্টট্ল এবং ভারতীয় পণ্ডিত আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্তের উক্তি কয়টি স্মরণীয়।

আরিষ্টট্ল বলেন—"......the poet should prefer probable impossibilities to improbable possibilities.'

—Poetics, XXIV, 10.

পুনরায়—"Within the action there must be nothing irrational."—Poetics, XV, 7.

আনন্দবর্ধন বলেন—

"নহি কবে রিতিবৃত্তমাত্রনির্বহণেন কিংচিৎ প্রয়োজনম্। ইতিহাসাদেব তৎসিদ্ধেঃ।" (ধ্বন্যালোক, ৩।১৪ বৃত্তি)—কবির ইতিবৃত্তমাত্রবর্ণনার কোনও প্রয়োজন নাই। ইতিহাস হইতেই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অভিনবগুপ্ত বলেন—

"যত্র বিনেয়ানাং প্রতীতিখণ্ডনা ন জায়তে তাদৃগ্ বর্ণনীয়ম্।" (ধ্বন্যালোক, ৩।১৪ টীকা)—এমন ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে যাহাতে বিনেয় অর্থাৎ পাঠকগণের প্রতীতি-খণ্ডন না হয়।

এইরূপ উপন্যাসের নায়কেরা ইতিহাসবিদিত পুরুষ নাও হইতে পারেন; অখ্যাত মানুষও হইতে পারেন, প্রখ্যাত মানুষও হইতে পারেন। কিন্তু একটি বিশেষ ঐতিহাসিক কালের চিত্র তাহাদের জীবন বা চরিত্রের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইবে। এইরূপ ঐতিহাসিক চিত্রের একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত থ্যাকারের 'হেনরি এসমণ্ড' (অনেকাংশে বস্তুবাদী পদ্ধতির চিত্র); অন্যটি ডিকেন্সের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'এ টেল অব্ টু সিটিজ্' (কতকাংশে রোমান্টিক পদ্ধতির চিত্র। ডুমা, স্কটের উপন্যাসও এই জাতীয়)। অবশ্য সাধারণ মানুষ অপেক্ষা খ্যাতনামা ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়াই লেখকেরা এতদিন এইরূপ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কারণ বড় ঘটনা, বড় মানুষ লইয়া বড় কল্পনা ও অদ্ভুত রস সৃষ্টি সহজেই সম্ভবপর; তথাপি ইহা বলা বাহুল্য, এইরূপ উপন্যাসকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যদিক হইতে দেখিলে সামাজিক উপন্যাস তো নিশ্চয়ই, পারিবারিক উপন্যাস বলিয়াও

স্বীকার করিতে হইবে—কারণ পরিবার ছাড়া মানুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় কিরূপে সম্ভব? আর পারিবারিক চিত্রই কি ইতিহাসের ঘটনা-ধারায় সূক্ষ্ম বা স্থূলভাবে প্রভাবিত । হইয়া পারে? বরং এই চিত্রটিই ইতিহাসকার ফুটাইতে পারেন বলিয়া তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসকে সত্যই সমাদর করেন।

বঙ্কিমের 'সীতারাম' নিশ্চয়ই এইরূপ ঐতিহাসিক উপন্যাস। যদুনাথ সরকার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, রাজা সীতারাম রায় ঐতিহাসিক মানুষ, রাজা হিসাবে তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলি বঙ্কিম যাহা দিয়াছেন তাহা অধিকাংশ সত্য; তখনকার (১৬৮৯-১৭১৪) দেশের অবস্থা তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও মোটের উপর সত্য; এমন কি সে আমলে হিন্দুর প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে যাহা তিনি বলিয়াছেন তাহাও একেবারে মিথ্যা নয়। অতএব "এই উপন্যাসখানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য।" আর, তাই 'সীতারাম' ঐতিহাসিক উপন্যাস। যদিও এই ইতিহাসাংশ ইহাতে গৌণ, কিন্তু তাহা 'কপালকুণ্ডলা'র মত নগণ্য নয়, এমন কি 'চন্দ্রশেখর', মৃণালিনী'র মতও অবান্তর নয়, অথবা 'আনন্দমঠ' বা 'দেবী চৌধুরাণী'র মতই একান্ত ক্ষীণ নয়।

আর এক রকম ঐতিহাসিক উপন্যাসও আছে—তাহাতে ইতিহাসের ঘটনা ও ঐতিহাসিক কোনো পুরুষের চিত্রাঙ্কনই প্রধান কথা;—ইহাতে ইতিহাস শুধু দৃশ্যপট নয়, উহাই প্রায় দৃশ্যবস্তু; এবং সেই দৃশ্যবস্তুর পরিপোষক হিসাবেই আমরা ঐতিহাসিক চরিত্রের ব্যক্তিগত সংবাদ ও সাংসারিক সংবাদও কিছু কিছু জানিতে পারি, এমন কি যেখানে ইতিহাসের তথ্য বেশি মিলে না সেখানে অতীতকে আপনার ইতিহাস-দৃষ্টি ও মানব-দৃষ্টি দিয়া পুনর্নির্মাণ করিতে পারি। মোহিতলাল মজুমদার এই রূপকেই শুধু 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ইতিহাসের দিক্ হইতেই যাত্রারম্ভ। কিন্তু ইহাতে উপন্যাসের সাধারণ নিম্নতম দাবী যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তবে ইহাকে আর উপন্যাস বলিবার উপায় থাকে না। এইরূপ সৃষ্টিতেও বাস্তব পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে পারে—যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে', কিংবা আধুনিক কালের জার্মান লেখক ফয়েশ্‌ট্‌ভেঙ্গারে রচিত 'জুন্যুস' কিংবা জোলার 'ডিবাক্‌ল্‌' অথবা আপ্‌টন্‌ সিন্‌ক্লেয়ারের উপন্যাসগুলি।

আবার এইরূপ সৃষ্টি রোমান্টিক পদ্ধতিতেও সুসম্ভব, যেমন, বঙ্কিমের 'রাজসিংহ', কিংবা রমেশচন্দ্রের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'। স্কটের অনেক উপন্যাস, কিংবা 'কুওভাডিস' প্রভৃতি জনপ্রিয় উপন্যাসও এই পর্যায়ের অন্তর্গত। কিন্তু ঔপন্যাসিক চেতনা সুদৃঢ় না হইলে এইরূপ উপন্যাস কি হইয়া উঠে, তাহার প্রমাণও আছে; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহ, লর্ড লিটনের উপন্যাসগুলি তাহার অল্পাধিক প্রমাণ। ঐতিহাসিক বোধ লইয়া স্কট এইরূপ বিস্মৃত অতীতকে অনেক স্থলেই সার্থকভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই যাহা আছে, তাহাও এই উপলক্ষ্যে স্মরণীয়। আমাদের ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠাই আজও অনালোকিত, আবার যাহা আলোকিত তাহারও এক পর্বের সঙ্গে অন্য পর্বের প্রভেদ সুচিহ্নিত নয়,—প্রত্যেক যুগের আহার-বিহার, আচার-বিচারের বিশদ তথ্য আমরা পাই নাই, বঙ্কিম তাহা আরও অল্প পাইয়াছিলেন। এইরূপ স্থলে তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল প্রধানত আপনার অতীত-কাল-সম্বন্ধীয় বোধ ও ঐতিহাসিক কল্পনা-কুশলতার উপর। তাঁহার কৃতিত্ব এই যে, তিনি সত্যই এই বোধশক্তির ও কল্পনাশক্তির যোগ্য অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টিতে ঐতিহাসিকেরা তেমন বড় ত্রুটি ধরিতে পারেন না, অন্তত তাহার চিত্রগুলি সাধারণ পাঠকের চক্ষে অবিশ্বাস্য বা ঐতিহাসিক অসংগতিপূর্ণ বলিয়া ঠেকে না।

আসল কথা এই,—উপন্যাসের ঐতিহাসিক, সামাজিক, পারিবারিক প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ সর্বদা যুক্তিসিদ্ধ নয়। আর 'সীতারাম' ঐতিহাসিক উপন্যাস হইলেও উহার বক্তব্য একান্তভাবে বাঙালার বলবীর্যের কথা নয়, এমন কি হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের ব্যর্থ কাহিনীও নয়; এমন কি বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক চেতনায় উহার অতি-বিজ্ঞাপিত মূল উদ্দেশ্য গীতার নিষ্কাম কর্মযোগও এত প্রকট ও প্রচণ্ড হইয়া উঠে নাই—সীতারামের মোহ ও পতনের ইতিহাসই এই উপন্যাসের প্রবলতম সত্যরূপে, প্রধান কথাবস্তুরূপে পাঠকের মনকে পূর্বাপর মথিত করিয়া চলে।

'সীতারাম' ও প্রচারমূলক উপন্যাস

গীতার শ্লোক দিয়া 'সীতারামের' উদ্বোধন, শেষও হইয়াছিল বঙ্কিমের সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়া—"সর্বফলদাতার নিকট প্রার্থনা করি যে পাঠকেরা সীতারামের দুষ্কর্ম্ম এবং শ্রীর অকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া জয়ন্তীর কর্ম্মানুকারী হউন। এখন যাও জয়ন্তী! প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুইজনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ কর।" পরবর্তী কালে বঙ্কিম এই অংশ বর্জন করিয়াছেন; উপন্যাসের মধ্যে যদি এই কথা সুস্পষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে লেখকের মন্তব্যে কি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? তাই বঙ্কিমের শিল্পদৃষ্টি এই অংশ বর্জন না করিয়া পারে নাই, এইরূপ আরও অনেক পরিবর্তন বঙ্কিম 'সীতারামে' সাধন করিয়াছেন—এই উপন্যাসে প্রচারের অংশ ও অতিভাষণের ত্রুটি তাহাতে কমিয়াছে। কিন্তু 'সীতারাম' রচনার উদ্দেশ্য তাই বলিয়া তিনি কিছুমাত্র খব করেন নাই বা গোপনও করেন নাই। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'সীতারাম' এক শ্রেণীর লেখা। উহাদের মধ্যে বঙ্কিমের প্রচার-যুগের চিন্তা ও লক্ষ্য রূপায়িত হইয়াছে। এইজন্য এই ত্রয়ীর বিচার বঙ্কিমের মনোযোগী পাঠকেরা একসঙ্গে করিয়া থাকেন। বঙ্কিমের বক্তব্যকে তাঁহারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন। সেই আলোচনা তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয় (পঃ সঃ-এ তাহার একটি ক্ষুদ্র নির্দেশক তালিকা আছে)। সাহিত্যরসিকেরা সমালোচকদের এই সুদীর্ঘ তত্ত্ববিচারে উদাসীন থাকিতে পারেন, কিন্তু বঙ্কিমের এই 'প্রচার'-প্রবণতাকে কি দৃষ্টিতে তাঁহারা দেখিবেন, সাহিত্যে অথবা উপন্যাস-সাহিত্যে এই উদ্দেশ্যমূলক লেখার কতটা স্থান আছে, —তাহাও বিচার্য।

সাহিত্যের বক্তব্যঃ—বঙ্কিম স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—সীতারাম তাঁহার প্রচারের 'কল'। অথচ বঙ্কিম বেশ জানিতেন,—সাহিত্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি; প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের' মত নাটককে পর্যন্ত তিনি এইজন্য প্রশংসা করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন। ("কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সমাজসংস্কার নহে।"—বঙ্গদর্শন' ভাদ্র, ১২৮০।) বঙ্কিমের এই সংজ্ঞা যাঁহারা art for arts sake-এর পক্ষপাতী অর্থাৎ কলাকৈবল্যবাদী তাঁহাদেরও পূর্ণ সমর্থন লাভ করিবে। কিন্তু বঙ্কিম আপনার প্রতিভার বলে প্রথম হইতেই

বুঝিয়াছিলেন—সৌন্দর্য নিরবলম্ব আকাশলতা নহে; উহা জীবনেরই প্রকাশ। তাই সৌন্দর্যসৃষ্টি যে রসের নামে জীবনসত্য-হীন কোন একটা কল্পনা-বিলাস নয়, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন, উহা যে কাব্যকলার নামে আলঙ্কারিকদের নিতান্ত রূপায়ণ-কলাও নয়, তাহাও তিনি জানিতেন।

আসল কথা, জীবন-সত্যের ছাপ না থাকিলে সাহিত্য সাহিত্য হয় না। অবশ্য সেই জীবন-সত্য উত্থাপিত হয় তথ্যাকার বা তত্ত্বাকারে নয়,—সে-ভাবে জীবনকে বিবৃত করে ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি। কিন্তু সত্য শুধু তথ্যও নয়, শুধু তত্ত্বও নয়। এই দুই ছাড়াও তাহাতে সর্বাধিক থাকে ব্যক্তি-জীবনের বিকাশধারা, সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার ছাপ, জীবনের গতিময়তা, সৃষ্টিময়তার ইঙ্গিত। যিনি যতবড় সৃষ্টি-প্রতিভার অধিকারী, তিনি জীবনের সৃষ্টিময়তার দিকটি তত বেশি ধরিতে পারেন, তাঁহার সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি তত সুস্থির। তাঁহার কাব্য তত ভাবী জীবনের দ্যোতক Prophetic। যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি জীবনের তত গভীর স্তরে পৌঁছায় না, তাঁহারাও জীবন-সত্যকে প্রতিবিম্বিত করেন; সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার রসে জারিত জীবনের সহজ রূপটিই তাঁহারা দেখেন। ইহাতেও মানুষ আনন্দ পায়, তৃপ্তি পায়, উদ্বুদ্ধ হয়; উহাও সৃষ্টি। কিন্তু এই সহজ রূপের মধ্যে যতটা জীবনের সৃষ্টিময়তার ইঙ্গিত থাকিবে, ততটাই এই সৃষ্টি হইবে স্থায়ী, সেই সাহিত্যও হইবে তত গভীর, তত অধিক সৌন্দর্যশালী। তাহাতেও ততটাই সমাজের নূতন সৃষ্টিশক্তির উদ্বোধন হইবে। তাই 'কাব্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির' মূল কথাটা এই জীবনদৃষ্টির, এই জীবন-সত্যের উপলব্ধি। সত্য এই অর্থেই সুন্দর, সুন্দর এই অর্থেই সত্য। "Truth is beauty and beauty truth," এবং জীবনসৃষ্টির শিল্প মাত্রই সেই জীবন সত্যের রূপায়ণ।

প্রত্যেক সাহিত্যেরই কিছু-না-কিছু 'বক্তব্য' থাকে—সেই বক্তব্য হাল্‌কা হইতে পারে, কাঁচা হইতে পারে আবার গম্ভীর ও গভীরও হইতে পারে। কিন্তু কথা এই—বক্তব্য কিছু-না-কিছু থাকেই। নিছক কলাকৈবল্য একটা বিলাস ও বিকার, হয়ত অলীক। কিন্তু শুধু বক্তব্য থাকিলেই সাহিত্য হয় না; বক্তব্য ত বিজ্ঞানের আছে, ইতিহাসেরও আছে। সাহিত্যে বক্তব্যটা ভাববিশ্লিষ্ট নীরস বস্তু হইলে চলিবেনা, অন্তরের ভাবরসে উহা জারিত

হওয়া চাই। আসলে জীবন যে ভাবে রঙেরসে মাখিয়া মিশিয়া আছে তাহা সাহিত্যিকের বুঝা চাই, রূপরস-শুদ্ধ সে ভাবে তাহাকে আকার দেওয়া বা প্রকাশ করা চাই। অর্থাৎ, শুধু সত্য প্রচার নয় সত্যকে প্রকাশ করা চাই—সাহিত্যের এই মুখ্য দাবী না মানিলে চলিবে না।

সীতারামের বক্তব্য ঃ—বঙ্কিমের প্রতিভা প্রথমাবধিই জীবনের রূপে আকৃষ্ট হয়। তারপর তাহা অগ্রসর হয় জীবন-জিজ্ঞাসায়। সেই জীবন-জিজ্ঞাসায় তিনি যে সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ জীবনের উপন্যাসে তিনি প্রকটিত করিতে থাকেন। উহারই ফল—'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম'। 'দেবী চৌধুরাণী'তেই তিনি নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—আর এই সত্যও বলিয়া শেষ করিয়াছিলেন যে, নারীর পক্ষে সেই নিষ্কাম কর্মের আসল সাধনক্ষেত্র তাহার সংসার। প্রফুল্লের জীবন সার্থক রাজরাণী-গিরিতে নয়, বাসন মাজায়, স্বজন-সপত্নী-সহ ব্রজেশ্বরের সংসারের মধ্যে নিষ্কামকর্মের সাধনায়। প্রফুল্ল সত্যই কতটা নিষ্কামকর্মযোগ উপলব্ধি করিয়াছিল, তাহা লইয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই, বঙ্কিমের বক্তব্য মানিয়া লওয়াই উচিত। 'সীতারামে' বঙ্কিম এই বক্তব্যই উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু সাধনক্ষেত্রটি 'দেবী চৌধুরাণী'র উল্টা দিকে, তাই এই সত্যের রূপটি মনে হয় স্বতন্ত্র। এখানে সীতারাম রায় কর্মীপুরুষ, ব্রজেশ্বরের মত নিষ্ক্রিয় নন। তাঁহারও তিন স্ত্রী—শ্রী প্রফুল্লের মতই অন্যায় কারণে পরিত্যক্তা, নন্দা গৃহকর্ত্রী, রমা স্বামী-সোহাগিনী। কিন্তু শ্রী প্রফুল্লের মত আপনার হৃদয়কে এত স্থিরভাবে জানে না,—প্রফুল্লকে নিষ্কাম ধর্ম শিখিতে হইয়াছে ভবানী পাঠকের নির্দেশে; শ্রী নিজেই সন্ন্যাসিনী বা ভৈরবী হইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সন্ন্যাস-সাধনায় সে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই—প্রফুল্ল কিন্তু তাহা পারিয়াছিল। সিংহবাহিনী, ঐশ্বর্যময়ী শ্রী সন্ন্যাসের সাধনায় আপনাকে সংযত করিয়াছে সত্য, কিন্তু উহা বাহ্য; উহা সে করিয়াছে নিজ আন্তরশক্তিকে খর্ব করিয়া, নিজে নিষ্ক্রিয় হইয়া। চারিদিকের সংসারে আগুন লাগাইয়াও সে তাহারই মধ্যে নিষ্ক্রিয় বসিয়া রহিল। এইদিক হইতে দেবী চৌধুরাণীর সিদ্ধান্তই কি এখানে বঙ্কিমের বক্তব্য নয়?—নিষ্কাম কর্মযোগ ছাড়া গতি নাই; নারীর সার্থকতা সন্ন্যাসে নয়, সংসারের সাধনায়। এবং এই কথাটিই আরও সুস্পষ্ট করিবার জন্যই কি বঙ্কিম জয়ন্তীচরিত্র কল্পনা করেন

নাই? জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী; নারী যদি সন্ন্যাসিনীও হয়, তথাপি সে, মায়াবদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু মমতাময়ী প্রাণ-নির্ঝরিণী বটে; এমনকি, যতবড়ই হোক্ নারীর লজ্জাসরম বোধ একেবারে উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য তাহার নাই।—কিন্তু সন্ন্যাসিনী হইলেই কি উদাসীনা হইতে হইবে? বঙ্কিম বলিতে চাহেন—না, নিষ্কাম কর্মসাধনায় তিনি ধর্ম সংস্থাপনের সমস্ত কর্মেই অগ্রসর হইয়া যাইবেন; গৃহী স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় ইহা সন্ন্যাসীরও তুল্য কর্তব্য, ধর্ম সংস্থাপন সন্ন্যাসিনীরও কর্তব্য। এই জন্যই জয়ন্তী-প্রফুল্ল মিলিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ করিবে। গৃহধর্ম ও সমাজধর্ম দুই-ই পরস্পর সম্পর্কিত। নিষ্কাম কর্মযোগ গৃহে বসিয়া কেবল বাসন মাজিবে না—ত্রিশূল ধরিয়া অধর্মেরও বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।

এই দ্বিতীয় বক্তব্যটা—হিন্দুর ধর্মরাজ্যস্থাপনও তাই 'সীতারামে'র দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—অবশ্য রাজ্যস্থাপন অপেক্ষা রাজ্যপতনেরই তাহা কাহিনী। এই বক্তব্যের মুখপাত্র শুধু চন্দ্রচূড় ঠাকুর ও চাঁদশাহ ফকির নন ('পরিশিষ্ট'—পরিত্যক্ত ১।১৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), জয়ন্তীও উহার অন্যতমা মুখপাত্রী। কিন্তু সীতারাম রায়ের কাহিনীটাই এইরূপ যে, শুধু এই বিষয়টির ইঙ্গিতই তাহাতে করা চলে, একটা সার্থক চিত্রপ্রদান করা চলে না। তাই হিন্দু-ধর্মরাজ্যের দুই একটি ইঙ্গিত রাখিয়া বঙ্কিম ক্ষান্ত হইয়াছেন—একেবারে ক্ষান্ত হন নাই, হিন্দুরাজার বিজয়ের কাহিনী বলিবার জন্য 'রাজসিংহ'তে হাত দিয়াছেন।

সীতারামের ভাববস্তু:—কিন্তু উদ্দেশ্য যতই তাঁহাকে পাইয়া বসুক, বঙ্কিম বিস্মৃত হ'ন নাই—তিনি উপন্যাস লিখিতে বসিয়াছেন, তিনি ইতিহাস লিখিতে বসেন নাই (দ্রঃ ৩।১)। গীতার কর্মযোগের ভাষ্য-রচনাও তাঁহার উদ্দেশ্য নয়—তাঁহার দায়িত্ব প্রধানত কলাশিল্পীর। 'সীতারাম' তাঁহার প্রচারের 'ফল'; কিন্তু সে প্রচার কলা-বর্জিত হইলে চলিবে না। বঙ্কিম এই দৃষ্টিতে সীতারামে যে জীবন-সত্য উদ্‌ঘাটন করিলেন ক্রমে তাহার আলোকে তাঁহার উদ্দিষ্ট (নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যাখ্যা ও হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কথা) ভাববস্তু ও কথাবস্তু পর্যন্ত ভাস্বর হইয়া গেল;—সেই জীবন-বোধ ও কলা-দৃষ্টির বলেই প্রথম সংস্করণ সীতারামকে ছাঁটিয়া পরবর্তী 'সীতারামে' পরিবর্তিত করিলেন;—হিন্দুরাজ্যস্থাপন ও ধর্মতত্ত্বের পরিবর্তে সীতারামের কাহিনীর কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িল—সীতারামের পতনের কাহিনী, শ্রী-সীতারামের কাহিনী,

মানুষের চিরন্তন রূপমোহ আর তাহারই একটি জটিল পরিণাম (দ্রষ্টব্য টীকা)—ইহাই সীতারামের প্রধান ভাববস্তু। ইহাও ধর্মতত্ত্বই বটে, গীতাকার কেবল একটি বিশেষ কার্যকারণপরম্পরায় এই মোহের হেতু ও পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াছেন। "বঙ্কিম তাঁহার সমৃদ্ধ কল্পনাভাণ্ডার হইতে এই বাস্তব মোহের একটি উদাহরণ লইয়াছেন" ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—'বঙ্কিমচন্দ্র পৃ ৮৩')—অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বকে প্রাণবন্ত করিয়াছে জীবনসত্য, সঙ্গে সঙ্গে প্রচারও হইয়া উঠিয়াছে প্রকাশ।

বঙ্কিমের রচনা উদ্দেশ্য-মূলক এই কথা অস্বীকার করিবার কোনো কারণ নাই; বরং ইহাই জোর করিয়া বলা প্রয়োজন যে, কোনো সাহিত্যই উদ্দেশ্যহীন নয়। তারপর বিচার চলিতে পারে—বঙ্কিমের উদ্দেশ্য কি—তাহা কতটা গভীর ও ব্যাপক; সমাজ-জীবনের কতটা অন্তস্তল পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি গিয়াছিল ও ব্যক্তি-জীবনের কতটা সম্ভাব্যতা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন এবং কলা-কৌশলের দিক হইতে তাঁহার প্রয়াসে কতটা সঙ্গতি অসঙ্গতি রহিয়াছে। সেখানে আধুনিক বিচারে বঙ্কিমের এক প্রকার অসম্পূর্ণতা আজ আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে—প্রফুল্ল বাসন মাজিতেছে দেখিয়া আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করি না; জানি নারী-জীবনের একমাত্র সার্থকতা ইহা নয়; জয়ন্তী হিন্দুরাজ্যস্থাপনের জন্য সক্রিয় হইয়াছে দেখিয়াও আমরা আশ্বস্ত হই না—জানি সন্ন্যাসিনী না হইয়াও কোনো নারী বিশ্বহিতে বা সমাজহিতে ব্রতী হইতে পারেন। কলা-কৌশলের দিক হইতে আলৌকিক কাহিনী রচনায় বা অতিভাষণেও আমাদের দ্বিধা আসে, কিন্তু ইহাও জানি বঙ্কিমের জীবন-দৃষ্টির ব্যাপ্তি ও গভীরতার অনুপাতে বঙ্কিম বলিষ্ঠ স্রষ্টা। 'সীতারামে'ও সেই পরিণত শক্তির পরিচয় মিলে কাহিনী-উদ্ঘাটনে, চরিত্র-চিত্রনে, প্রায় নাটকোচিত কলা-কুশলতায়।

চরিত্রাবলী

১। সীতারাম

'সীতারাম' বঙ্কিমের পরিণত বয়সের রচনা, সযত্নে বঙ্কিম তাহার সংস্কারও করিয়াছেন। সমস্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসা সত্ত্বেও বঙ্কিমের পরিণত শক্তির প্রমাণ ইহাতে পাওয়া যায় সীতারামের চরিত্রচিত্রণে।

সীতারামের চরিত্রই উপন্যাসের মূল চরিত্র—এই 'স্বভাব-মহান্' চরিত্রের ক্রমাধোগতিই উপন্যাসের প্রধান কথা। সীতারাম মহাপ্রাণ, উদ্যোগী, পুরুষসিংহ—কিন্তু দুর্বলতার বীজ যে তাঁহার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে তাহা প্রথম পরিচয়েই বঙ্কিম আমাদের জানাইয়া দেন। বিপন্না শ্রী আপন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া যে মুহূর্তে সীতারামের নিকট নিজ পরিচয় দিল, সীতারামের সমস্ত চরিত্র সেই এক মুহূর্তে তাঁহার প্রথম কথাটিতেই যেন আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল,—'তুমি শ্রী, এত সুন্দরী'! (১।৩) সীতারামের নিয়তিও তাঁহার এই চরিত্রেরই অন্য নাম।

Character is destiny—ঘটনার বিচিত্র আঘাতে তাঁহার চরিত্রের ধ্বংস-কর দিক্‌টি ক্রমপ্রকটিত হইয়া পড়িল। ঘটনার এমন সমাবেশ না ঘটিলে ম্যাকবেথ আপন দুরাকাঙ্ক্ষার বশে দানবে পরিণত হইতে পারিত না; এণ্টোনিও মিশরের রূপবহ্নিতে পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতে যাইত না; রাজা সীতারাম রায় হয়ত নন্দা ও রমাকে লইয়া মহম্মদপুরে আপনার রাজোচিত গুণগ্রাম সহকারে রাজত্ব করিতে পারিতেন। কিন্তু ঘটনার প্রবাহে,—বাহিরের জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তাঁহাদের চরিত্রের শান্ত সুন্দর সম্ভাবনা বিনষ্ট হইল; ধ্বংসের গুপ্তবীজই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তথাপি মনে রাখিবার মত কথা এই যে, সে বীজ গুপ্ত ছিল ইহাদেরই চরিত্রে—ম্যাক্‌বেথ-এর বীর-চরিত্রে, এণ্টোনিওর কর্মনিপুণ চরিত্রে, সীতারামের মহাপ্রাণ চরিত্রে। হয়ত এমনি তাহা থাকে আরও অনেক মহৎ চরিত্রে,—কিন্তু ঘটনার এমন ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহাদের জীবনকে বিমথিত, বিকৃত করিয়া দেয় না, তাঁহাদের জীবন এমন ছারেখারে যায় না, সুখে দুঃখে একরূপ সার্থকতায় তাঁহারা জীবন কাটাইয়া যান। তাই বোধহয় শুধু Character is Destiny বলা যথেষ্ট নয়। অন্ততঃ বঙ্কিম যথেষ্ট মনে করিতেন না; সেক্‌স্‌পীয়রও করিতেন কিনা সন্দেহ। বঙ্কিম অদৃষ্ট মানিতেন, বড় বেশি করিয়াই মানিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে জন্মিয়া অদৃষ্ট ও অলৌকিক (occult) না মানাই আশ্চর্য। সেক্‌স্‌পীয়রের মতই অতিপ্রাকৃতের শরণ লইয়া ঘটনার মোড় ঘুরাইতেও বঙ্কিমের আপত্তি হইত না। কাজেই, বঙ্কিম শুধু চরিত্রকেই সীতারামের জীবন-বিবর্তনের কারণ বলিতেন না—বলেনও নাই। বীজ ছিল, কিন্তু গুপ্ত বীজ আপনা হইতেই অঙ্কুরিত হয় না—চাই অনুকূল

ভূমি, আলো-বাতাস। তাহাই অদৃষ্টের খেলা। সীতারামের সাধ্য কি আপনার এই অদৃষ্টজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হন, আপনার ভাগ্যকে আপনি নিয়ন্ত্রিত করেন?

সেই নিয়তির হাতে প্রধানতম ক্রীড়নক সীতারাম স্বয়ং। বঙ্কিমের বহু উপন্যাসের বহু চরিত্রই এই মোহের জালে পড়িয়া ছটফট করিয়াছে তাহা আমরা জানি। কিন্তু এই মোহের বশেই কি সীতারাম গঙ্গারামের জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন? না, তাহা সর্বাংশে বলা চলে না। সীতারাম অবশ্য শ্রীকে দেখিবামাত্রই স্থির করিয়াছেন,—আগে শ্রীর কাজ করিব তারপর অন্য কথা (১।৩)। কিন্তু যে উদার, অকপট দুঃসাহসিক উপায়ে সে কাজ করিতে সীতারাম অগ্রসর হইলেন, তাহাও তাঁহার মহাপ্রাণতারই পরিচায়ক। তখনো রূপজমোহে তিনি কবলিত হন নাই। কিন্তু তাহারই আয়োজন সম্পূর্ণ হইল সেই বধ্যভূমিতে—যখন শ্রী, আত্মবিস্মৃতা শ্রী এমন ঐশ্বর্যময়ী, সিংহবাহিনী মূর্তিতে প্রকাশিত হইল। যাহার রূপের জন্য আঁখি ঝুরিতে থাকে, তাহার গুণে মনই শুধু ভরিয়া গেল না, প্রতি অঙ্গের জন্য একটা বাসনা উদগ্র হইয়া উঠিল। হইবার কারণ ছিল। বঙ্কিমের অন্য উপন্যাসে গুণজপ্রেম রূপজ মোহের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ রচনা করিয়াছে, মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিয়াছে, কিংবা শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে (দ্রষ্টব্য: বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল)। কিন্তু সীতারামের সেই অবকাশও নাই। বরং শ্রীর গুণে মুগ্ধ সীতারাম শ্রীর অধিকতর রূপমুগ্ধ পুরুষ হইয়া উঠিল। গুণ এই ক্ষেত্রে রূপের মোহকে উজ্জ্বলতর শিখায় পরিণত করিল, কারণ শ্রীকে পাইবার বিরুদ্ধে সামাজিক কোনো বাধাই তো সীতারামের ছিলনা। শ্রী তো সীতারামের পত্নী, তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইবার জন্য তাহার জন্ম। কিন্তু শ্রী আপনাকে ছিনাইয়া লইল, আপন মহত্ত্বেরই বশে আপনাকে সে দূরে সরাইয়া লইল আর এই মহত্ত্বের দেনা পরিশোধ করিতে তাহার কি অবশিষ্ট রহিল? সেই তেজের, সেই উদ্যোগিনী শক্তির, সেই মহিষী-সুলভ গুণগ্রামের কি বাকী রহিয়া গেল?

শ্রী এই অদৃষ্টের হাতে দ্বিতীয় অস্ত্র—সীতারাম সে অস্ত্রাঘাতে ধূলিশায়ী হইলেন। শ্রী সীতারামের চরিত্রের রূপতৃষ্ণাকে শুধু বাড়াইয়া দিলনা, আপনার গুণের আলোকে মোহকে উজ্জ্বল, মধুর, উন্মাদকর করিয়া দিয়া

গেল। তারপর আর সীতারামের সাধ্য কি আপনাকে বাঁচান? হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় তবু তিনি উদ্যোগী হইয়া আপনাকে ভুলিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার হৃদয় কোন আশ্রয়ই পাইল না। নিয়তি সীতারামের জন্য আরও একখানি অস্ত্র সাজাইয়া রখিয়াছিল—সে তাঁহার স্ত্রী রমা। সে যদি একটা মোমের পুতুল মাত্র না হইত, বিকৃত ভীতিতে বিরক্তিকর হইয়া না উঠিত (১।১০), তাহা হইলে শ্রী সীতারামের মনে এমন চিরনূতন সুতীব্র আকর্ষণের বস্তু হইয়া থাকিতে পারিতনা, হয়ত গৃহের আরাম ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগে সীতারাম আপনাকে সংযত রাখিতে পারিতেন (১।১০)। কিন্তু তাহা হয় নাই। রমাও সীতারামের শত্রুপর্য্যায়ে গেল। তাই সীতারামের পরম সংকট-মুহূর্ত্তটিতেও আমরা দেখি সীতারাম প্রায় ক্ষমতাশূন্য; পুরী রক্ষা করিতেও উদ্যোগী ন'ন—দুয়ারে শত্রু, সীতারাম বলিতেছেন তাতেই বা কি? যা চাই. পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব (২।১৪)? বুঝিতে পারি উদ্যোগী পুরুষসিংহের জীবন ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। ইহার পরে যখন শ্রী আসিয়া তাহার সম্মুখে বসিল (৩।৮), তখন পাগল শিয়রের মত সীতারাম আপনার মধ্যে আপনি জ্বলিয়া যাইতে লাগিলেন—শ্রী হইতে সীতারামের সর্বনাশ হইল (১।৮)। শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্তিই শ্রীকে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার বস্তু করিয়াছিল, কিন্তু সন্ন্যাসিনী শ্রীর এই ভুবনেশ্বরী মূর্তির কাছে তাহাও নগণ্য হইয়া গেল। জ্ঞান-মধুর হাস্যে, বচনে আর গুণের ঔজ্জ্বল্যে সেই রূপমোহ প্রকৃতই সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিল। "এই ইন্দ্রাণীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে আর সীতারাম প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর মত তফাতে বসিয়া মুখপানে কেবল চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী"—এই অতি তীক্ষ্ণ বাক্যটি ও অতি নিষ্ঠুর অবস্থাটি মনে রাখিলে সীতারামের পরবর্তী দানব বৃত্তি কি আমরা বিশেষ অস্বাভাবিক মনে করিতে পারি?

সব বুঝিলে নাকি সব ক্ষমা করা যায়। আমরাও সীতারামকে ক্ষমা করিতে চাই। কিন্তু তাই বলিয়া শেষ পর্যন্ত কি তাহাকে ক্ষমা করা সম্ভব—বিশেষত জয়ন্তীর প্রতি প্রকাশ্য দণ্ডদানের দৃশ্যে (২।১৮)? কাপুরুষতার এমন দৃষ্টান্ত বুঝি কৌরবসভায় ছাড়া আর কোথাও আমরা দেখি নাই। তাঁহার লালসাবহ্নির উপকরণ ভানুমতীর মুখে তার শেষ অভিশাপ (৩।২১)—

"আমাদের কাহারও মা কাঁদিতেছে, কাহারও বাপ কাঁদিতেছে, কাহারও স্বামী কাঁদিতেছে, কাহারও শিশুসন্তান কাঁদিতেছে—মনে করিয়াছিলে কি সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না ?" ইহার পরে আর ভাগ্যহীন সীতারাম—নিয়তিবঞ্চিত মোহাবিষ্ট সীতারাম আমাদের কোন সহানুভূতি পাইতে পারেন কি ? তবু শেষ মুহূর্তে তাঁহার চরিত্র ধ্বংসের মধ্যেও শেষ বারের মত আপনার বীরত্ব ও কর্মকুশলতায় সাহস ফিরিয়া পাইল বলিয়া, নন্দা আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল বলিয়া, হৃদয় একটা আশ্রয়ক্ষেত্রেরও অস্তিত্ব জানিল বলিয়া সীতারাম আপনাকে উদ্ধার করিবার শক্তি খুঁজিয়া পাইলেন, স্বভাবের ধর্ম্মবোধও পুনরায় লাভ করিলেন। তাই শেষ মুহূর্তে তাঁহার মধ্যে যেটুকু নিয়তিপীড়িত ট্র্যাজিক নায়কের গাম্ভীর্য, উদ্যোগ ও শান্ত বীরত্ব দেখি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত সীতারামকে প্রাণ ও পরিবার লইয়া উদ্ধার পাইতে দেখিয়াও আর উহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। জানি এই উদ্ধারের আর মূল্য নাই—হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সীতারাম আপন ধ্বংসস্তূপের তলায় বাঁচিয়া থাকিলেন কি মরিয়া গেলেন, তাহা আর বড় কথা নয়। বুঝি সত্য সত্যই শ্রী নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাস ও সংযমের বশে আপনার প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইয়াছে। গঙ্গারাম মরুক না-মরুক, রাজা সীতারাম রায় নিশ্চয়ই আর বাঁচিয়া নাই। আপন ধ্বংসের ক্ষণে তবু তিনি জানাইয়া গিয়াছেন যে নিজ রূপোন্মাদনার মধ্যে তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় নাই। তখনো তাঁহার অন্তরে সাহস ছিল, উদ্যোগ ছিল, ছিল গম্ভীর আত্মনিবেদনের সংকল্প। শুধু চরিত্রই তাঁহার পতনের কারণ নয়; শ্রী, রমা এমন কি জয়ন্তীও নয়। এক কথায় ঘটনার অনিবার্য ঘাত প্রতিঘাতে সীতারাম চূর্ণ হইয়াছেন। মানব-নিয়তির এই রহস্যময় খেলাকে বঙ্কিম পূর্বাপর বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রকটিত করিয়াছেন—গীতার তত্ত্ব-প্রচার বা হিন্দুরাজ্যস্থাপনের আগ্রহের নিকট তাহাকে বলি দিতে চান নাই।

এখানে স্পষ্ট করিয়া মন্তব্য করা উচিত—দেশপ্রেমিক বা ধর্ম-প্রাণ দুঃসাহসী বীর যাহাকে বলে, সীতারাম তাহা ন'ন। হিন্দুধর্ম রক্ষা বা হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের প্রধান প্রেরণাও নয়। নানা ঘটনার যোগে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দুরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছিল, এই মাত্র। প্রতাপ সিংহের সহিত তাঁহার নাম এক সঙ্গে

উচ্চারিত হইতে পারেনা। শ্রীর রূপ-তৃষ্ণাই তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা। [বিস্তৃত আলোচনা (১।২) টীকায় দ্রষ্টব্য]

২। শ্রী

শ্রী 'সীতারাম উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র—সে প্রধান চরিত্র নয়, মূল চরিত্র নয়; কিন্তু উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে আপন আসন গ্রহণ করিয়াছে, সমস্ত ঘটনা-প্রবাহকে আপনার চারিদিকে আবর্তিত করিয়া তুলিয়াছে,—অথচ, এই উপন্যাসে, এমনি অদ্ভুত তাহার ভূমিকা যে, এই কেন্দ্রস্থান হইতে সে আপনাকে সরাইয়া লইতেই চায়, আপনাকে মুছিয়া ফেলিতেই সচেষ্ট! পৃথিবীর কর্মস্রোতে সে আপনার আশা-নিরাশা, প্রেম-ভালবাসা লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে না; অথচ তাহাকে লইয়া ঘটনাবর্তের সৃষ্টি; এমনি তাহার দুর্ভাগ্য—এই আবর্তের সমস্ত দায়িত্ব পরোক্ষভাবে তাহারই, ইহাও না মানিয়া উপায় নাই।

বঙ্কিমের বহু উপন্যাসের মত 'সীতারামে'ও যদি আমরা 'অদৃষ্টবাদের' চিত্র দেখি, তাহা হইলে বলিতে পারি—সে অদৃষ্টের খেলার প্রধান পুতুল সীতারাম নয়, শ্রী। শ্রী আজন্ম ভাগ্যবিড়ম্বিতা। গ্রহ-নক্ষত্রের বিধানে কি ঘটিবে, কোন্ পথে তাহা ঘটিবে তাহার ঠিক নাই; কিন্তু বিবাহের পর হইতেই শ্রী স্বামী সহবাসে বঞ্চিতা, কারণ. গ্রহবৈগুণ্যে সে 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হইবে। আপনার এই নিয়তি জানিবার পরে কোন্ স্নেহমমতাময়ী নারী আর আপনার স্বাভাবিক জীবনশ্রীকে ফিরিয়া পাইতে পারে? কোন্ কর্মকুশলা সাহসিনী নারী আর আপনার কর্মশক্তিতে, আপনার উদ্যোগ-উজ্জ্বল সাহসে আস্থা রাখিতে পারে, জীবন-পথে স্বাভাবিক প্রেরণায় আর পা বাড়াইতে পারে? পারে না, শ্রীও আর পারিল না। এইখানেই শ্রী-চরিত্রের 'অসঙ্গতি'—'অবাস্তবতা';—এইখানেই তাহার চরিত্র-কল্পনার ত্রুটী। কিন্তু এই 'অস্বাভাবিকতাই' অদৃষ্ট-বিধানে তখন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক,—আর তাহারই ফলে অদৃষ্টলিপি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকে আমরা কি দেখিয়াছিলাম? নিয়তি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে এই ঘটনার কেন্দ্রস্থলে টানিয়া আনিয়া বসাইয়া না দিল, ততক্ষণ পর্যন্ত

ভাগ্যবঞ্চিতা শ্রী শুধু রূপে নয়, বুদ্ধিতে, উদ্যোগে, ক্ষমতায়, কর্মশক্তিতে বঙ্কিমের অদ্ভুতকর্মা নারীদেরও মধ্যে অগ্রগণ্যা। সীতারামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে গঙ্গারামের রক্ষার জন্য যে বাণী উচ্চারণ করিল তাহা অমোঘ: "দেখ, দেবতা আছেন, ধর্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" (১।২) সীতারামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে সহধর্মিণীর সব মর্যাদা লইয়া বলিতে পারে—"আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। সর্বস্বের অধিকারিণী,—আমি শুধু তোমার দয়া লইব কেন?...এতকাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজও কাটিবে।" (১।৬)—বরং সে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহাকে পাপমুক্ত করিবে। (১।৬) কিন্তু তবু অমর্যাদা লইয়া স্বামী-সোহাগিনী হইবে না। এই আশ্চর্য নারীর যে চিত্র আমাদের চক্ষে চিরদিনের মতো লেখক আঁকিয়া দিয়াছেন—সে তাহার সেই সিংহ-বাহিনী মূর্তি। বঙ্কিমের আর কোন বীরকন্যা, বীরজায়ার চিত্রই এমন অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত নয়। ইহাই শ্রী, শ্রী যাহা ছিল। হয়ত মনে হইবে সেই মহামহিমময়ী মূর্তি একটু বেশী অসাধারণ; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন—অত্যন্ত অসাধারণ সেই বধ্যভূমির পরিবেশ, সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে অসাধারণত্ব আছে, তাহা ফুটিয়া উঠিবার সম্পূর্ণ অনুকূল সেই ক্ষেত্র। তাই সেই অসাধারণ অবস্থার যখন অবসান হয়, তখন উহার তীব্র স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় শ্রীও প্রায় অচেতন হইয়া পড়ে।

ইহার পরে অদৃষ্টলিপি জানিবার পর কিন্তু আর এই শ্রী নাই। তাহার উদ্যোগ, সাহস—সবই সে আপনার মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছে—সে জানিল অদৃষ্টবিধান—সে প্রিয়-প্রাণঘাতিনী। সঙ্কোচে, ভয়ে, দ্বিধায় সে আর আপন স্বভাবে সুস্থির নাই। কি ভাবে সে 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হইবে কে জানে? শ্রী শুধু জয়ন্তীর প্রভাবে নিষ্প্রভা হয় নাই, আপনার হৃদয়ের দ্বন্দ্বে—ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া সে রক্ষা পাইতে চাহিয়াছে। জয়ন্তীর অনুগত শিষ্যারূপে সে একটা দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিত্বকেই আশ্রয় করিতে চায়—আপনার প্রাণপ্রবাহকে পূর্বেকার স্বাভাবিক পথে আর কিছুতেই বহিতে দিবে না, তাহাকে জীয়াইয়া রাখিতেও বুঝি তাহার ভয়। জয়ন্তীর সন্ন্যাসিনীর আদর্শে সে তবু এই ভয়-সংকুল জীবনের মধ্যে একটা বাঁচিবার ঠাঁই খুঁজিয়া

পাইল। কিন্তু 'নিষ্কাম কর্মের' শত শিক্ষায়ও আর আপনার পূর্বেকার কর্ম-কুশলতা, সাহস, উদ্যোগ, আত্মনির্ভরতায় সে ফিরিয়া গেল না। যাইতে পারে না ; কারণ, সেই উদ্যোগ, কর্মশক্তি,—সব কিছুই তো পরিণামে তাহার প্রিয়-প্রাণবিনাশের মুহূর্তটিকে আগাইয়া আনিতে পারে।

কিন্তু শ্রী যতই সন্ন্যাসিনী হউক, সংসার বাসনা যতই সে সজ্ঞানে ও সবলে সংহার করুক, মানুষ ত মানুষই থাকিবে (৩।২৪), শ্রীরও পতিপ্রেম উবিয়া যায় নাই ; বরং ভাগ্য-বঞ্চিত প্রেম সন্ন্যাসের সংযমে একটা নাতিপ্রবল পতিহিতাকাঙ্ক্ষায় রূপায়িত হইয়াছে। ইহাতেও শ্রী প্রবল নয়, কারণ কোনো কর্মেই আর তাহার সাহস নাই। নাই বলিয়াই এই হিতাকাঙ্ক্ষা এমন অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর হইল ; সীতারামের সম্মুখে বসিয়া শ্রী রূপ ও বাক্যের মধু স্থষ্টি করিল, সীতারামের সর্বনাশ করিল।

সন্ন্যাসের মধ্য দিয়াও শ্রী আপন স্বভাবে সুস্থিরা হইতে পারে নাই—কর্মযোগে নয়, নৈষ্কর্মের একটা নিষ্ঠুর নিস্তেজস্কতায় দিনে দিনে শ্রী আরও অস্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। ঘটনাস্রোত তাহার চারিদিকে তাহারই প্রভাবে আবর্তিত হইয়া সীতারামের জীবনের কর্দম তুলিয়া আনিতেছে ;—সে তাহা দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট, নিঃস্পৃহ নয়, একেবারে নিষ্প্রভ। রাজ্য ছারেখারে যাইতেছে—শ্রী নিরুপায়। যে শ্রী সিংহবাহিনী-মূর্তিতে সমগ্র জনতার চক্ষে দেবী হইয়া ফুটিয়াছিল,—সেই শ্রী হইল তাহাদের কাহিনীতে 'ডাকিনী'। আর সত্যই তো, সীতারামের সম্মুখে সেই মধুভাষিণী সন্ন্যাসিনীর মত নিষ্ঠুরা, হৃদয়হীনা নারী আর কে'ছিল ?

দুঃখ হয় এই শ্রীর জন্য। আরও দুঃখ হয়—শিক্ষা-বৈগুণ্যে আদর্শের দ্বন্দ্বে সে আপনাকে আর উজ্জ্বল মূর্তিতে স্থাপন করিতে পারিল না বলিয়া। তবু রাত্রিশেষের শুভ্র তারাটির মত শ্রীই (৩।২৪) শেষবারের মত জীবনের চরম জ্ঞানকে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া গেল : "সন্ন্যাসিনী হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে।" উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়াইয়া ইহাই শ্রীর সাক্ষ্য—বঙ্কিমের সাক্ষ্য পৃথিবীর সম্মুখে।

তথাপি শ্রীর জন্য আমাদের দুঃখ জমিয়া উঠিতে পায় না। শ্রীর জীবনের শোচনীয় বিবর্তন বঙ্কিম উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখান নাই। 'সেই সীতারাম নাই'—এই কথা তাঁহার মুখে আমরা বারবার শুনিয়াছি ;—সেই শ্রী নাই—

ইহাও তিনি জানাইয়াছেন। কিন্তু জানান নাই যে, সেই শ্রী কেন নাই। সন্ন্যাসের মিথ্যা সংযমের বশে নয় ;—অদৃষ্টের ভয়ে আপন চরিত্রগত উদ্যোগ, সাহস, কর্মশক্তি সব খর্ব করিতে গিয়াই শ্রী আর সেই শ্রী রহিল না। ভয়ে, দ্বন্দ্বে আত্মসংকোচ ও প্রিয়প্রাণরক্ষাকল্পে প্রিয়-সঙ্গ পরিহার করিতে গিয়াই শ্রীর স্বভাব এমন অস্বাভাবিক হইয়া গেল—তাহার 'অকর্মই' হইল সমস্ত উপন্যাসের কাল। অথচ বঙ্কিম কারণটা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন না। এই জন্যই মনে হয় শ্রীর চরিত্র যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অসংগতি ও অস্বাভাবিকতা রহিয়া গিয়াছে। আজ এই জন্যই আমাদের মনে হয় শ্রী গ্রীক নাটকের জোকাষ্টা-লেয়াসের অপেক্ষাও বেশি মন্দভাগ্যা।

শ্রীর এই নৈষ্কর্ম্য, এই অস্বাভাবিকতা—ইহাও হয়ত অদৃষ্টেরই বিধান, না হইলে অদৃষ্টের চক্রান্ত এমন ভয়ঙ্কর রূপে সার্থক হইত কি করিয়া? লেয়াস-জোকাষ্টাও এমনি করিয়াই আপন অদৃষ্ট এড়াইতে গিয়া তাহা অনিবার্য করিয়া তোলে। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা সীতারামের উপর কম ফলে নাই; তবু সীতারামের পতনের বীজ তাহার নিজ স্বভাবে ছিল, ইহা বুঝিতে পারি। ঘটনাবৈগুণ্যে সেই বীজই বিষবৃক্ষ হইল—কতকাংশে স্বভাবতই বিষফল ফলিল। কিন্তু শ্রীর বেলা তাহা বলিবার উপায় নাই। তাহার স্বভাবে ফলে নাই—সেই আশ্চর্য স্বভাব বরং আপনাকেই খোয়াইয়াছে—তাহাতেই অদৃষ্টের প্রয়োজন এবং তাহাই নিয়তির বিধান। এইজন্যই শ্রী স্বভাবগুণে নয়, স্বভাব-বৈগুণ্যে নিয়তির নিয়মেই এত দুঃখ পাইল।

•

৩। জয়ন্তী

'সীতারাম' উপন্যাসে জয়ন্তীর ভূমিকাটি সামান্য নয়। বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখরে', 'আনন্দমঠে', অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যোগী, মহাপুরুষের প্রয়োজন হইয়াছিল ঘটনার মোড় ঘুরাইবার জন্য। 'সীতারামে' প্রত্যক্ষভাবে তেমন কোনো শক্তিধর পুরুষকে বঙ্কিম ঘটনাস্থলে টানিয়া আনেন নাই। অবশ্য মহাপুরুষ এই ক্ষেত্রেও আছেন (১।১৩, ২।৮), তবে গঙ্গাধর স্বামী সাক্ষাৎভাবে কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করেন না—তাঁহার মন্ত্রপূত ত্রিশূল ও জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাখ্যা পরোক্ষে উপন্যাসের গতি ফিরায়। তাই স্বীকার করিতে হইবে, বঙ্কিম জয়ন্তী চরিত্রের মারফৎ সেই অলৌকিকতার কার্যটি সারিয়া লইতে চাহিয়াছেন—

কিন্তু যতটা সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া, যথাসম্ভব লৌকিক পথে।

অবশ্য ইহাতে একটা বিপদও ঘটিয়াছে, 'চন্দ্রশেখরের', 'আনন্দমঠের' মহাপুরুষদের আমরা মানবীয় মাপকাঠি দিয়া বিচার করি না। তাঁহাদের চরিত্র আমাদের আলোচ্য হয় না, আমরা আলোচনা করি বঙ্কিমের এই অলৌকিকতার বিশ্বাস। কিন্তু জয়ন্তীকে তেমন করিয়া আলোচনার বাহিরেও রাখিয়া দিবার উপায় নাই। কারণ, জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী হইলেও মানুষই রহিয়াছে।

অথচ, বিপদ এই একেবারে 'মানুষ' করিয়া তাহাকে চিত্রিত করিবার সাধ্যও নাই—সে ঘটনার গতি বাড়ায় ও গতি ফিরায়; শুধু তাহাই নয়, সে বঙ্কিমের মনের একটি পরম আদর্শের বিগ্রহ। প্রফুল্ল যাহা করিয়াছে, শুধু তাই নয়, প্রফুল্ল যাহা অন্যবিধ পরিবেশে করিতে পারিত, জয়ন্তী তাহারই 'দৃষ্টান্ত' হইবে। প্রথম সংস্করণ সীতারামের শেষে বঙ্কিম এই কথাটি পরিষ্কার করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—"যাও জয়ন্তী প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুই রূপে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর।" নিষ্প্রয়োজনবোধে রস-স্রষ্টা বঙ্কিম এই কথাগুলি বর্জন করিয়াছেন, কিন্তু জয়ন্তী চরিত্রের পরিবর্তন করেন নাই;—সে চরিত্রের কি ধারণা বঙ্কিমের মনে ছিল, তাহা এই সমাপ্তি-বচন হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না। 'প্রফুল্ল গৃহিণী'—নিষ্কাম কর্মের সাধনা সে সংসারে, সমাজে দেখাইয়া দিবে। 'প্রফুল্ল'র শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাই নারীর পরিবেশ, নারী-জন্মের সাধ-স্বপ্ন লইয়া বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ তাহার ছিল। তাহাতেই আমরা জানি সে মানুষ, তাহার চিত্রও আমাদের নিকট তাই সহজে বিশ্বাস্য।

কিন্তু জয়ন্তীর পক্ষে সেই সুযোগ নাই। কোথা হইতে কোন্ পরিবেশের মধ্য দিয়া এই সন্ন্যাসিনী আপনার মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগ্নী স্বজনের বন্ধন ছেদন করিয়া এতখানি সরস স্নেহমমতা-ভরা হৃদয় লইয়া আসিয়া উদিতা হইলেন, তাহা আমরা জানি না—একটা অবিশ্বাসের বীজ রহিয়া যায়, অতিপ্রাকৃত কিছু হইলে না হয় পাশে সরাইয়া রাখিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাও নয়। অথচ সন্ন্যাসিনীর পক্ষে একটু বেশি রকমেই সে স্নেহ-সরস, বাক্-পটু, মানুষের সুখ-দুঃখে দরদী। তাহাকে ভালো

লাগে, না লাগিয়া উপায় নাই। তাহাকে মানিয়া লইতেও বাধা নাই। বঙ্কিম নিজেও তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই নিজের প্রশ্ন দিয়া আমাদের প্রশ্নকে চাপা দিয়া গিয়াছেন—'এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী ?' আজিকার দিনে হইলে কোনো বাউল বা বৈষ্ণবী সাধিকার এইরূপ একটা চিত্র অঙ্কন করা চলিত ;—রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে তাহা আমাদের নিকট অনেকটা গ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু বঙ্কিমের সংরক্ষণশীল আভিজাত্য-পূর্ণ চেতনা সহজিয়া বা মরমিয়া সাধকদের আমল দিত কিনা সন্দেহ। তিনি সন্ন্যাসিনীকেই আঁকিতে বসিয়াছেন—'এমন সন্ন্যাসিনী'ই 'সন্ন্যাসিনী'—ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য—না হইলে সনাতন ধর্ম রক্ষা করিবে কে ?

এই দুই প্রয়োজনেই বঙ্কিম জয়ন্তী চরিত্রের উদ্ভাবনা করেন : প্রথমত, উপন্যাসের ঘটনাবলীর প্রয়োজনে ; দ্বিতীয়ত, সন্ন্যাসিনীর আদর্শকে বা নিষ্কাম-কর্মযোগ সাধনার এই দৃষ্টান্তটিকে সাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য। বলা বাহুল্য, ইহাতে সত্যকারের অতিপ্রাকৃত না থাকিলেও অস্বাভাবিকতা থাকিবার কথা ; অলৌকিকতা না থাকিলেও অবাস্তবতা থাকিবার সম্ভাবনা। আর এই দুইই জয়ন্তীতে আছে। বঙ্কিমের এই দুই ধারণা জয়ন্তী চরিত্রের বিকাশের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু একবার জয়ন্তীকে কল্পনার ক্ষেত্র হইতে বঙ্কিম যেই জীবন্ত চরিত্রের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিলেন, অসংগতি অবাস্তবতা সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, তাহাকে একটা মানবীয় সত্তা না দিয়া বঙ্কিমের শিল্পী-মন আর নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। জয়ন্তী শুধু সন্ন্যাসিনী নয়, শ্রীর দুঃখে ছলছল-চক্ষু অগ্রজা, সুরসিকা বান্ধবী। বরং সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীকেই আমরা তখন আর তত বড় করিয়া দেখিতে পাই না। ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে এই অসামান্যা সন্ন্যাসিনী তাহার মন্ত্রপূত ত্রিশূল লইয়া যতই অসাধ্য সাধন করুক—মহম্মদপুর রক্ষা করুক, গঙ্গারামকে সত্য বলিতে বাধ্য করুক, আমরা দেখি তাহার হস্তার্পণে ঘটনার মূল গতি ফিরে নাই। বরং তাহার হস্তার্পণে সেই ঘটনার গতি আরও দুর্নিবার্য হইয়াছে। শ্রী তাহার উপদেশে নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছে ; জয়ন্তী এই অপটু শ্রীকেই 'রাজর্ষি'-গঠনের ভার দিয়া সীতারামের সর্বনাশের পথই প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে—ইহাই কি তবে তাঁহার সন্ন্যাস ও সাধনার বল, তাহার দিব্যদৃষ্টি ? অবশ্য শ্রীর সহিত নিষ্কাম কর্মের আলোচনায় তাহার

জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় পাই। কিন্তু তাহাতে তাহার চরিত্রের পরিচয় কতটুকু? চরিত্রের পরিচয় পাই কতকটা তাহার দরদী স্নেহভাষণে। বঙ্কিম এই জ্ঞান-বুদ্ধি-সচেতনা সন্ন্যাসিনীকে সহজে নিষ্কৃতি দিতে চাহিলেন না। হোক্ সে সন্ন্যাসিনী, 'মানুষ মানুষই থাকিবে'—এই সত্যটা এই আদর্শ সন্ন্যাসিনীকে দিয়া মুখ ফুটিয়া বলাইতে না পারিলে বঙ্কিম স্থির হইবেন কিরূপে? তাই জয়ন্তীকে তিনি এমন এক অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলিলেন, যাহাতে তাহার সন্ন্যাসের সমস্ত জ্ঞান-গর্বও ধূলিসাৎ হইয়া যায়—মানুষের বুকের ভাষা বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া আসে—সেই পরীক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানময়ী সন্ন্যাসিনীর জয় হইল না, পরাজয়ের মধ্যেও জয় হইল 'মনুষ্য-প্রকৃতির'। "কোথা হইতে পাপ লজ্জা আসিয়া সেই ইন্দ্রিয়-বিজয়িনী সুখ-দুঃখ-বর্জ্জিতা জয়ন্তীকে অভিভূত করিল"। (৩।১৮) এক মুহূর্তে আমরা জানিলাম—জয়ন্তী মানুষ; বড় সুন্দর মানুষ; মানুষের সবলতা ও দুর্বলতায়, মানুষের সহজ সংস্কারেই গঠিত মানুষ।

জয়ন্তীর এই পরীক্ষার দৃশ্যে কিন্তু বঙ্কিম তাঁহাকে শুধু মানবীই করেন নাই, অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির বলে সন্ন্যাসের অপ্রত্যক্ষ দুর্বল ক্ষেত্রটিও উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। যে মুহূর্তে জয়ন্তীর মনে সন্ন্যাসের সূক্ষ্ম অহংকার দেখা দিয়াছে, সেই মুহূর্তেই "পাপ লজ্জা" আসিয়া তাহার সমস্ত অহংকার চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। ইহার পরে জয়ন্তী আর আপন জ্ঞান-গরিমার দর্প করে নাই। জয়ন্তী জানিয়াছে, 'আমি বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বৃথা অভিমানে অভিমানিনী।' (৩।২০) এই মানবীয় দুর্বলতা আবিষ্কারের শেষে বঙ্কিম তাহাকে আবার মধুরতর এক আদর্শ সন্ন্যাসিনীতে পরিণত করিয়াছেন—কিন্তু মানবীয়তার ওপারে গিয়া জয়ন্তী আর দাঁড়ায় নাই। কারণ, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে। আদর্শ-সন্ন্যাসিনী আঁকিতে বসিয়াও বঙ্কিম এই কথা ভুলিতে পারেন নাই।

অন্যান্য চরিত্র

সীতারাম' বঙ্কিমের আদর্শ-প্রচারের 'ফল'; তাই সেই সব চরিত্রেরই উপর প্রধানত দৃষ্টি পড়ে—যাহাদের মধ্য দিয়া বঙ্কিমের আদর্শের উদ্দেশ পাওয়া যায়। আমরা সীতারাম-শ্রী-জয়ন্তীকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ি। যে সব ছোট খাটো

চরিত্র পারিপার্শ্বিক হিসাবে এই ঘটনা-প্রবাহে এক-আধবার ঝলকিয়া উঠে তাহাদের বড় বেশি দেখিতে চাহি না।

৪। গঙ্গারাম

তাই গঙ্গারামের চরিত্র আমরা একবার চাহিয়া দেখি—বঙ্কিম তাহাকে দ্বিতীয় পংক্তির মানুষ করিলেও কম মর্যাদা দেন নাই। আমরা জানি গঙ্গারাম একেবারে ভীরু পশু ছিল না। বিপাকে পড়িলে সে সাহস করিয়া ফকিরের মুখেও লাথি মারে। একবারের মত সেও বধ্যভূমিতে সীতারামের প্রয়াসে প্রাণ ফিরিয়া পাইয়া সীতারামের কি হইবে, তাহা ভাবে। কিন্তু তথাপি সে আত্মসর্বস্ব সীতারামকে ছাড়িয়া সীতারামের অশ্বে আরোহণ করিয়া পলাইতে পারিলেই বাঁচে। ইহার পরে তাহার প্রবল রূপতৃষ্ণা যখন জাগিয়া উঠিল, তখন তাহার অধোগতির পথে কোনো বাধাই রহিল না। সে সীতারাম রায় নয়, হিন্দুরাজ্যগঠনের স্বপ্নও তাহার নাই। অধোগতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার মতো তেমন কোনো প্রবল শক্তিই তাহার ছিল না। তাই চরম কৃতঘ্নতায় সে ডুবিবে, তাহাতে আর বিস্ময় কি? তবু যে শ্রীকে কামানের মুখে বুক পাতিতে দেখিয়া গঙ্গারাম সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতেই প্রমাণ, বঙ্কিম তাহাকে হীনপুরুষ-রূপে চিত্রিত করিলেও একেবারে অমানুষ করিয়া ফেলেন নাই। এ কৃতিত্ব বঙ্কিমের, গঙ্গারামের নয়।

৫। চন্দ্রচূড়

চন্দ্রচূড় ঠাকুর বা চাঁদশাহ ফকিরকেই বা আমরা কতটুকু মনে রাখি? তবু চন্দ্রচূড় অবিস্মরণীয়। আদর্শনিষ্ঠ, কর্মকুশল পুরুষ তিনি; কিন্তু যতটা কৌশলী ততটা হয়ত সুব্যবস্থাপক ন'ন। তিনি গঙ্গারামের চক্রান্ত হইতে মহম্মদপুর রক্ষা করিবার জন্য কার্যত প্রায় কিছুই করিতেছিলেন না—শুধু ভগবানকে ডাকিতেছিলেন। তাহা ছাড়া, সীতারামের তিনি গুরু। কিন্তু যে দৃঢ়তা ও মর্যাদা তাঁহার স্বভাবে থাকিলে তিনি সীতারামের পতনের পথে একটা বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন, তাহাই বা চন্দ্রচূড় ঠাকুরের চরিত্রে কোথায়? জমিদারের দেওয়ান বা পুরোহিতের মত দুই-একটা সুপরামর্শ তিনি দিয়াছেন, কিন্তু সাহস করিয়া সীতারামকে তিরস্কারও করিতে পারেন নাই। তাই শেষ পর্যন্ত চাঁদশাহ ফকিরের মত তিনিও

দেশত্যাগী হইয়াছেন, কাশীযাত্রী হইয়াছেন। অথচ, দায়িত্ব তাঁহারও কিছু কম ছিল না। হিন্দুরাজ্যস্থাপনের স্বপ্ন সীতারাম অপেক্ষা তাঁহারই মনে বেশি প্রবল ছিল। কিন্তু যত বীর্যবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই হোন্, সীতারামের যত শুভানুধ্যায়ীই হোন্, চন্দ্রচূড় এমন কোনো ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন না, যে ব্যক্তিত্বের বলে তিনি হিন্দুরাজ্যস্থাপনে গুরুর পদ গ্রহণ করিতে পারেন, শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী হইয়া উঠিতে পারেন।

৬। রমা

সীতারামের জীবনে আসলে যে দুইটি শক্তি প্রবল ছিল তাহা তাঁহার দুই পত্নী—রমা ও নন্দা।

রমা উপন্যাসের খানিকটা স্থান জুড়িয়া আছে। উপন্যাসের ঘটনা-বিবর্তনের দিক হইতে তাহার স্থান আছে, অবশ্য সেই স্থানও গৌণ—"সীতারামের স্ত্রী হইয়াও রমা সীতারামের শত্রু" (১।১০)। সীতারামের পক্ষে সে আশ্রয়-কেন্দ্র না হইয়া ক্রমেই অসহনীয় হইয়া উঠিল—'ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানিতে' সীতারামের মনে শ্রীর স্মৃতি আরও জাগাইয়া রাখিল, শ্রীর রূপগুণের আকর্ষণ বাড়াইয়া দিল। দ্বিতীয়ত, আপনার অন্ধ ও মূঢ় আশঙ্কার বশে সে গঙ্গারামের সর্বনাশের পথ নির্মাণ তো করিলই, অধিকন্তু সেই উপলক্ষে বিরক্ত সীতারামের মনকে আরও বিমুখ, বিপর্যস্ত করিয়া দিল। রমার কলঙ্ক মোচন হইল বটে, কিন্তু এমন মূঢ় অযোগ্য পত্নী লইয়া সীতারাম তাহাতে কি সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন? তারপর আপনার মৃত্যুর মধ্য দিয়াও সে শুধু নিজের উপরে নয়, সীতারামের উপরেও একটা সূক্ষ্ম প্রতিশোধ লইল। রমার মৃত্যুতে সীতারামের অপরাধ অবশ্য ছিল, কিন্তু অপরাধটা সম্পূর্ণই একা সীতারামের স্কন্ধে গিয়া পড়িল। সত্যই কি অপরাধ একা সীতারামের? আর ঠিক এইরূপ স্থলে অপরাধী যাহা করে, সীতারামও তাহাই করিলেন। নিজের অপরাধ নিজের কাছে যখন স্পষ্ট হইয়া ওঠে, তখন আত্ম-ধিক্কার স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা পরের চক্ষে ধরা পড়িলে, তাহাতে ক্ষোভই বাড়িয়া যায়। আপনার উপর যে ক্রোধ, তাহাই পরের উপর অন্ধভাবে বর্ষণ করিয়া অপরাধী একটা আত্মতৃপ্তির উপায় করিয়া লয়। অতি নিপুণভাবে বঙ্কিম এই মনস্তাত্ত্বিক সত্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। সীতারামও তাহাই করিলেন,

পতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইলেন;—রমার মৃত্যু পরোক্ষে সেই দিকেই তাঁহাকে ঠেলিয়া দিল। উপন্যাসের মধ্যে প্রধানত এই তিনটি উদ্দেশ্য রমা সিদ্ধ করিতেছে।

বলা বাহুল্য, রমার চরিত্র কোনোখানেই সীতারামের যোগ্য নয়। সীতারামের জীবনের শূন্যতাকে নিঃসীম করিয়া তুলিবার জন্যই যেন তাহার প্রয়োজন। সে প্রয়োজনও সে ভাল ভাবেই সিদ্ধ করিয়াছে।

কিন্তু ইহার পরে আরও গভীরতর সত্যটির আমরা সম্মুখীন হই। সত্য বটে রমা রাজরাণীর দায়িত্ব গ্রহণের অযোগ্যা; সত্য বটে অন্ধ ভীতিবশে অসম্ভব মূঢ়তা সে দেখায়। কিন্তু তদপেক্ষাও অসম্ভব মনে হয় রমার গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনা; আর বিচারক্ষেত্রে রমার অমন অকপট সত্যভাষণ একটু অতিরিক্ত নাটকীয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা স্বীকার করিতে পারি—রমা-চরিত্র-অঙ্কনে বঙ্কিম রাজারাজড়ার কথা ভুলিয়াছেন, আদর্শের তাগিদও বিস্মৃত হইয়াছেন। অত্যন্ত সহজভাবে বাঙালী সংসারের একটি সত্যকারের গৃহবধূর চিত্রই তিনি এখানে মূলত আঁকিয়া তুলিতেছিলেন। অবস্থার চাপে তাঁহার তুলির লেখন বারে বারে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। তাই মনে হয় রমা যেন বড় বেশী অসম্ভব রকমের নির্বোধ, বড় অকারণে ভীতা। ঘটনার নাটকীয় সংস্থানের লোভে বঙ্কিম এই চিত্রে একটু বেশি রঙ না ফলাইয়াও পারেন নাই; তাহাতেই আবার মনে হয় সেই ভীতু রমা কি এত শক্তি রাখে? কিন্তু তবু সন্দেহ নাই,—বঙ্কিম এইখানে একটি বাঙালী হিন্দুপরিবারের সত্যকারের বধূ-চরিত্রই আঁকিয়া ফেলিয়াছেন—যাহারা মুসলমানের নামে ভয় পায়, স্বামীর রাজৈশ্বর্য অপেক্ষা বেশি চায় গৃহের শান্তি। অতি করুণ দরদী ভাষায় বঙ্কিম জানাইতেছেন "রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যুঁই ফুলের মত বড় কোমল প্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু সকলই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়।" (১।১০)। এমনি একটি প্রকৃতি বুঝি ছিল স্বল্পভাষিণী কুন্দেরও (বিষবৃক্ষ), ভাগ্য তাহাকেও বিড়ম্বিত করিয়াছে। কিন্তু তবু সে পরিবেশ নিছক পারিবারিক। রমার পক্ষে সেদিকে তেমন জটিলতা ছিল না; কিন্তু "বিবাদে রমার বড় ভয়—সীতারামের সাহসকে ও বীর্য্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়।"

(১১১০)। অন্তঃপুরের মধ্যে বসিয়া বাহির সম্বন্ধে আমাদের পুরনারীদের ধারণা সাধারণতই অপ্রাকৃত হয়। সেই বাহিরের ঘটনাকে এইরূপ চির-শঙ্কিতা ভীরু প্রকৃতি যে বিকৃত করিয়া বিভীষিকার মত দেখিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আর, একবার এই বিকৃতি পাইয়া বসিলে ইহারা যে কতদূর অবিবেচনাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহারও স্থিরতা নাই—বিশেষত যদি স্বামী-স্বজন কেহ নিকটে না থাকে, আর সন্তানের মমতা তাহাকে তাড়না করে। এই পর্যন্ত যেমন রমার চরিত্রে সত্য আছে, তেমনি আর একটি সত্য—একটি রাণীর মত মহিমা তাহাতে বিকসিত হইতে দেখা যায় তাহার বিচার-সভায়। সেখানে অবস্থাটাই একটু অসাধারণ, অস্বাভাবিক। এই অবস্থাটা সৃষ্টি করিবার জন্য লেখক চন্দ্রচূড়কেও ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু একবার অবস্থা মানিয়া লইলে রমাকেও সেখানে মানিতে বাধা হয় না। তখন দেখি সে তো সেই রমাই আছে—সাহসে বুক বাঁধিয়া বারেবারে ভরসা হারাইতেছে, আবার সঙ্কল্প আঁটিতেছে; শেষ পর্যন্ত পুত্রের মুখ দেখিয়া আবার সে সাহস সঞ্চয় করিতেছে। ইহাও সেই ভীতা, শঙ্কিতা, সন্তানগত-প্রাণা রমাই। অবস্থান্তরে সে শুধু মরীয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইহার বেশি আর কিছু নয়। কিন্তু একবার মহারাজের কলঙ্কমোচন হইলে সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—মৃত্যুকে ডাকিয়া বরণ করিল। সেই মধুর-ম্লান-হাসিনী, স্বেচ্ছায় মৃত্যুপথ-যাত্রিনী এই রমাকে বাঙলার গৃহবধূ বলিয়া চিনিতে কাহারো দেরী হয় না।

রমার জীবনের দুর্ভাগ্য এই যে, সে সত্যই সাধারণ ভাগ্যবান্ পরিবারের গৃহবধূ হয় নাই, হইয়াছে এক রাজ্যস্থাপয়িতার পত্নী। সে যোগ্যতা তাহার নাই, সে মর্যাদাও সে চায় না। বরং সেখান হইতে আপনাকে সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অযোগ্যতার ফল ফলিবে না, এমন হইতে পারে না। তাহার ভয়-বিকারগ্রস্ত অবিবেচনা অনিবার্যভাবেই বিপদ ঘনাইয়া তুলিবে। সে অবিবেচনার ফলও ফলিবে, আর সে নিজেই হইবে তাহার প্রথম বলি—ইহাও এক করুণ নিয়তি।

৭। নন্দা

নন্দা চরিত্র যেন অনেকাংশেই রমা চরিত্রের অন্য পিঠ। সীতারাম বলিতে চাহেন, নন্দা তাঁহার মহিষীপদ-গ্রহণের যোগ্যা নহেন। কিন্তু সত্যসত্যই

সীতারামও শেষ অবধি স্বীকার করেন—নন্দা তাঁহার মহিষী। এই দুই উক্তির মধ্যে বিরোধ নাই। শ্রীর রূপেগুণে মুগ্ধ সীতারাম শ্রী ছাড়া কাহাকেও মহিষীর যোগ্য বিবেচনা করিবেন না, ইহা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাও সত্য যে, নন্দা আ-জন্ম রাজ্ঞী নহেন,—তাঁহার চরিত্রে রাণীর মহিমা প্রথমাবধি চক্ষে পড়ে না। তখনো তিনি ছিলেন অন্যতমা স্ত্রী, রমার সৌভাগ্যে সপত্নীসুলভ একটা ঈর্ষ্যাও তাঁহার আছে। কিন্তু তথাপি তিনি গৃহিণী, গৃহকর্ত্রী, বড় জমিদারের সংসারে মোটামুটি দায়িত্বের কাজও তিনি পালন করিয়া যান—দায়িত্ব-গ্রহণও তিনি করেন। সীতারামের ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে রমার মত তাই তিনি মুষড়িয়া পড়িলেন না; বরং আপনার ভিতরে যে শক্তি ছিল, তাহারই বলে একটু একটু করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে গৃহকর্ত্রীর মত আপনাকে বিকসিত করিয়া চলিলেন। রাণী হইবার সাধ তাঁহার নাই; কিন্তু সাধ্যও নাই—এমন কথা তখন আর তাঁহার সম্বন্ধে বলা চলে কি? তখন তিনি অগ্রজার মত রমারও শুভানুধ্যায়িনী হইয়াছেন, আর সপত্নীর মত কোনো ঈর্ষ্যা পোষণ করেন নাই। তিনি-ই আত্ম-উদ্ধারের পথে রমাকে চালিত করিলেন, তাহার সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করিলেন। তারপর রমার মৃত্যুর দিনেও তাহার অগ্রজার মত একমাত্র বান্ধবী হইয়া রহিলেন। গৃহকর্ত্রী তিনি, উপযাচিকা প্রণয়িনী নহেন,—রাজমহিষীর গুণগ্রাম তখন তাঁহাতে বাস্তবিকই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই সাধারণ স্ত্রীর মত চাটুকারিতা না করিয়া একটু তীক্ষ্ণভাবেই তিনি সীতারামকে রমার মৃত্যুর জন্য দায়ী করিলেন। সে মুহূর্তে সেই অবস্থায় কাজটা হয়তো অনুচিত হইয়াছে—নন্দা পত্নী হিসাবে সুবিবেচনার ও সুকৌশলের পরিচয় হয়তো দেন নাই। কিন্তু মানুষ হিসাবে কিংবা মহিষী হিসাবে দেখিলে নন্দার এই অপ্রিয় ভাষণ কি অনুচিত বলা চলে? বরং ইহাই কি বলা চলে না, সীতারাম যখন রাজকীয় গুণাবলী হইতে ক্রমশ স্খলিত হইতেছিলেন, তখন নন্দাই মহিষীর মহিমায় ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছিলেন? ইহারই চূড়ান্ত পরিচয় দেখি জয়ন্তীর বিচার-ক্ষেত্রে। সেখানে এক মুহূর্তে বুঝি—নন্দা রমা নহেন, নন্দা আর সেই সাধারণ কর্মিষ্ঠা গৃহকর্ত্রীও নাই, মহীয়সী রাজরাণী হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার পরে দেখি দুর্ভাগ্যের দিনে নন্দার শেষ মহিমা—তাঁহার গাম্ভীর্য, সুবিবেচনা, সীতারামের পতনের জন্য গভীর মর্মবেদনা, সীতারামের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শেষ ব্যাকুলতা—সব কিছুতে মিলিয়া নন্দাকে যে মর্যাদা দিল, তাহাতে বুঝিতে বাকি থাকে না—নন্দা আজন্ম রাজ্ঞী

না হইলেও রাজ্ঞীর সম্ভাবনা তাঁহাতে ছিল, এবং ক্রমেই তাহা ফুটিয়াছে। তাই আত্মস্থ সীতারাম তাঁহাকে সেইরূপে দেখিয়া স্বীকার করিয়াছেন—নন্দা মহিষীই। স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে সীতারাম পূর্বেই বুঝিতেন, রমা তাঁহার রাজ-রাণী হইয়া উঠিবেন।

আতিশয্য না করিয়া, বেশি অস্বাভাবিকতা আরোপ না করিয়া এই স্বনির্ভরা (সূর্যমুখার মত ?) পার্শ্বচরিত্রটিকে বঙ্কিম ধীরে ধীরে সত্যই রাণীর মর্যাদায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তাহাতে ভুল নাই।

জনতার চরিত্র

বঙ্কিমের কাল পর্যন্ত সাধারণ মানুষ আপন মর্যাদায় উপন্যাসে বিশেষ স্থান লাভ করিতে পারে নাই—তাহার স্থান হইয়াছে প্রধানত পার্শ্বচর হিসাবে, পাদপূরক হিসাবে। অবশ্য পাশ্চাত্য জগতে গণতান্ত্রিক কারণে না হইলেও অন্য কারণে সামাজিক বৈষম্য ততদিনে কিছুটা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, শ্রেণী-সংঘর্ষের বাণীও ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 'সাম্য'-প্রণেতা বঙ্কিমের তাহা একেবারে অগোচর ছিল না। কিন্তু সাহিত্যে ডিকেন্‌স্ যতটা সামাজিক সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিকতর সমস্যামূলক সাহিত্যের কথা বঙ্কিমের না জানিবারই কথা।

আর বঙ্কিমের সাহিত্য-দৃষ্টি ঠিক ডিকেন্‌স্-জাতীয়ও ছিল না। তাঁহাকে স্কট বলিলেও অবশ্য তেমনি ভুল হইবে।—তিনি ছিলেন আদর্শ-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ,—ধর্মবেত্তা মনুর ন্যায় নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন না করুন, অনুরূপ দায়িত্ব-বোধ লইয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটা সুস্থির ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবেন,—এইরূপ একটা প্রয়াস তাঁহার ছিল। তিনি পাশ্চাত্য জগতের চিন্তা-ভাবনা-দর্শন সব কিছু বিচার করিয়া সমাজকে সেই ভাবে যথাসম্ভব সংস্কার করিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বিশুদ্ধ ব্রহ্মণ্য আদর্শের ভিত্তির উপর। এই জন্য তিনি সমন্বয় ও সঙ্গতি করিতে গিয়া হিন্দুশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে পূর্ণ মানবতার আদর্শ-প্রতিষ্ঠাও করিয়াছেন—এইরূপ না হইলে তাঁহার জাতীয় আত্মমর্যাদা-বোধও স্বস্তি পাইত না। স্বভাবতই এই ব্রাহ্মণের আভিজাত্যবোধ অতি প্রখর ছিল। বঙ্কিমের গাম্ভীর্য, মর্যাদাবোধ, সংযত ভাষা, এমন কি পরিচ্ছন্ন রঙ্গ-পরিহাস (এই 'হিউমার' প্রায় তাঁহারই নিজস্ব সৃষ্টি—ইহা

হুতোমি, এমন কি দীনবন্ধু-মধুসূদনের রঙ্গব্যঙ্গেরও অপেক্ষা অনেক স্বচ্ছ ও শুদ্ধ)—এই সমস্তই তাঁহার মানসিক আভিজাত্যের পরিচায়ক।

নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়—বঙ্কিম সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা অনুভব করিতেন; তাহাদের সমস্যাও যে না বুঝিতেন, তাহা নয়; তাহাদের যে একটা মর্যাদা আছে; তাহার বোধ তাঁহার ছিল। বস্তুতঃ বঙ্কিমের যুগ বিবেচনা করিলে তাঁহাকে বঙ্গদেশে চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রণী পুরুষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই 'সাম্য' ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনা তাঁহারই পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল।

সাধারণ মানুষ সীতারামে অনেক আছে; যথা—মিশিরজী, ভাণ্ডারা, পাঁচকড়ির মা, মুরলা, যমুনা, প্রভৃতি। রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদও (৩৷৯; ৩৷১৭) সাধারণ মানুষ—অর্থাৎ বিশিষ্ট চরিত্র নয়, "দুই জন নিরীহ গৃহস্থ লোক।" তবে তাহাদিগকে একেবারে জনতার প্রতিভূ বলা চলিবে না। রামচাঁদ খরচপত্র করিয়া ঘর-দুয়ার করিয়াছে (৩৷৯); শ্যামচাঁদও গহনাপত্র রাখে (৩৷১৭)। ইহারা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই লোক—সেই শ্রেণীর লোক হিসাবেই 'নিরীহ গৃহস্থ' শান্তিতে থাকিতে চায়, গল্প গুজব করে, জয়ন্তীর দণ্ডদানের মত 'কাণ্ড' দেখিবার জন্য হুজুগ করে, ন্যায়-অন্যায় বোঝে, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস পায় না, প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলেই খুসী হয় (৩৷২৫)। ইহাদের উপর বঙ্কিমও ভরসা রাখিতেন না। সম্ভবত কাহারও রাখা সম্ভব নয়। যে কোনো দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত বর্গের ইহাই ত সহজ মনোভাব, স্বাভাবিক আচরণ।

কিন্তু বঙ্কিম জনতাকে দেখিবেন কি দৃষ্টিতে? সে যুগের জনতার উপর বঙ্কিম বিশেষ আস্থা রাখিতেন না, কেহই রাখিতেন না, রাখিতে পারিতেন না। কোন সত্যকারের গণচরিত্রের চিত্র তাই তাঁহার বইয়ে নাই—ব্যক্তি-হিসাবে বরং কিছুটা মর্যাদা তাহারা বঙ্কিমের দৃষ্টিতে পাইয়াছিল। তবু বঙ্কিমের চক্ষে জনতার একটা সমূহ-গত সত্তা (crowd) নিশ্চয়ই ঠেকিয়াছিল, বঙ্কিম এই জনতাকে বিস্মৃত হন নাই।

'সীতারামে' আমরা তিনটি বিরাট দৃশ্যে এই জনতার সাক্ষাৎকার পাই। দৃশ্যপট বিস্তৃত; কালও অতি সংকটময় (tension-প্রধান), আর পাত্ররাও অসাধারণ। প্রথমটিতে গঙ্গারামের জীবন্ত সমাধি হইবে (১৷৪);

দ্বিতীয়টিতে রাজরাণী রমার বিচার হইতেছে (২।৩), আর শেষটিতে (৩।১৮) সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর সর্বসমক্ষে বেত্রাঘাত হইবে। এই তিনটি বিরাট দৃশ্যকে বঙ্কিম নাটকীয় পদ্ধতিতে ঘাত-প্রতিঘাত-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু দৃশ্যপট পরিকল্পনা করিয়াছেন যেন মহাকাব্যের ব্যাপ্তি মনে রাখিয়া। তিন-খানে তিনটি দৃশ্যেই জনতা কিন্তু ঠিক সাক্ষী-সদৃশ নয়। বঙ্কিমের তিনটি দৃশ্যে আমরা তাহাদের তেমন নির্বিকার দেখি না, রাজনীতি বিষয়ে তাহাদের নিরপেক্ষতাও বুঝি না। দৃশ্যের ঘটনা-চাঞ্চল্যে তাহারা চঞ্চল হয়, আন্দোলিত হয়। কিন্তু তবু তাহারা রাজনীতি বিষয়ে উদ্যোগী নয়—তাহাদের ইচ্ছাশক্তি যেন চাপা পড়িয়াছে; সেখানে তাহারা নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী। একবার জয়ন্তী 'মার, মার, শত্রু মার' বলিয়া যখন রণচণ্ডীর বেশে দাঁড়াইল, তখন সেই জনতার অন্তরের ইচ্ছা একটা ধর্মগত প্রেরণা পাইল, প্রচণ্ড উদ্যমে কর্মশক্তিতে তাহা ফাটিয়া পড়িল। অর্থাৎ এই জনতা শুধু নিষ্ক্রিয়, উদাসীন সাক্ষী নয়, সে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক এবং নেতৃত্ব লাভ করিলে সে অসাধ্য-সাধনও করিতে পারে। কিন্তু নেতৃত্ব যেখানে নাই, সেখানে অমন মহৎ প্রয়াসের পরে তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না,—বিক্ষুব্ধ জনতার সাধারণ মানুষ তখন আবার আপনার প্রাণ বাঁচাইবার পথ খোঁজে (১।৫)। ইহাও অসাধারণ বা অস্বাভাবিক নয়। এই দৃশ্যে জনতাকে বঙ্কিম একটু সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন—হয়ত হিন্দু-বিজয়ের একটা দৃশ্য আঁকিবার সাধ তাহার একটা কারণ। কিন্তু অন্য দুইটি দৃশ্যেও জনতার প্রতি তিনি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন নাই—তাহাদের কথা-বার্তায় যে অস্থিরচিত্ততা, মতামতের বিরোধ থাকিবার কথা, তাহা দেখাইয়াছেন; কিন্তু মোটামুটি তাহারা যে সুস্থ মানসিকতার অধিকারী, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করিবার মত উদ্যোগী নয়—কিন্তু অন্যায় অবিচারে তাহারা বিক্ষুব্ধ হয়; তাহাদের বিচারবুদ্ধি মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে না;—মস্তিষ্কহীন জনসঙ্ঘ (unthinking crowd) তাহারা নয়; বঙ্কিম বরং তাহাদের সাধারণ সুস্থবুদ্ধির অধিকারীই করিয়াছেন। সেক্স্পীয়রের অনেক জনতার (জুলিয়াস সিজার) মত ইহারা অব্যবস্থিতচিত্তও নয়; ব্রুটাস্-অ্যাণ্টনির দোটানায় অনিশ্চিতভাবে তাহারা আলোড়িত হয় নাই।

'সীতারামে' বঙ্কিমের পাঠকমাত্রই বঙ্কিমের পরিণত শক্তির ও তেমনি পরিণত মতবাদের একত্রে সমাবেশ দেখিবেন। এমন কি, সাহিত্য হিসাবে উপভোগ করিতে গিয়া তাঁহার পরিণত আদর্শবাদের অতি-প্রয়োগ ও তজ্জনিত অপ-প্রয়োগে ব্যথিতও হইবেন। কারণ, 'সীতারাম' বঙ্কিমের শেষ কীর্তি হইলেও শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়,—ইহাতে তাঁহার নানাবিধ ত্রুটিই রহিয়াছে। এমনই একটি ত্রুটি অদৃষ্টবাদ লইয়া বাড়াবাড়ি।

অদৃষ্টবাদে বঙ্কিম যে-কোনো সাধারণ ভারতবাসীর মতই বিশ্বাস রাখিতেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সম্ভবত বঙ্কিমের এমন একখানি উপন্যাসও নাই, যাহাতে তিনি কিছু না কিছু অদৃষ্টের দোহাই দিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য-পড়া বঙ্কিম এই অদৃষ্টবাদকে একটা মহত্তর-গাম্ভীর্য দিতে চাহিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। গ্রীক্ সাহিত্যের—বিশেষত গ্রীক নাট্যের, প্রধান একটি কথাই এই অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ—নিয়তি নিষ্করুণা। ঈস্কাইলাস বলিতে চাহিলেন—নিষ্করুণা হইলেও তিনি ন্যায়পরায়ণা। কিন্তু সফোক্লিস তাহা মানিতে চাহেন নাই—মানুষের পরিণামই তাঁহার শিল্পী-মনকে আবিষ্ট করিয়াছে। ইউরীপেডিস্ অবশ্য সেইখানেও থামেন নাই—নিয়তি শুধু নিষ্করুণা নয়, মানব-ভাগ্যের প্রতি কেবল বিরূপা নয়, মানুষ দেবতাদের নিকট একান্তই তুচ্ছ—যেন খেলাচ্ছলে মারিবার কীটপতঙ্গ! এই কঠিন নিয়তিবাদ খ্রীষ্টীয় কল্যাণবাদের সহিত মিশ-খাওয়ানো সহজ নয়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে তবু তাহার একটা লৌকিক ব্যাখ্যান আছে—দেবতারা আমাদের পরীক্ষা করিয়া বাজাইয়া লন। কিন্তু বঙ্কিমের মন অমন স্থূল সমাধানে খুসী হইবার নয়। মানব-ভাগ্য তিনি দেখিয়াছেন—বেশি করিয়াই দেখিয়াছেন; কিন্তু সমস্তটাকে একটা অদৃষ্টের বিধান ছাড়া তিনি অন্য কিছুই ভাবিতে চাহেন নাই। ইহা তাঁহার এক সান্ত্বনাও বটে। —'নিয়তি কেন বাধ্যতে?' না হইলে মানুষের অবলম্বন কোথায়?

এই অদৃষ্টবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বঙ্কিম অনেক রকম কৌশলের শরণ লইয়াছেন। তাহার মধ্যে—কোষ্ঠী ও জ্যোতিষীর গণনা একটি (টীকা দ্রষ্টব্য); স্বপ্নের (বিষবৃক্ষ) বাড়াবাড়িও একটি; দেবতার শুভাশুভ-সূচক নির্মাল্য প্রভৃতিও (কপালকুণ্ডলা) একটি; আর সর্বশেষে—অলৌকিক-শক্তি সম্পন্ন পুরুষ, যোগবল, এমন কি মন্ত্রপূত ("magnetised") ত্রিশূলও

তাহার পরম আশ্রয়। এই সব কৌশলের মধ্যে এই জ্যোতিষীর বচন ও অলৌকিক মহাপুরুষদের সাহায্য—দুইটিতেই বঙ্কিম সম্ভবত বিশ্বাস করিতেন। এই দুইটিই কিন্তু একটু স্থূল কৌশল। এই দুইটিই এখন শিক্ষিত পাঠকের চক্ষে প্রায় অচল। সম্ভবত সেক্সপীয়র-পড়া বঙ্কিম জানিতেন অতি-প্রাকৃতের ব্যবহার একেবারে অন্যায় নয়। তাহা ছাড়া বঙ্কিমের যুগে এইরূপ অপ্রাকৃতে বিশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিকই ছিল। আজ অবশ্য আমরা যোগবলে শৈবলিনীর সংস্কার সাধন সহ্য করিতে পারি না; বড় জোর কুন্দের 'স্বপ্নদর্শন' পর্যন্ত মানিতে পারি, কপালকুণ্ডলার ('বিল্বপত্র পড়িয়া গেল') ভবানী দর্শনও হয়তো সহ্য করিতে পারি। কিন্তু ইহাদের অস্বীকার করিয়া বঙ্কিম-সাহিত্য-আস্বাদন সম্ভব নয়, কারণ লেখক নিজে এগুলি বিশ্বাস করিতেন।

এতৎসত্ত্বেও যে 'সীতারাম' উপাদেয় সাহিত্য বলিয়া এখনো গণ্য হইতে পারে, তাহার কারণ: (১) বঙ্কিমের গল্প বলিবার অদ্ভুত শক্তি আর 'সীতারামে' সেই শক্তি আরও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত, এবং তাহা উন্নত রচনা-কলার সহায়তাও লইয়াছে; (২) সীতারাম উপন্যাস হইলেও উহার ঘটনা-উদ্‌ঘাটনে ও বিন্যাসে একটি নাটকীয় পদ্ধতি রহিয়াছে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইহার অনেক অংশই অতুলনীয়; (৩) চরিত্র-সৃষ্টিতে, বিশেষত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে (সীতারাম, রমা, গঙ্গারাম প্রভৃতি,—টীকা দ্রষ্টব্য) বঙ্কিমের পরিণত শিল্প-শক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। বঙ্কিমের আসল শক্তি এইখানে—সত্যই তিনি মানুষকে জানিতেন—তাহাকে চিত্রিত করিতে পারিতেন, এবং মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাস তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে কখন কখন তাঁহার আদর্শবাদ বিশেষ প্রাধান্য পাইয়া জীবন-সত্যকে যেন আচ্ছন্ন করিয়াছে। (৪) বঙ্কিমের পরিণত রচনা-শৈলীও 'সীতারামে' প্রত্যক্ষ। ত্রুটি আছে (টীকা দ্রষ্টব্য); সংস্কৃত-বহুল গম্ভীর উদাত্ত বাক্যেরও অভাব নাই, অথচ ছোট ছোট জীবন্ত বাক্যও অনেক আছে। (৫) বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের মতই 'সীতারামে'ও একটি সংযত সুরসিকতার আস্বাদনে আমরা তৃপ্ত হই—আসলে ইহা বঙ্কিমের গল্প বলার শক্তির মতই তাঁহার রচনার অন্য একটি প্রধান আকর্ষণ।

সীতারাম

প্রথম খণ্ড

দিবা—গৃহিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকালে, পূর্ব্ববাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম "ভূষ্‌নো"। যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটীরবাসীরা বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত না, তখন সেই ভূষণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন; এখনকার স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষা তাঁহাদের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং ভূষণা স্থানীয় রাজধানী ছিল।

আজি হইতে প্রায় এক শত আশী বৎসর পূর্ব্বে এক দিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতর, পথের উপর এক জন মুসলমান ফকির শুইয়াছিল। ফকির, আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে। এমন সময়ে সেখানে এক জন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক বড় দ্রুত আসিতেছিল, কিন্তু ফকির পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

পথিক হিন্দু। জাতিতে উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। তাহার নাম গঙ্গারাম দাস। বয়সে নবীন। গঙ্গারাম বড় বিপন্ন। বাড়ীতে মাতা মরে, অন্তিম কাল উপস্থিত। তাই তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল। এখন সম্মুখে পথ বন্ধ।

সে কালে মুসলমান ফকিরেরা বড় মান্য ছিল। খোদ আকবর শাহ ইসলাম ধর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত হইয়াও এক জন ফকিরের আজ্ঞাকারী ছিলেন। হিন্দুরা ফকিরদিগকে সম্মান করিত, যাহারা মানিত না, তাহারা ভয় করিত।

গঙ্গারাম সহসা ফকিরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সাহস করিলেন না। বলিলেন, "সেলাম শাহ সাহেব। আমাকে একটু পথ দিন।"

শাহ সাহেব নড়িল না, কোন উত্তরও করিল না।—গঙ্গারাম যোড়হাত করিল, বলিল, "আল্লা তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন, আমার বড় বিপদ্! আমায় একটু পথ দাও।"

শাহ সাহেব নড়িলেন না। গঙ্গারাম যোড়হাত করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় এবং কাতরোক্তি করিল, ফকির কিছুতেই নড়িল না, কথাও কহিল না। অগত্যা গঙ্গারাম তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল; বোধ হয় সেটুকু ফকিরের নষ্টামি। গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিয়া কবিরাজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ফকিরও গাত্রোত্থান করিল—সে কাজির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

গঙ্গারাম কবিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে আপনার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল; কবিরাজ তার মাকে দেখিল, নাড়ী টিপিল, বচন আওড়াইল, ঔষধের কথা দুই চারি বার বলিল, শেষে তুলসীতলা ব্যবস্থা করিল। তুলসীতলায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গারামের মা পরলোক লাভ করিলেন। তখন গঙ্গারাম মার সৎকারের জন্য পাড়া প্রতিবাসীদিগকে ডাকিতে গেল। পাঁচ জন স্বজাতি যুটিয়া যথাবিধি গঙ্গারামের মার সৎকার করিল।

সৎকার করিয়া অপরাহ্ণে শ্রীনাম্নী ভগিনী এবং প্রতিবাসিগণ সঙ্গে গঙ্গারাম বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে দুই জন পাইক, ঢাল সড়কি-বাঁধা—আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল। পাইকেরা জাতিতে ডোম, গঙ্গারাম তাহাদিগের স্পর্শে বিষণ্ণ হইলেন। সভয়ে দেখিলেন, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ সাহেব। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইতে হইবে? কেন ধর?—আমি কি করিয়াছি?"

শাহ সাহেব বলিল, "কাফের! বদ্‌বখ্‌ত্! বেত্‌মিজ্! চল্।"

পাইকেরা বলিল, "চল্।"

এক জন পাইক ধাক্কা মারিয়া গঙ্গারামকে ফেলিয়া দিল। আর এক জন তাহাকে দুই চারিটা লাথি মারিল। এক জন গঙ্গারামকে বাঁধিতে লাগিল, আর এক জন তাহার ভগিনীকে ধরিতে গেল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন

করিল। যে প্রতিবাসীরা সঙ্গে ছিল, তাহারা কে কোথা পলাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজির কাছে লইয়া গেল। ফকির মহাশয় দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে হিন্দুদিগের দুর্নীতি সম্বন্ধে অতি দুর্ব্বোধ্য ফারসি ও আরবি শব্দ সকল সংযুক্ত নানাবিধ বক্তৃতা করিতে করিতে সঙ্গে গেলেন।

গঙ্গারাম কাজি সাহেবের কাছে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ হইল। ফরিয়াদি শাহ সাহেব—সাক্ষীও শাহ সাহেব এবং বিচারকর্ত্তাও শাহ সাহেব। কাজি মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ফকিরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, কোরাণ ও নিজের চসমা এবং শাহ সাহেবের দীর্ঘবিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুর সম্যক্ সমালোচনা করিয়া পরিশেষে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইহাকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেল। যে যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল, "যা হইবার তা ত হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি কেন?"

এই বলিয়া গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। তোবা তোবা বলিতে বলিতে শাহ সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন। এ বয়সে তাঁর যে দুই চারিটি দাঁত অবশিষ্ট ছিল, গঙ্গারামের পাদস্পর্শে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই মুক্তিলাভ করিল। তখন হামরাহি পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল এবং কাজি সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী দিল এবং যে সকল কথার অর্থ হয় না, এরূপ শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাকে গালি দিতে দিতে এবং ঘুসী, কীল ও লাথি মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল। সে দিন সন্ধ্যা হইয়াছিল; সে দিন আর কিছু হয় না—পরদিন তাহার জীবন্তে কবর হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যেখানে গাছতলায় পড়িয়া এলোচুলে মাটিতে লুটাইয়া গঙ্গারামের ভগিনী কাঁদিতেছিল, সেইখানে এ সংবাদ পৌঁছিল। ভগিনী শুনিল, ভাইয়ের কাল জীয়ন্তে কবর হইবে। তখন সে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া এলোচুল বাঁধিল।

গঙ্গারামের ভগিনী শ্রীর বয়স পাঁচিশ বৎসর হইতে পারে। সে গঙ্গারামের অনুজা।

সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। গঙ্গা-রামের মা ইদানীং অতিশয় রুগ্না হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীই ঘরের গৃহিণী ছিল। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।

ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,—এতটুকু ক্ষুদ্র একখানি নৈবেদ্য দিয়া প্রত্যহ তাহার একটু পূজা হইত। শ্রী ও শ্রীর মা জানিত যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রী চুল জড়াইয়া সেই শালগ্রামের ঘরের দ্বারের বাহিরে থাকিয়া মনে মনে অসংখ্য প্রণাম করিল। পরে হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে নারায়ণ! হে পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু! হে অনাথনাথ! আমি আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও। আমি স্ত্রীলোক—পাপিষ্ঠা। আমা হইতে কি হইবে! তুমি দেখিও ঠাকুর!"

এই বলিয়া সেখান হইতে শ্রী অপসৃতা হইয়া বাটীর বাহিরে গেল। পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল, সে শ্রীর মার অনেক কাজ কর্ম্ম করিয়া দিত। এক্ষণে তাহার নিকটে গিয়া শ্রী চুপি চুপি কি বলিল। পরে দুই জনে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অন্ধকারে গলি ঘুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাঁটিল। সে দেশে কোটা ঘর তত বেশী নয়, কিন্তু এখনকার অপেক্ষা তখন কোটা ঘর অধিক ছিল, মধ্যে মধ্যে একটি একটি বড় বড় অট্টালিকাও পাওয়া যাইত। ঐ দুই জন স্ত্রীলোক আসিয়া, এমনই একটা বড় অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাড়ীর সম্মুখে দীঘি, দীঘিতে বাঁধা ঘাট। বাঁধা ঘাটের উপর কতকগুলা দ্বারবান্ বসিয়া, কেহ সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, কেহ টপ্পা গাইতেছিল, কেহ স্বদেশের প্রসঙ্গে চিত্ত সমর্পণ করিতেছিল। তাহাদেরই মধ্যে এক জনকে ডাকিয়া পাঁচকড়ির মা বলিল, "পাঁড়ে ঠাকুর! ভাণ্ডারীকে ডেকে দাও না?" দ্বারবান্ বলিল, "হাম্ পাঁড়ে নেহি, হাম্ মিশর হোতে হেঁ।"

পাঁচকড়ির মা। তা আমি জানি না, বাছা! পাঁড়ে কিসের বামুন? মিশর যেমন বামুন!

তখন মিশ্রদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম্ ভাণ্ডারী লেকে কেয়া করোগে?"

পাঁচকড়ির মা। কি আর করিব? আমার ঘরে কতকগুলা নাউ কুমড়া তরকারী হয়েছে, তাই বলে যাব যে, কাল গিয়ে যেন কেটে নিয়ে আসে।

দ্বারবান্। আচ্ছা, সো হাম্ বোলেঙ্গে। তোম্ ঘর্‌মে যাও।

পাঁচকড়ির মা। ঠাকুর, তুমি বলিলে কি আর সে ঠিকানা পাবে কার ঘরে তরকারী হয়েছে ?

দ্বারবান্। আচ্ছা। তোমারি নাম বোল্‌কে যাও।

পাঁচকড়ির মা। যা আবাগির বেটা! তোকে একটা নাউ দিতাম, তা তোর কপালে হলো না।

দ্বারবান্। আচ্ছা, তোম্ খাড়ি রহো। হাম্ ভাণ্ডারীকো বোলাতে হেঁ।

তখন মিশ্রঠাকুর গুন্ গুন্ করিয়া পিলু ভাঁজিতে ভাঁজিতে অট্টালিকা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অচিরাৎ জীবন ভাণ্ডারীকে সংবাদ দিলেন যে, "একঠো তরকারিওয়ালি আয়ি হৈ। মুঝ্‌কো কুছ্ মেলেগা, তোম্‌কো ভি কুছ্ মেল সক্‌তা হায়। তোম্ জল্‌দী আও।"

জীবন ভাণ্ডারীর বয়স কিছু বেশী, কতকগুলো চাবি ঘুন্‌সিতে ঝোলান। মুখ বড় রুক্ষ। কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশা পাইয়া সে শীঘ্র বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, দুইটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কে ডেকেছ গা ?"

পাঁচকড়ির মা বলিল, "এই আমার ঘরে কিছু তরকারী হয়েছে, তাই ডেকেছি। কিছু বা তুমি নিও, কিছু বা দরওয়ান্‌জীকে দিও, আর কিছু বা সরকারীতে দিও।"

জীবন ভাণ্ডারী। তা তোর বাড়ী কোথা বলে যা, কাল যাব।

পাঁচকড়ির মা। আর একটি দুঃখী অনাথা মেয়ে এয়েছে, ও কি বলবে একবার শোন।

শ্রী গলা পর্য্যন্ত ঘোম্‌টা টানিয়া প্রাচীরে মিশিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। জীবন ভাণ্ডারী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষভাবে বলিল, "ও ভিক্ষে শিক্ষের কথা আমি হুজুরে কিছু বলিতে পারিব না।" পাঁচকড়ির মা তখন অস্ফুট স্বরে ভাণ্ডারী মহাশয়কে বলিল, "ভিক্ষে যদি কিছু পায় ত অর্দ্ধেক তোমার।"

ভাণ্ডারী মহাশয় তখন প্রসন্নবদনে বলিলেন, "কি বল মা ?" ভিখারীর পক্ষে ভাণ্ডারীর প্রভুর দ্বার অবারিত। শ্রী ভিক্ষার অভিপ্রায় জানাইল, সুতরাং ভাণ্ডারী মহাশয় তাহাকে মুনিবের কাছে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ভাণ্ডারী শ্রীকে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রভুর আজ্ঞামত চলিয়া গেল।

শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা। গৃহকর্তা বলিলেন, "তুমি কে?"

শ্রী বলিল, "আমি শ্রী।"

"শ্রী। তুমি তবে কি আমাকে চেন না? না চিনিয়া আমার কাছে আসিয়াছ? আমি সীতারাম রায়।"

তখন শ্রী মুখের ঘোম্‌টা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন, "তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!"

শ্রী বলিল, "আমি বড় দুঃখী। তোমার ব্যঙ্গের যোগ্য নহি।" শ্রী কাঁদিতে লাগিল।

সীতারাম বলিলেন, "এত দিনের পর কেন আসিয়াছ? আসিয়াছ ত অত কাঁদিতেছ কেন?"

শ্রী তবু কাঁদে—কথা কহে না। সীতারাম বলিল, "নিকটে এসো।"

তখন শ্রী অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বিছানা মাড়াইব না—আমার অশৌচ।"

সীতা। সে কি?

গদ্‌গদস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রী বলিতে লাগিল, "আজ আমার মা মরিয়াছেন।"

সীতারাম। সেই বিপদে পড়িয়া কি তুমি আজ আমার কাছে আসিয়াছ?

শ্রী। না—আমার মার কাজ আমিই যথাসাধ্য করিব। সে জন্য তোমায় দুঃখ দিব না। কিন্তু আমার আজ ভারি বিপদ্!

সীতা। আর কি বিপদ্!

শ্রী। আমার ভাই যায়। কাজি সাহেব তাহার জীয়স্তে কবরের হুকুম দিয়াছেন। সে এখন হাবুজখানায় আছে।

সীতা। সে কি? কি করেছে?

তখন শ্রী যাহা যাহা শুনিয়াছিল এবং যাহা যাহা দেখিয়াছিল, তাহা মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত বলিল। শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সীতারাম বলিলেন, "এখন উপায়?"

শ্রী। এখন উপায় তুমি। তাই এত বৎসরের পর এসেছি।

সীতারাম। আমি কি করিব?

শ্রী। তুমি কি করিবে? তবে কে করিবে? আমি জানি, তুমি সব পার।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চাকর এই কাজি। দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ করে কার সাধ্য?

শ্রী বলিল, "তবে কি কোন উপায় নাই?"

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "উপায় আছে। তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি। কিন্তু আমি মরিব।"

শ্রী। দেখ, দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। তুমি দীন দুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?

সীতারাম অনেকক্ষণ ভাবিল। পরে বলিল, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? আমি তোমার কাছে স্বীকার করিলাম, গঙ্গারামের জন্য আমি যথাসাধ্য করিব।"

তখন প্রীতমনে ঘোমটা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিল।

সীতারাম দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া, ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "আমি যত ক্ষণ না দ্বার খুলি, তত ক্ষণ আমাকে কেহ না ডাকে।" মনে মনে আবার ভাবিলেন, "শ্রী এমন শ্রী? তা ত জানি না। আগে শ্রীর কাজ করিব, তার পর অন্য কথা।" ভাবিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক গোছ মানুষ, তসর নামাবলী পরা, মাথাটি যত্নপূর্ব্বক কেশশূন্য করিয়াছেন, অবশিষ্ট আছে—কেবল এক "রেফ।" কেশাভাবে চন্দনের যথেষ্ট ঘটা,—খুব লম্বা ফোঁটা, আর আর বামুনগিরির সমান সব আছে। তাঁহার নাম চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। তিনি সীতারামের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সীতারাম যখন যেখানে বাস করিতেন, চন্দ্রচূড়ও তখন সেইখানে বাস করিতেন। সম্প্রতি ভূষণায় বাস করিতেছিলেন। আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই এক জন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন

পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড় সেই শ্রেণীর লোক।

কিছু ক্ষণ পরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীতারাম গুরুদেবের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে নিভৃতে সীতারামের অনেক কথা হইল। কি কি কথা হইল, তাহা আমাদের সবিস্তারে লিখিবার প্রয়োজন নাই। কথাবার্ত্তার ফল এই হইল যে, সীতারাম ও চন্দ্রচূড় উভয়ে সেই রাত্রিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সহরের অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনার পরিবারবর্গ একজন আত্মীয় লোকের সঙ্গে মধুমতীপারে পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক খুব বড় ফরদা জায়গায়, সহরের বাহিরে, গঙ্গারাম দাসের কবর প্রস্তুত হইয়াছিল। বন্দী সেখানে আসিবার আগেই লোক আসিতে আরম্ভ হইল। অতি প্রত্যূষে,—তখনও—গাছের আশ্রয় হইতে অন্ধকার সরিয়া যায় নাই—অন্ধকারের আশ্রয় হইতে নক্ষত্র সব সরিয়া যায় নাই, এমন সময়ে দলে দলে পালে পালে জীয়ন্ত মানুষের কবর দেখিতে লোক আসিতে লাগিল। একটা মানুষ মরা, জীবিতের পক্ষে একটা পর্ব্বের সমান। যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাঠ প্রায় পূরিয়া গিয়াছে, অথচ নগরের সকল গলি, পথ, রাস্তা হইতে পিপীলিকাশ্রেণীর মত মনুষ্য বাহির হইতেছে। শেষ সে বিস্তৃত স্থানেও স্থানাভাব হইয়া উঠিল। দর্শকেরা গাছে উঠিয়া কোথাও হনূমানের মতন আসীন—যেন লাঙ্গুলাভাবে কিঞ্চিৎ বিরস;—কোথাও বাদুড়ের মত দুল্যমান, দিনোদয়ে যেন কিঞ্চিৎ সরস। পশ্চাতে, নগরের যে কয়টা কোটাবাড়ী দেখা যাইতেছিল, তাহার ছাদ মানুষে ভরিয়া গিয়াছে; আর স্থান নাই। কাঁচা ঘরই বেশী, তাহাতেও মই লাগাইয়া, মইয়ে পা রাখিয়া, অনেকে চালে বসিয়া দেখিতেছে। মাঠের ভিতর কেবল কালো মাথার সমুদ্র—ঠেসাঠেসি, মিশামিশি। কেবল মানুষ আসিতেছে, জমাট বাঁধিতেছে, সরিতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, আবার মিশিতেছে। কোলাহল অতিশয় ভয়ানক। বন্দী এখনও আসিল না দেখিয়া দর্শকেরা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল।

চীৎকার, গণ্ডগোল, বকাবকি, মারামারি আরম্ভ করিল। হিন্দু মুসলমানকে গালি দিতে লাগিল, মুসলমান হিন্দুকে গালি দিতে লাগিল। কেহ বলে "আল্লা!" কেহ বলে, "হরিবোল!" কেহ বলে, "আজ হবে না, ফিরে যাই!" কেহ বলে, "ঐ এয়েছে দেখ্।" যাহারা বৃক্ষারূঢ়, তাহারা কার্য্যাভাবে গাছের পাতা, ফুল, এবং ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া নিম্নচারীদিগের মাথার উপর ফেলিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সকল কারণে, যেখানে যেথানে বৃক্ষ, সেইখানে সেইখানে তলচারী এবং শাখাবিহারীদিগের ভীষণ কোন্দল উপস্থিত হইতে লাগিল। কেবল একটি গাছের তলায় সেরূপ গোলযোগ নাই। সে বৃক্ষের তলে বড় লোক দাঁড়ায় নাই। সমুদ্রমধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত তাহা প্রায় জনশূন্য। দুই চারি জন লোক সেখানে আছে বটে, কিন্তু তাহারা কোন গোলযোগ করিতেছে না; নিঃশব্দ। কেবল অন্য কোন লোক সে বৃক্ষতলে দাঁড়াইতে আসিলে, তাহারা উহাদিগকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে বড় বড় যোয়ান ও হাতে বড় বড় লাঠি দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সেই বৃক্ষের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া কেবল এক জন স্ত্রীলোক বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে বৃক্ষারূঢ় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাহার চোখ মুখ ফুলিয়াছে; বেশভূষা বড় আলুথালু—যেন সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। কিন্তু এখন আর কাঁদিতেছে না। যে বৃক্ষারূঢ়, তাহাকে ঐ স্ত্রীলোক বলিতেছে, "ঠাকুর! এখন কিছু দেখা যায় না!"

বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি উপর হইতে বলিল, "না"।

"তবে বোধ হয়, নারায়ণ রক্ষা করিলেন।"

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, এই স্ত্রীলোক শ্রী। বৃক্ষোপরি স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। বৃক্ষশাখা ঠিক তাঁর উপযুক্ত স্থান নহে, কিন্তু তর্কালঙ্কার মনে করিতেছিলেন, "আমি ধর্ম্মাচরণনিযুক্ত, ধর্ম্মের জন্য সকলই কর্ত্তব্য।"

শ্রীর কথার উত্তরে চন্দ্রচূড় বলিলেন, "নারায়ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন। আমার সে ভরসা আছে। তুমি উতলা হইও না। কিন্তু এখনও রক্ষার উপায় হয় নাই বোধ হইতেছে। কতকগুলা লালপাগড়ি আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি।"

শ্রী। কিসের লাল পাগড়ি?

চন্দ্রচূড়। বোধ হয় ফৌজদারি সিপাহী।

বাস্তবিক দুইশত ফৌজদারি সিপাহী সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গঙ্গারামকে ঘেরিয়া লইয়া আসিতেছিল। দেখিয়া সেই অসংখ্য জনতা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যেমন যেমন দেখিতে লাগিলেন, চন্দ্রচূড় সেইরূপ শ্রীকে বলিতে লাগিলেন। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কত সিপাই?"

চন্দ্র। দুই শত হইবে।

শ্রী। আমরা দীন দুঃখী—নিঃসহায়। আমাদের মারিবার জন্য এত সিপাহী কেন?

চন্দ্র। বোধ হয়, বহু লোকের সমাগম হইয়াছে শুনিয়া, সতর্ক হইয়া ফৌজদার এত সিপাহী পাঠাইয়াছেন।

শ্রী। তার পর কি হইতেছে?

চন্দ্র। সিপাহীরা আসিয়া, শ্রেণী বাঁধিয়া, প্রস্তুত কবরের নিকট দাঁড়াইল। মধ্যে গঙ্গারাম। পিছনে খোদ কাজি, আর সেই ফকির।

শ্রী। দাদা কি করিতেছেন?

চন্দ্র। পাপিষ্ঠেরা তার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী দিয়াছে।

শ্রী। কাঁদিতেছেন কি?

চন্দ্র। না। নিঃশব্দ—নিস্তব্ধ। মূর্ত্তি বড় গম্ভীর, বড় সুন্দর।

শ্রী। আমি একবার দেখিতে পাই না? জন্মের শোধ দেখিব।

চন্দ্র। দেখিবার সুবিধা আছে। তুমি এই নীচের ডালে উঠিতে পার?

শ্রী। আমি স্ত্রীলোক, গাছে উঠিতে জানি না।

চন্দ্র। এ কি লজ্জার সময় মা?

শিকড় হইতে হাত দুই উঁচুতে একটি সরল ডাল ছিল। সে ডালটি উঁচু হইয়া না উঠিয়া, সোজা হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। হাতখানিক গিয়া, ঐ ডাল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সেই দুই ডালের উপর দুইটি পা দিয়া, নিকটস্থ আর একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইবার বড় সুবিধা। চন্দ্রচূড় শ্রীকে ইহা দেখাইয়া দিলেন। শ্রী লজ্জা ত্যাগ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—শ্মশানে লজ্জা থাকে না।

প্রথম দুই একবার চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল। তার পর, কি কৌশলে কে জানে, শ্রী ত জানে না—সে সেই নিম্ন শাখায়

উঠিয়া, সেই যোড়া ডালে যুগল চরণ রাখিয়া, আর একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইল।

তাতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। যেখানে শ্রী দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে সম্মুখদিকে পাতার আবরণ ছিল না—শ্রী সেই অসংখ্য জনতার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইল। সকলে দেখিল, সহসা অতুলনীয়া রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া, শ্যামল পত্ররাশিমধ্যে বিরাজ করিতেছে। প্রতিমার ঠাটের মত, চারি দিকে বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে; চুলের উপর পাতা পড়িয়াছে, স্থূল বাহুর উপর পাতা পড়িয়াছে, বক্ষঃস্থ কেশদাম কতক কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে, একটি ডাল আসিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কেহ দেখিতে পাইতেছে না, এ মূর্ত্তিমতী বনদেবী কিসের উপর দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া নিকটস্থ জনতা বাত্যাতাড়িত সাগরবৎ, সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রী তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। আপনার অবস্থান প্রতি তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। অনিমেষলোচনে গঙ্গারামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছিল। এমন সময়ে শাখান্তর হইতে চন্দ্রচূড় ডাকিয়া বলিলেন, "এ দিকে দেখ! এ দিকে দেখ! ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে?"

শ্রী দিগন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে। যোদ্ধ‚বেশ, অথচ নিরস্ত্র। অশ্বী বড় তেজস্বিনী, কিন্তু লোকের ভিড় ঠেলিয়া আগুইতে পারিতেছে না। অশ্বী নাচিতেছে, দুলিতেছে, গ্রীবা বাঁকাইতেছে, কিন্তু তবু বড় আগু হইতে পারিতেছে না। শ্রী চিনিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে সীতারাম।

এ দিকে গঙ্গারামকে সিপাহীরা কবরে ফেলিতেছিল। সেই সময়ে দুই হাত তুলিয়া সীতারাম নিষেধ করিলেন। সিপাহীরা নিরস্ত হইল। শাহ সাহেব বলিলেন, "কিয়া দেখ্‌তে হো! কাফেরকো মাট্টি দেও।"

কাজি সাহেব ভাবিলেন। কাজি সাহেবের সে সময়ে সেখানে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল জনতা শুনিয়া শখ করিয়া আসিয়াছিলেন। যখন আসিয়াছিলেন, তখন তিনিই কর্ত্তা। তিনি বলিলেন, "সীতারাম যখন বারণ করিতেছে, তখন কিছু কারণ আছে। সীতারাম আসা পর্য্যন্ত বিলম্ব কর।"

শাহ সাহেব অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু অগত্যা সীতারাম পৌঁছান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। গঙ্গারামের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল।

সীতারাম কাজি সাহেবের নিকট পৌঁছিলেন। অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রণতমস্তকে শাহ সাহেবকে বিনয়পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কাজি সাহেবকে তদ্রূপ করিলেন। কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন. রায় সাহেব! আপনার মেজাজ সরীফ্।"

সীতারাম। অলহম্-দল্-ইল্লা। মেজাজে মবারকের সংবাদ পাইলেই এ ক্ষুদ্র প্রাণী চরিতার্থ হয়।

কাজি। খোদা নফরকে যেমন রাখিয়াছেন। এখন এই উমর, বাল সফেদ, কাজা পৌঁছিলেই হয়। দৌলতখানার কুশল সংবাদ ত?

সীতা। হজুরের একবালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?

কাজি। এখন এখানে কি মনে করিয়া?

সীতা। এই গঙ্গারাম—বদ্‌বখ্‌ত্—বেত্‌মিজ্, যাই হৌক, আমার স্বজাতি। তাই দুঃখে পড়িয়া হজুরে হাজির হইয়াছি, জান বখ্‌শিশ্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজি। সে কি? তাও কি হয়?

সীতা। মেহেরবান ও কদরদান সব পারে।

কাজি। খোদা মালেক। আমা হইতে এ বিষয়ের কিছু হইবে না।

সীতা। হাজার আসরফি জরমানা দিবে। জান বখ্‌শিশ্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজি সাহেব ফকিরের মুখ পানে চাহিলেন। ফকির ঘাড় নাড়িল। কাজি বলিলেন, "সে সব কিছু হইবে না। কবরমে কাফেরকো ডারো।"

সীতা। দুই হাজার আসরফি দিব। আমি যোড় হাত করিতেছি, গ্রহণ করুন। আমার খাতির!

কাজি ফকিরের মুখ পানে চাহিল, ফকির নিষেধ করিল, সে কথাও উড়িয়া গেল। শেষ সীতারাম চারি হাজার আসরফি স্বীকার করিল। তাও না। পাঁচ হাজার—তাও না। আট হাজার—দশ হাজার, তাও না; সীতারামের আর নাই। শেষ সীতারাম জানু পাতিয়া করযোড় করিয়া অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "আমার আর নাই। তবে, আর অন্য যা কিছু আছে, তাও

দিতেছি। আমার তালুক মুলুক, জমি জেওরাত, বিষয় আশয় সর্ব্বস্ব দিতেছি। সব গ্রহণ করুন। উহাকে ছাড়িয়া দিন।"

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও তোমার এমন কে যে, উহার জন্য সর্ব্বস্ব দিতেছ ?"

সীতা। ও আমার যেই হৌক, আমি উহার প্রাণদানে স্বীকৃত—আমি সর্ব্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব। এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম্ম।

কাজি। হিন্দুধর্ম্ম যাহাই হৌক, মুসলমানের ধর্ম্ম তাহার বড়। এ ব্যক্তি মুসলমান ফকিরের অপমান করিয়াছে, উহার প্রাণ লইব—তাহাতে সন্দেহ নাই। কাফেরের প্রাণ ভিন্ন ইহার আর অন্য দণ্ড নাই।

তখন সীতারাম জানু পাতিয়া কাজি সাহেবের আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাফেরের প্রাণ ? আমিও কাফের। আমার প্রাণ লইলে এ প্রায়শ্চিত্ত হয় না ? আমি এই কবরে নামিতেছি—আমাকে মাটি চাপা দিউন—আমি হরিনাম করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে যাইব—আমার প্রাণ লইয়া এই দুঃখীর প্রাণদান করুন। দোহাই তোমার কাজি সাহেব! তোমার যে আল্লা, আমারও সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর! ধর্ম্মাচরণ করিও। আমি প্রাণ দিতেছি—বিনিময়ে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রাণদান কর।"

কথাটা নিকটস্থ হিন্দু দর্শকেরা শুনিতে পাইয়া হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। করতালি দিয়া বলিতে লাগিল, "ধন্য রায়জী! ধন্য রায় মহাশয়! জয় কাজি সাহেবকা! গরিবকে ছাড়িয়া দেও।"

যাহারা কথা কিছুই শুনিতে পায় নাই, তাহারাও হরিধ্বনি শুনিয়া হরিধ্বনি দিতে লাগিল। তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল। কাজি সাহেবও বিস্মিত হইয়া সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি বলিতেছেন, রায় মহাশয়! এ আপনার কে যে, ইহার জন্য আপনার প্রাণ দিতে চাহিতেছেন ?"

সীতা। এ আমার ভ্রাতার অপেক্ষা, পুত্রের অপেক্ষাও আত্মীয়; কেন না, আমার শরণাগত। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি এই যে, সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিবে। রাজা ঔশীনর, আপনার শরীরের সকল মাংস কাটিয়া দিয়া একটি পায়রাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব আমাকে গ্রহণ করুন—ইহাকে ছাড়ুন।

কাজি সাহেব সীতারামের উপর কিছু প্রসন্ন হইলেন। শাহ সাহেবকে অন্তরালে লইয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ ব্যক্তি দশ হাজার আসরফি দিতে চাহিতেছে। নিলে সরকারি তহবিলের কিছু সুসার হইবে। দশ হাজার আসরফি লইয়া, এই হতভাগ্যকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?"

শাহ সাহেব বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, দুইটাকেই এক কবরে পুঁতি। আপনি কি বলেন?"

কাজি। তোবা! আমি তাহা পারিব না। সীতারাম কোন অপরাধ করে নাই—বিশেষ এ ব্যক্তি মান্য, গণ্য ও সচ্চরিত্র। তা হইবে না।

এতক্ষণ গঙ্গারাম কোন কথা কহে নাই, মনে জানিত যে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু শাহ সাহেবের সঙ্গে কাজি সাহেবের নিভৃতে কথা হইতেছে দেখিয়া সে জোড় হাত করিয়া কাজি সাহেবকে বলিল, "হজুরের মর্জ্জি মবারকে কি হয় বলিতে পারি না, কিন্তু এ গরিবের প্রাণ রক্ষা সম্বন্ধে গরিবেরও একটা কথা শুনিতে হয়। একের অপরাধে অন্যের প্রাণ লইবেন, এ কোন্ সরায় আছে? সীতারামের প্রাণ লইয়া, আমায় প্রাণদান দিবেন—আমি এমন প্রাণদান লইব না। এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।"

তখন ভিড়ের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "হাতকড়ি মাথায় মারিয়াই মর। মুসলমানের হাত এড়াইবে।"

বক্তা, স্বয়ং চন্দ্রচূড় ঠাকুর। তিনি আর গাছে নাই। এক জন জমাদার শুনিয়া বলিল, "পাকড়ো বস্কো।" কিন্তু চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারকে পাকড়ান বড় শক্ত কথা। সে কাজ হইল না।

এ দিকে হাতকড়ি মাথায় মারার কথা শুনিয়া ফকির মহাশয়ের কিছু ভয় হইল, পাছে জীয়ন্ত মানুষ পোঁতার সুখে তিনি বঞ্চিত হন। কাজি সাহেবকে বলিলেন, "এখন আর উহার হাতকড়িতে প্রয়োজন কি? হাতকড়ি খসাইতে বলুন।"

কাজি সাহেব সেইরূপ হুকুম দিলেন। কামার আসিয়া গঙ্গারামের হাত মুক্ত করিল। কামার সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সরকারি বেড়ি হাতকড়ি সব তাহার জিম্মা, সেই উপলক্ষে সে আসিয়াছিল।

তাহার ভিতর কিছু গোপন কথাও ছিল। রাত্রিশেষে কর্ম্মকার মহাশয় চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কিছু টাকা খাইয়াছিলেন।

তখন ফকির বলিল, "আর বিলম্ব কেন? উহাকে গাড়িয়া ফেলিতে হুকুম দিন্।"

শুনিয়া কামার বলিল, "বেড়ি পায়ে থাকিবে কি? সরকারি বেড়ি নোক্‌সান্ হইবে কেন? এখন ভাল লোহা বড় পাওয়া যায় না। আর বদমায়েসেরও এত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে যে, আমি আর বেড়ি যোগাইতে পারিতেছি না।" শুনিয়া কাজি সাহেব বেড়ি খুলিতে হুকুম দিলেন। বেড়ি খোলা হইল।

শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া একবার এদিক্ ওদিক্ দেখিল। তার পর গঙ্গারাম এক অদ্ভুত কাজ করিল। নিকটে সীতারাম ছিলেন; ঘোড়ার চাবুক তাঁহার হাতে ছিল। সহসা তাঁহার হাত হইতে সেই চাবুক কাড়িয়া লইয়া গঙ্গারাম এক লম্ফে সীতারামের শূন্য অশ্বের উপর উঠিয়া অশ্বকে দারুণ আঘাত করিল। তেজস্বী অশ্ব আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া এক লম্ফে কবরের খাদ পার হইয়া সিপাহীদিগের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া জনতার ভিতর প্রবেশ করিল।

যতক্ষণে একবার বিদ্যুৎ চমকে, ততক্ষণে এই কাজ সম্পন্ন হইল। দেখিয়া, সেই লোকারণ্যমধ্যে তুমুল হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। সিপাহীরা "পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো" বলিয়া পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু তাহাতে একটা ভারী গোলযোগ উপস্থিত হইল। বেগবান্ অশ্বের সম্মুখ হইতে লোকে ভয়ে সরিয়া যাইতে লাগিল, গঙ্গারাম পথ পাইতে লাগিল, কিন্তু সিপাহীরা পথ পাইল না। তাহাদের সম্মুখে লোক জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারা হাতিয়ার চালাইয়া পথ করিবার উদ্যোগ করিল।

সেই সময়ে তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল যে, কালান্তক যমের ন্যায় কতকগুলি বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী পুরুষ, একে একে ভিড়ের ভিতর হইতে আসিয়া সারি দিয়া তাহাদের সম্মুখে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন আরও সিপাহী আসিল। দেখিয়া আরও ঢাল শড়কীওয়ালা হিন্দু আসিয়া তাহাদের পথ রোধ করিল। তখন দুই দলে ভারী দাঙ্গা উপস্থিত হইল।

দেখিয়া, সক্রোধে কাজি সাহেব সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ব্যাপার?"

সীতা। আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

কাজি। বুঝিতে পারিতেছ না? আমি বুঝিতে পারিতেছি, এ তোমারই খেলা।

সীতা। তাহা হইলে আপনার কাছে নিরস্ত্র হইয়া, মৃত্যুভিক্ষা চাহিতে আসিতাম না।

কাজি। আমি এখন তোমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিব। এ কবরে তোমাকেই পুঁতিব।

এই বলিয়া কাজি সাহেব কামারকে হুকুম দিলেন, "ইহারই হাতে পায়ে ঐ হাতকড়ি, বেড়ি লাগাও।" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি ফৌজদারের নিকট পাঠাইলেন—ফৌজদার সাহেব যাহাতে আরও সিপাহী লইয়া স্বয়ং আইসেন, এমন প্রার্থনা জানায়। ফৌজদারের নিকট লোক গেল। কামার আসিয়া সীতারামকে ধরিল। সেই বৃক্ষারূঢ়া বনদেবী শ্রী তাহা দেখিল।

এ দিকে গঙ্গারাম কষ্টে অথচ নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব লইয়া লোকারণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কষ্টে—কেন না, আসিতে আসিতে দেখিলেন যে, সেই জনতামধ্যে একটা ভারী গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কোলাহল ভয়ানক হইল, লোকসকল সম্মুখে ছুটিতে লাগিল। তাঁহার অশ্ব এই সকলে অতিশয় ভীত হইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। অশ্বারোহণের কৌশল গঙ্গারাম তেমন জানিতেন না: ঘোড়া সামলাইতেই তাঁহাকে এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল যে, তিনি আর কোন দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না যে, কোথায় কি হইতেছে। কেবল "মার! মার!" একটা শব্দ কাণে গেল।

লোকারণ্য হইতে কোন মতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গারাম অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া, এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিলেন, দেখিবেন—কি হইতেছে। দেখিলেন, ভারী গোলযোগ। সেই মহতী জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক দিকে সব মুসলমান—আর এক দিকে সব হিন্দু। মুসলমানদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি সিপাহী, হিন্দুদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি ঢাল শড়কীওয়ালা। হিন্দুরা বাছা বাছা যোয়ান, আর সংখ্যাতে বেশী। মুসলমানেরা তাহাদিগের কাছে হঠিতেছে। অনেকে পলাইতেছে। হিন্দুরা "মার মার" শব্দে পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।

এই মার্ মার্ শব্দে আকাশ, প্রান্তর, কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে লড়াই করিতেছে, সেও মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, যে লড়াই না করিতেছে, সেও মার্ মার্ শব্দ করিতেছে। মার্ মার্ শব্দে হিন্দুরা চারি দিক্ হইতে চারি দিকে ছুটিতেছে। আবার গঙ্গারাম সবিস্ময়ে শুনিলেন, যাহারা এই মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে ব'লতেছে, "জয় চণ্ডিকে! মা চণ্ডী এয়েছেন! চণ্ডীর হুকুম, মার্ মার্! মার্! জয় চণ্ডিকে!" গঙ্গারাম ভাবিলেন, "এ কি এ?" তখন দেখিতে দেখিতে গঙ্গারাম দেখিলেন, মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লবরাশি-মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্ত্তি, দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বাম হস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে, "মার্! মার্! শত্রু মার্!"—অঞ্চল ঘুরিতেছে, অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম বায়ুভরে উড়িতেছে—দৃপ্ত পদভরে যুগল শাখা দুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমময় দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে—যেন সিংহবাহিনী সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছে! যেন মা অসুর-বধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছেন, "মার্! মার্! শত্রু মার্!" শ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, ভয় নাই, বিরাম নাই—কেবল ডাকিতেছে —"মার্—শত্রু মার্! দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু—আমার শত্রু —মার্! শত্রু মার্!" উত্থিত বাহু, কি সুন্দর বাহু! স্ফুরিত অধর, বিস্ফারিত নাসা, বিদ্যুন্ময় কটাক্ষ, স্বেদাক্ত ললাটে স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের শোভা! সকল হিন্দু সেই দিকে চাহিতেছে, আর "জয় মা চণ্ডিকে!" বলিয়া রণে ছুটিতেছে। গঙ্গারাম প্রথমে মনে করিতেছেন যে, যথার্থই চণ্ডী অবতীর্ণা—তার পর সবিস্ময়ে, সভয়ে চিনিলেন, শ্রী!

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল। চণ্ডীর বলে বলবান্ হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। অল্পকালমধ্যে রণক্ষেত্র মুসলমানশূন্য হইল। গঙ্গারাম তখন দেখিলেন, এক জন ভারী লম্বা যোয়ান সীতারামকে কাঁধে করিয়া লইয়া, আর সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া, সেই চণ্ডীর দিকে লইয়া চলিল। আরও দেখিলেন, পশ্চাৎ আর এক জন শড়কীওয়ালা শাহ সাহেবের কাটামুণ্ড শড়কীতে বিঁধিয়া উঁচু করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে শ্রী সহসা বৃক্ষচ্যুতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। গঙ্গারামও তখন বৃক্ষ হইতে নামিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এমন সময়ে একটা গোল উঠিল যে, কামান, বন্দুক, গোলা গুলি লইয়া, সসৈন্য ফৌজদার বিদ্রোহীদিগের দমনার্থ আসিতেছেন। গোলা গুলির কাছে ঢাল শড়কী কি করিবে? বলা বাহুল্য যে, নিমেষমধ্যে সেই যোয়ানের দল অদৃশ্য হইল। যে নিরস্ত্র বীরপুরুষেরা তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া লড়াই ফতে করিতেছি বলিয়া কোলাহল করিতেছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা ত বারণ করিয়াছিলাম!" এই বলিয়া আর পশ্চাদ্দৃষ্টি না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যাহারা দাঙ্গার কোন সংস্রবে ছিল না, তাহারা 'চোরা গোরুর অপরাধে কপিলার বন্ধন' সম্ভাবনা দেখিয়া সীতারাম গঙ্গারামকে নানাবিধ গালিগালাজ করিয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক পলাইতে লাগিল। অতি অল্পকালমধ্যে সেই লোকারণ্য অন্তর্হিত হইল। প্রান্তর যেমন জনশূন্য ছিল, তেমনই জনশূন্য হইল। লোকজনের মধ্যে কেবল সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম, আর মূর্চ্ছিতা, ভূতলস্থা শ্রী।

সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন, "তুমি যে আমার ঘোড়া চুরি করিয়া পলাইয়াছিলে, সে ঘোড়া কি করিলে? বেচিয়া খাইয়াছ?"

গঙ্গারাম হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না। ঘোড়া মাঠে ছাড়িয়া দিয়াছি—ধরিয়া দিতেছি।"

সীতা। ধরিয়া, তাহার উপর আর একবার চড়িয়া, পলায়ন কর।

গঙ্গা। আপনাদের ছাড়িয়া?

সীতা। তোমার ভগিনীর জন্য ভাবিও না।

গঙ্গা। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি যাইব না।

সীতা। তুমি বড় নদী পার হইয়া যাও। শ্যামপুর চেন ত?

গঙ্গা। তা চিনি না?

সীতা। সেইখানে অতি দ্রুতগতি যাও। সেইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে; নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

গঙ্গা। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না।

সীতারাম ভ্রূকুটি করিলেন।

গঙ্গারাম সীতারামের ভ্রূকুটি দেখিয়া নিস্তব্ধ হইল ; এবং সীতারাম কিছু ধমক চমক করায় ভীত হইয়া অশ্বের সন্ধানে গেল।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর সীতারামের ইঙ্গিত পাইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। শ্রী এদিকে চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল। তার পর এদিকে ওদিকে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সীতারাম বলিলেন, "শ্রী, তুমি এখন কোথায় যাইবে ?"

শ্রী। আমার স্থান কোথায় ?

সীতা। কেন, তোমার মার বাড়ী ?

শ্রী। সেখানে কে আছে ?—এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে ?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর ?

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এইখানে থাকিবে ? এ যে মাঠ। এখানে তোমার মঙ্গল নাই।

শ্রী। কেন, এখানে আমার কে কি করিবে ?

সীতা। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় ফাঁসি দিতে পারে, মারিয়া ফেলিতে পারে বা সেই রকম আর কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও সেইখানে যাইবে। সেখানে তাহার ঘর দ্বার হইবার সম্ভাবনা। তুমি সেইখানে যাও। সেখানে বা যেখানে তোমার অভিলাষ, সেইখানে বাস করিও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব ?

সীতা। আমি কোন লোক তোমার সঙ্গে দিব।

শ্রী। এমন লোক কাহাকে সঙ্গে দিবে যে, দুরন্ত সিপাহীদিগের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে ?

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন ; বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

শ্রী সহসা উঠিয়া বসিল। উন্মুখী হইয়া স্থিরনেত্রে সীতারামের মুখ পানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "এত দিন পরে, এ কথা কেন?"

সীতা। সে কথা বুঝান বড় দায়। নাই বুঝিলে?

শ্রী। না বুঝিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। যখন তুমি ত্যাগ করিয়াছ, তখন আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব কেন? যাইব বই কি? কিন্তু তুমি দয়া করিয়া আমাকে কেবল প্রাণে বাঁচাইবার জন্য যে, একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, আমি সে দয়া চাহি না। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী,—আমি তোমার শুধু দয়া লইব কেন? যাহার আর কিছুতেই অধিকার নাই, সেই দয়া চায়। না প্রভু, তুমি যাও,—আমি যাইব না। এত কাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজিও কাটিবে।

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।

শ্রী। কি বুঝাইবে? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, সকলের আগে। তোমার আর দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী—আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টাও নই। অথচ বিনাপরাধে বিবাহের কয় দিন পরে হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখনও বল নাই যে, কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। অনেক দিন মনে করিয়াছি, তোমার এই অপরাধে আমি প্রাণত্যাগ করিব; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিয়া তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিব। সে পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে, আমি এখান হইতে যাইব না।

সীতা। সে কথা সব বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার কাছে আগে স্বীকার কর—কথাগুলি শুনিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না।

শ্রী। আমি তোমায় ত্যাগ করিব?

সীতা। স্বীকার কর, করিবে না।

শ্রী। এমন কি কথা? তবে না শুনিয়া আগে স্বীকার করি, কি প্রকার?

সীতা। দেখ, সিপাহীদিগের বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। যাহারা পলাইতেছে, সিপাহীরা তাহাদের পাছু ছুটিয়াছে। এই বেলা যদি আইস, এখনও বোধ হয় তোমাকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে পারি। আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলে উভয়ে নষ্ট হইব।

তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতারাম নির্ব্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পঁহুছিলেন। পলায়নের অনেক বিঘ্ন। কাজেই বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে। সীতারাম নক্ষত্রালোকে, নদীসৈকতে বসিয়া, শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রী বসিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন, "এখন যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত।

তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা তোমার কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে এক জন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতৃঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতৃঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল; সেই দিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।"

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী। তাহা হইলে কি হয়?

সীতা। যাহার এরূপ হয়, সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়।* অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের "প্রিয়" বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যাজ্যা হইয়াছ।

---

* চন্দ্রাগারে খাগ্নিভাবে কুজস্য স্বেচ্ছাবৃত্তিজ্ঞ´স্য শিল্পে প্রবীণা।
বাচাং পত্যুঃ সদ্গুণা ভার্গবস্য সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণহন্ত্রী॥

ইতি জাতকাভরণে।

বলিয়া সীতারাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, "দৈবজ্ঞ পিতাকে বলিলেন, 'আপনি এই পুত্রবধূটিকে পরিত্যাগ করুন, এবং পুত্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করুন। কারণ, দেখুন, যদিও স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ পতিই প্রিয়, কিন্তু যে পতি স্ত্রীর অপ্রিয় হয়, সেখানে এই ফল পতির প্রতি না ঘটিয়া অন্য প্রিয়জনের প্রতি ঘটিবে। স্ত্রীপুরুষে দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলে, পতি স্ত্রীর প্রিয় হইবে না; এবং পতি প্রিয় না হইলে, তাহার পতিবধের সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাতে আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে আপনার পুত্রের কখন সহবাস না হয় বা প্রীতি না জন্মে, সেই ব্যবস্থা করুন।' পিতৃদেব এই পরামর্শ উত্তম বিবেচনা করিয়া, সেই দিনই তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। এবং আমাকে আজ্ঞা করিলেন যে, আমি তোমাকে গ্রহণ বা তোমার সঙ্গে সহবাস না করি। এই কারণে তুমি আমার কাছে সেই অবধি পরিত্যক্ত।"

শ্রী দাঁড়াইয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন, "আমার কথা বাকি আছে। যখন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন—আমি তাঁহার অধীন ছিলাম—তিনি যা করাইতেন, তাই হইত।"

শ্রী। এখন তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া কি তুমি আর তাঁহার অধীন নও?

সীতা। পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে, তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয়? পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতা মাতার পিতা মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রী ত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম—অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম করিতেছি—শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাইতাম, কিন্তু—

শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি আমাকে এত দয়া করিয়াছ, আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা দিয়াছ, ইহা তোমার অশেষ গুণ। আর কখনও আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না বা তুমি কখনও আমার নামও শুনিবে না। গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাস থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই

স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকান আর উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"

এই বলিয়া, শ্রী ফিরিয়া না চাহিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তা. কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কাল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কাল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ, তা বৈ কি। সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয় দিন দেখা—সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। তার পর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার হিমরাশিপ্রতিফলিত-কৌমুদী-রূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ একজন বসন্তনিকুঞ্জপ্রহ্লাদিনী অপূর্ণা কল্লোলিনী; আর এক জন বর্ষা-বারিরাশিপ্রমথিতা পরিপূর্ণা স্রোতস্বতী। দুই স্রোতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তার পর আর শ্রীর কোন খবরই নাই।

স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে যে, কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে, মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার এক দিকে নন্দা, আর দিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে? যার এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে যমুনা, তার কবে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা কি মনে পড়ে? যার এক দিকে চিত্রা, আর এক দিকে চন্দ্র, তার কবে কোথাকার নিবান বাতির আলো কি মনে পড়ে? রমা সুখ, নন্দা সম্পদ্, শ্রী বিপদ্—যার এক দিকে সুখ, আর এক দিকে সম্পদ্, তার কি বিপদ্‌কে মনে পড়ে?

তবে সে দিন রাত্রিতে শ্রীর চাঁদপানা মুখখানা, ঢল ঢল ছল ছল জলভরা বলহারা চোক দুটো, বড় গোল করিয়া গিয়াছে। রূপের মোহ? আ ছি!

ছি! তা না! তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে, আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল। তা যা হউক—তার একটা বুঝা পড়া হইতে পারিত; ধীরে সুস্থে, সময় বুঝিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া, গুরু পুরোহিত ডাকিয়া, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘনের একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া, যা হয় না হয় হইত।—কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! আ মরি মরি—এমন কি আর হয়!

তবে সীতারামের হইয়া এ কথাটাও আমার বলা কর্ত্তব্য যে, কেবল সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম, পত্নীত্যাগের অধার্ম্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। পূর্ব্বরাত্রিতে যখনই প্রথম শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল যে, আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি। মনে করিয়াছিলেন যে, আগে শ্রীর ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিয়া, নন্দা রমাকে পূর্ব্বেই শান্তভাবাবলম্বন করাইয়া, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে একটু বিচার করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন। কিন্তু পরদিনের ঘটনার স্রোতে সে সব অভিসন্ধি ভাসিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত অনুরাগের তরঙ্গে বালির বাঁধ সব ভাঙ্গিয়া গেল। নন্দা, রমা, চন্দ্রচূড়, সব দূরে থাক—এখন কৈ শ্রী!

শ্রী সহসা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সীতারামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

সীতারাম গাত্রোত্থান করিয়া, যে দিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বনের ভিতর তাল তাল অন্ধকার বাঁধিয়া আছে, কোথায় শাখাচ্ছেদ জন্য বা বৃক্ষবিশেষের শাখায় উজ্জ্বল বর্ণ জন্য, যেন সাদা বোধ হয়, সীতারাম সেই দিকে দৌড়িয়া যান—কিন্তু শ্রীকে পান না। তখন শ্রীর নাম ধরিয়া সীতারাম তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীর উপকূলবর্ত্তী বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন, সে উত্তর দিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সীতারাম সেই দিকে যান—আবার শ্রী বলিয়া ডাকেন, আবার অন্য দিকে প্রতিধ্বনি হয়—আবার সীতারাম সেই দিকে ছুটেন—কই, শ্রী কোথাও নাই! হায় শ্রী! হায় শ্রী! হায় শ্রী! করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল—শ্রী মিলিল না।

কই, যাকে ডাকি, তা ত পাই না। যা খুঁজি, তা ত পাই না। যা পাইয়াছিলাম, হেলায় হারাইয়াছি, তা ত আর পাই না। রত্ন হারায়, কিন্তু হারাইলে আর পাওয়া যায় না কেন? সময়ে খুঁজিলে হয় ত পাইতাম—এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয়, বুঝি চক্ষু গিয়াছে, বুঝি পৃথিবী বড় অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুঁজিতে জানি না। তা কি করিব,—আরও খুঁজি। যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়। এই নিশা প্রভাতকালে শ্রী, সীতারামের হৃদয়ে প্রিয়ার উপর বড় প্রিয়া, হৃদয়ের অধিকারিণী। শ্রীর অনুপম রূপমাধুরী, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীর গুণ এখন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন?

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। শ্রীর ভাই গঙ্গারামকে শ্যামপুরে তিনি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামপুরে গিয়াছে। সীতারাম তখন দ্রুতবেগে শ্যামপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামপুরে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমেই সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গারাম! তোমার ভগিনী কোথায়?" গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি!"

সীতারাম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে। সে এখানে আসে নাই?"

গঙ্গা। না।

সীতা। তুমি এইক্ষণেই তাহার সন্ধানে যাও। সন্ধানের শেষ না করিয়া ফিরিও না। আমি এইখানেই আছি। তুমি সাহস করিয়া সকল স্থানে যাইতে না পার, লোক নিযুক্ত করিও। সে জন্য টাকাকড়ি যাহা আবশ্যক হয়, আমি দিতেছি।

গঙ্গারাম প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্নপূর্ব্বক, এক সপ্তাহ তাঁহার সন্ধান করিল। কোন সন্ধান পাইল না। নিস্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূষণায় যে হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা যে সীতারামের কার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। ভূষণা নগরে সীতারামের অনুগত, বাধ্য প্রজা বা খাদক বিস্তর লোক ছিল। সীতারাম তাহাদের সঙ্গে রাত্রিতে সাক্ষাৎ করিয়া এই হাঙ্গামার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তবে সীতারামের এমন ইচ্ছা ছিল যে, যদি বিনা বিবাদে গঙ্গারামের উদ্ধার হয়, তবে আর তাহার প্রয়োজন নাই। তবে বিবাদ হয়, মন্দ নয়;—মুসলমানের দৌরাত্ম্য বড় বেশী হইয়া উঠিয়াছে, কিছু দমন হওয়া ভাল। চন্দ্রচূড় ঠাকুরের মনটা সে বিষয়ে আরও পরিষ্কার—মুসলমানের অত্যাচার এত বেশী হইয়াছে যে, গোটাকত নেড়া মাথা লাঠির ঘায়ে না ভাঙ্গিলেই নয়। তাই সীতারামের অভিপ্রায়ের অপেক্ষা না করিয়াই চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধটা বেশী গড়াইয়াছিল—ফকিরের প্রাণবধ এমন গুরুতর ব্যাপার যে, সীতারাম ভীত হইয়া কিছু কালের জন্য ভূষণা ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। যাহারা সে দিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেও আপনাদিগকে অপরাধী জানিয়া, এবং কোন দিন না কোন দিন ফৌজদার কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় বাস ত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে সীতারামের আশ্রয়ে ঘর দ্বার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচরবর্গ এবং খাদক, যে যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।

তখন সীতারাম নগরনির্ম্মাণে মনোযোগ দিলেন। যেখানে বহুজনসমাগম, সেইখানেই ব্যবসায়ীরা আসিয়া উপস্থিত হয়; এই জন্য ভূষণা এবং অন্যান্য নগর হইতে দোকানদার, শিল্পী, আড়দ্দার, মহাজন, এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আসিয়া শ্যামপুরে অধিষ্ঠান করিল। সীতারামও তাহাদিগকে যত্ন করিয়া বসাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই নূতন নগর, হাট, বাজার, গঞ্জ, গোলা, বন্দরে পরিপূর্ণ হইল। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের সংগৃহীত অর্থ ছিল, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহা ব্যয় করিয়া তিনি নূতন নগর

সুশোভিত করিতে লাগিলেন। বিশেষ এখন প্রজাবাহুল্য ঘটাতে, তাঁহার বিশেষ আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল। আবার এক্ষণে জনরব উঠিল যে, সীতারাম হিন্দুরাজধানী স্থাপন করিতেছেন; ইহা শুনিয়া দেশে বিদেশে যেখানে মুসলমানপীড়িত, রাজভয়ে ভীত বা ধর্ম্মরক্ষার্থে হিন্দুরাজ্যে বাসের ইচ্ছুক, তাহারা সকলে দলে দলে আসিয়া সীতারামের অধিকারে বাস করিতে লাগিল। অতএব সীতারামের ধনাগম সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রাজপ্রাসাদতুল্য আপন বাসভবন, উচ্চ দেবমন্দির, স্থানে স্থানে সোপানাবলীশোভিত সরোবর, এবং রাজবর্ত্ম সকল নির্ম্মাণ করিয়া নূতন নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন। প্রজাগণও হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপন জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন দান করিতে লাগিল। যাহার ধন নাই, সে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা নগরনির্ম্মাণ ও রাজ্যরক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল।

সীতারামের কর্ম্মঠতা, এবং প্রজাবর্গের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উৎসাহে অতি অল্পদিনেই এই সকল ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহণ করিলেন না; কেন না, দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা না করিলে, তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন। এ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্রোহিতার কোন কার্য্য করেন নাই। গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি প্রকাশ্যে অস্ত্রধারী বা উৎসাহী ছিলেন বলিয়া ফৌজদারের জানিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করার কোন কারণ ছিল না। যখন তিনি রাজা নাম এখনও গ্রহণ করেন নাই; বরং দিল্লীশ্বরকে সম্রাট্ স্বীকার করিয়া জমিদারীর খাজনা পূর্ব্বমত রাজ-কোষাগারে পৌঁছিয়া দিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে মুসলমানের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে লাগিলেন; আর নূতন নগরীর নাম "মহম্মদপুর" রাখিয়া, হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন মুসলমানের অপ্রীতিভাজন হইবার আর কোন কারণই রহিল না।

তথাপি, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, ক্ষমতাবৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, একটা

কোন ছল পাইলেই মহম্মদপুর লুঠপাঠ করিয়া সীতারামকে বিনষ্ট করিবেন। ছল ছুতারই বা অভাব কি? তোরাব খাঁ সীতারামকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, তোমার জমিদারীতে অনেকগুলি বিদ্রোহী ও পলাতক বদমাস বাস করিতেছে, ধরিয়া পাঠাইয়া দিবা। সীতারাম উত্তর করিলেন যে, অপরাধীদিগের নাম পাঠাইয়া দিলে, তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ফৌজদার পলাতক প্রজাদিগের নামের একটি তালিকা পাঠাইয়া দিলেন। শুনিয়া পলাতক প্রজারা সকলেই নাম বদলাইয়া বসিল। সীতারাম কাহারও নামের সহিত তালিকার মিল না দেখিয়া, লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ফর্দ্দের লিখিত নাম কোন প্রজা স্বীকার করে না।

এইরূপে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিলেন। তোরাব খাঁ, সীতারামের ধ্বংসের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সীতারামও আত্মরক্ষার্থ, মহম্মদপুরের চারি পার্শ্বে দুর্ল্লঙ্ঘ্য গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রজাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধরীতি শিখাইতে লাগিলেন, এবং সুন্দরবন-পথে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সকল কার্য্যে সীতারাম তিন জন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। এই তিন জন সহায় ছিল বলিয়া এই গুরুতর কার্য্য এত শীঘ্র এবং সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়ের নাম মৃণ্ময়, তৃতীয় গঙ্গারাম। বুদ্ধিতে চন্দ্রচূড়, বলে ও সাহসে মৃণ্ময়, এবং ক্ষিপ্রকারিতায় গঙ্গারাম। গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্য্যকারী হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতেছিল। এই সময়ে চাঁদ শাহ নামে এক জন মুসলমান ফকির, সীতারামের সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী। তাঁহার সহিত সীতারামের বিশেষ সম্প্রীতি হইল। তাঁহারই পরামর্শমতে, নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, সীতারাম রাজধানীর নাম রাখিলেন, "মহম্মদপুর"।

ফকির আসে যায়। জিজ্ঞাসামতে সৎপরামর্শ দেয়। কেহ বিবাদের কথা তুলিলে তাহাকে ক্ষান্ত করে। অতএব আপাততঃ সকল বিষয় সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সীতারামের যেমন তিন জন সহায় ছিল, তেমনই তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে এক জন পরম শত্রু ছিল। শত্রু—তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী রমা।

রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যূঁইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু, সকলই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও বীর্য্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়। তার উপর আবার রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্ন দেখিলেন যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহাকে এবং সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সেই অসংখ্য মুসলমানের দন্তশ্রেণী-প্রভাসিত বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল। তাহাদের বিকট চীৎকার রাত্রিদিন কানে শুনিতে লাগিল। রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কান দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। সীতারাম বুঝাইলেন যে, তিনি মুসলমানের কাছে কোন অপরাধ করেন নাই—রমা তত বুঝিতে পারিল না। শ্রাবণ মাসের মত, রাত্রি-দিন রমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া সীতারাম আর তত রমার দিকে আসিতেন না। কাজেই জ্যেষ্ঠা (শ্রীকে গণিয়া মধ্যমা) পত্নী নন্দার একাদশে বৃহস্পতি লাগিয়া গেল।

দেখিয়া, বালিকাবুদ্ধি রমা আরও পাকা রকম বুঝিল যে, মুসলমানের সঙ্গে এই বিবাদে, তাঁহার ক্রমে সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব রমা উঠিয়া পড়িয়া সীতারামের পিছনে লাগিল। কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায় পড়া, মাথা খোঁড়ার জালায় রমা যে অঞ্চলে থাকিত, সীতারাম আর সে প্রদেশ মাড়াইতেন না। তখন রমা, যে পথে তিনি নন্দার কাছে যাইতেন, সেই পথে লুকাইয়া থাকিত; সুবিধা পাইলে সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত; তার পর—সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া—ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—কখনও মুষলের ধার, কখনও ইল্‌সে গুড়্‌নি, কখনও কালবৈশাখী, কখনও কার্ত্তিকে ঝড়। ধুয়োটা সেই এক—

মুসলমানের পায়ে কাঁদিয়া গিয়া পড়—নহিলে কি বিপদ্ ঘটিবে! সীতারামের হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

তার পর যখন রমা দেখিল, মহম্মদপুর ভূষণার অপেক্ষা জনাকীর্ণা রাজধানী হইয়া উঠিল, তাহার গড়খাই, প্রাচীর, পরিখা, তাহার উপর কামান সাজান, সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ, দলে দলে সিপাহী কাওয়াজ করিতেছে—তখন রমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বিছানা লইল। যখন একবার পূজাহ্নিকের জন্য শয্যা হইতে উঠিত, তখন রমা ইষ্টদেবের নিকট নিত্য যুক্তকরে প্রার্থনা করিত—"হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারেখারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি। এ মহাভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর।" সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার সম্মুখেই রমা, দেবতার কাছে সেই কামনা করিত।

বলা বাহুল্য, রমার এই বিরক্তিকর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তখন সীতারাম মনে মনে বলিতেন, "হায়! এ দিনে যদি শ্রী আমার সহায় হইত!" শ্রী রাত্রিদিন তাঁহার মনে জাগিতেছিল। শ্রীর স্মরণপটস্থা মূর্ত্তির কাছে নন্দাও নয়, রমাও নয়। কিন্তু মনের কথা জানিতে পারিলে রমা, কি নন্দা পাছে মনে ব্যথা পায়, এজন্য সীতারাম কখন শ্রীর নাম মুখে আনিতেন না। তবে রমার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন, "হায়! শ্রীকে ত্যাগ করিয়া কি রমাকে পাইলাম!"

রমা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তা শ্রীকে গ্রহণ কর না কেন? কে তোমায় নিষেধ করে?"

সীতারাম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শ্রীকে এখন আর কোথায় পাইব!" কথাটা রমার হাড়ে হাড়ে লাগিল। রমার অপরাধ যাই হৌক, স্বামী পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহই তাহার মূল। পাছে তাহাদের কোন বিপদ্ ঘটে, এই চিন্তাতেই সে এত ব্যাকুল। সীতারাম তাহা না বুঝিতেন, এমন নহে। বুঝিয়াও রমার প্রতি প্রসন্ন থাকিতে পারিলেন না—বড় ঘ্যাঁন্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—বড় কাজের বিঘ্ন—বড় যন্ত্রণা। স্ত্রীপুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ। রমা বুঝিল, বিনাপরাধে আমি স্বামীর স্নেহ হারাইয়াছি। সীতারাম ভাবিল, "গুরুদেব! রমার ভালবাসা হইতে আমায় উদ্ধার কর।"

রমার দোষে, সীতারামের হৃদয়স্থিত সেই চিত্রপট দিন দিন আরও উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট হইতে লাগিল। সীতারাম মনে করিয়াছিলেন, রাজ্যসংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুকেই তিনি মনে স্থান দিবেন না—কিন্তু এখন শ্রী আসিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সিংহাসনের আধখান জুড়িয়া বসিল। সীতারাম মনে করিলেন, আমি শ্রীর কাছে যে পাপ করিয়াছি, রমার কাছে তাহার দণ্ড পাইতেছি। ইহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত চাই।

কিন্তু এ মন্দিরে এ প্রতিমা স্থাপনে যে রমাই একা ব্রতী, এমন নহে। নন্দাও তাহার সহায়, কিন্তু আর এক রকমে। মুসলমান হইতে নন্দার কোন ভয় নাই। যখন সীতারামের সাহস আছে, তখন নন্দার সে কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। নন্দা বিবেচনা করিত, সে কথার ভাল মন্দের বিচারক আমার স্বামী—তিনি যদি ভাল বুঝেন, তবে আমার সে ভাবনায় কাজ কি? তাই নন্দা সে সকল কথাকে মনে স্থান না দিয়া, প্রাণপাত করিয়া পতিপদ-সেবায় নিযুক্তা। মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায়, সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত, পদে পদে সেই সংক্ষুব্ধ-সৈন্য-সঞ্চালিনীকে মনে পড়িত! "মার! মার! শত্রু মার! দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, আমার শত্রু, মার!"—সেই কথা মনে পড়িত। সীতারাম তাই মনে মনে সেই মহিমাময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন।

প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে "ভালবাসা", স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক যুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। তবে একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। ভালবাসা বা স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে

না। যাহার সংসর্গে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে, সম্পদে, সুদিনে, দুর্দ্দিনে যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নূতন, আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।

হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর। তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানিমাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে— অনন্তের অংশ।

হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? যে দিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেই দিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। নয়ন মুদিলে শ্রী মিলিবে। ততদিন এসো, আমরা বুক বাঁধিয়া, হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মিলে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"এই ত বৈতরণী! পার হইলে না কি সকল জ্বালা জুড়ায়! আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

খরবাহিনী বৈতরণীসৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল। পশ্চাৎ অতি দূরে নীলমেঘের মত নীলগিরির* শিখরপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল; সম্মুখে নীলসলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতপ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকতমধ্যে বাহিতা হইতেছিল; পারে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর সপ্ত মাতৃকার মণ্ডপ শোভা পাইতেছিল; তন্মধ্যে আসীনা সপ্ত মাতৃকার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল; রাজ্ঞীশোভাসমন্বিতা ইন্দ্রাণী, মধুররূপিণী বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, সাক্ষাৎ বীভৎসরসরূপধারিণী যমপ্রসূতি ছায়া, নানালঙ্কারভূষিতা বিপুলোরুকরচরণোরসী কম্বুকণ্ঠান্দোলিতরত্নহারা লম্বোদরা চীনাম্বরা বরাহবদনা বারাহী, বিশুষ্কাস্থিচর্ম্মমাত্রাবশেষা পলিতকেশা নগ্নবেশা চণ্ডমুণ্ডধারিণী ভীষণা চামুণ্ডা, রাশি রাশি কুসুম চন্দন বিল্বপত্রে প্রপীড়িতা হইয়া বিরাজ করিতেছে। তৎপশ্চাৎ বিষ্ণুমণ্ডপের উচ্চ চূড়া নীলাকাশে চিত্রিত; তৎপরে নীলপ্রস্তরের উচ্চস্তম্ভোপরি আকাশমার্গে খগপতি গরুড় সমাসীন।† অতিদূরে উদয়গিরির ও ললিতগিরির বিশাল নীল কলেবর আকাশপ্রান্তে শয়ান।‡ এই সকলের প্রতি শ্রী চাহিয়া দেখিল; বলিল, "হায়! এই ত বৈতরণী! পার হইলে আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

"এ সে বৈতরণী নহে—
যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী—
আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও—তবে সে বৈতরণী দেখিবে।"

পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ এই উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসিনী।

---

* বালেশ্বর জেলার উত্তরভাগস্থিত কতকগুলি পর্ব্বতকে নীলগিরি বলে। তাহাই কোন কোন স্থানে বৈতরণীতীর হইতে দেখা যায়।

† এই গরুড়স্তম্ভ দেখিতে অতি চমৎকার।

‡ পুরুষোত্তম যাইবার আধুনিক যে রাজপথ, এই সকল পর্ব্বত, তাহার বামে থাকে। নিকট নহে।

শ্রী বলিল, "ও মা! সেই সন্ন্যাসিনী! তা, মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ পারে, না ও পারে?"

সন্ন্যাসিনী হাসিল; বলিল, "বৈতরণী পার হইয়া যমপুরে পৌঁছিতে হয়। কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? তুমি এ পারেই কি যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ?"

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দুই পারেই আছে।

সন্ন্যাসিনী। না, মা, যন্ত্রণা সব এই পারেই। ও পারে যে যন্ত্রণার কথা শুনিতে পাও, সে আমরা এই পার হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। আমাদের এ জন্মের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরি বাঁধিয়া, বৈতরণীর সেই ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই। পরে যমালয়ে গিয়া গাঁটরি খুলিয়া ধীরে সুস্থে সেই ঐশ্বর্য্য একা একা ভোগ করি।

শ্রী। তা, মা, বোঝাটা এ পারে রাখিয়া যাইবার কোন উপায় আছে কি? থাকে ত আমায় বলিয়া দাও, আমি শীঘ্র শীঘ্র উহার বিলি করিয়া বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া যাই, রাত করিবার দরকার দেখি না—

সন্ন্যাসিনী। এত তাড়াতাড়ি কেন মা? এখনও তোমার সকাল বেলা।

শ্রী। বেলা হ'লে বাতাস উঠিবে।

সন্ন্যাসিনীর আজিও তুফানের বেলা হয় নাই—বয়সটা কাঁচা রকমের। তাই শ্রী এই রকমের কথা কহিতে সাহস করিতেছিল। সন্ন্যাসিনীও সেই রকম উত্তর দিল, "তুফানের ভয় কর মা! কেন, তোমার কি তেমন পাকা মাঝি নাই?"

শ্রী। পাকা মাঝি আছে, কিন্তু তাঁর নৌকায় উঠিলাম না। কেন তাঁর নৌকা ভারি করিব?

সন্ন্যাসিনী। তাই কি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈতরণী-তীরে আসিয়া বসিয়া আছ?

শ্রী। আরও পাকা মাঝির সন্ধানে যাইতেছি। শুনিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই না কি পারের কাণ্ডারী।

সন্ন্যাসিনী। আমিও সেই কাণ্ডারী খুঁজিতে যাইতেছি। চল না, দুই জনে একত্রে যাই। কিন্তু আজ তুমি একা কেন? সে দিন সুবর্ণরেখাতীরে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তোমার সঙ্গে অনেক লোক ছিল—আজ একা কেন?

শ্রী। আমার কেহ নাই। অর্থাৎ আমার অনেক আছে, কিন্তু আমি ইচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্যাগী। আমি এক যাত্রীর দলে যুটিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলাম, কিন্তু যে যাত্রাওয়ালার (পাণ্ডা) সঙ্গে আমরা যাইতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি কিছু কৃপাদৃষ্টি করার লক্ষণ দেখিলাম। কিছু দৌরাত্ম্যের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কালি রাত্রিতে যাত্রীর দল হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলাম।

সন্ন্যাসিনী। এখন?

শ্রী। এখন, বৈতরণী-তীরে আসিয়া ভাবিতেছি, দুই বার পারে কাজ নাই। এক বারই ভাল। জল যথেষ্ট আছে।

সন্ন্যাসিনী। সে কথাটা না হয়, তোমায় আমায় দুই দিন বিচার করিয়া দেখা যাইবে। তার পর বিচারে যাহা স্থির হয়, তাহাই করিও। বৈতরণী ত তোমার ভয়ে পলাইবে না! কেমন, আমার সঙ্গে আসিবে কি?

শ্রীর মন টলিল। শ্রীর এক পয়সা পুঁজি নাই। দল ছাড়িয়া আসিয়া অবধি আহার হয় নাই; শ্রী দেখিতেছিল, ভিক্ষা এবং মৃত্যু, এই দুই ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে যেন উপায়ান্তর হইতে পারে বোধ হইল, কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মা? তুমি দিনপাত কর কিসে?"

সন্ন্যাসিনী। ভিক্ষায়।

শ্রী। আমি তাহা পারিব না—বৈতরণী তাহার অপেক্ষা সহজ বোধ হইতেছিল।

সন্ন্যাসিনী। তাহা তোমায় করিতে হইবে না—আমি তোমার হইয়া ভিক্ষা করিব।

শ্রী। বাছা, তোমার এই বয়স—তুমি আমার অপেক্ষা ছোট বৈ বড় হইবে না। তোমার এই রূপের রাশি—

সন্ন্যাসিনী অতিশয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল—ঘসা ফানুষের ভিতর আলোর মত রূপের আগুন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীর কথার উত্তরে সন্ন্যাসিনী বলিল, "আমরা উদাসীন, সংসারত্যাগী, আমাদের কিছুতেই কোন ভয় নাই। ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করেন।"

শ্রী। তা যেন হইল। তুমি সন্ন্যাসিনী বলিয়া নির্ভয়। কিন্তু আমি বেলপাতের পোকার মত, তোমার সঙ্গে বেড়াইব কি প্রকারে? তুমিই বা লোকের কাছে এ পোকার কি পরিচয় দিবে? বলিবে কি যে, উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়িয়াছে?

সন্ন্যাসিনী হাসিল—ফুল্লাধরে মধুর হাসিতে বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘাবৃত আকাশের ন্যায়, সেই ভস্মাবৃত রূপমাধুরী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসিনী বলিল, "তুমিও কেন বাছা এই বেশ গ্রহণ কর না?"

শ্রী শিহরিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি? আমি সন্ন্যাসিনী হইবার কে?"

সন্ন্যাসিনী। আমি তাহা হইতে বলিতেছি না। তুমি যখন সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ বলিতেছ, তখন তোমার চিত্তে যদি পাপ না থাকে, তবে হইলেই বা দোষ কি? কিন্তু এখন সে কথা থাক—এখন তা বলিতেছি না। এখন এই বেশ ছদ্মবেশস্বরূপ গ্রহণ কর না—তাতে দোষ কি?

শ্রী। মাথা মুড়াইতে হইবে? আমি সধবা।

সন্ন্যাসিনী। আমি মাথা মুড়াই নাই দেখিতেছ।

শ্রী। জটা ধারণ করিয়াছ?

সন্ন্যাসিনী। না, তাও করি নাই। তবে চুলগুলাতে কখনও তেল দিই না, ছাই মাখিয়া রাখি, তাই কিছু জট পড়িয়া থাকিবে।

শ্রী। চুলগুলি যেরূপ কুণ্ডলী করিয়া ফণা ধরিয়া আছে, আমার ইচ্ছা করিতেছে, একবার তেল দিয়া আঁচড়াইয়া বাঁধিয়া দিই।

সন্ন্যা। জন্মান্তরে হইবে,—যদি মানবদেহ পাই। এখন তোমায় সন্ন্যাসিনী সাজাইব কি?

শ্রী। কেবল চুলে ছাই মাখিলেই কি সাজ হইবে?

সন্ন্যা। না—গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি, সব আমার এই রাঙ্গা ঝুলিতে আছে। সব দিব।

শ্রী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইল। তখন নিভৃত এক বৃক্ষতলে বসিয়া সেই রূপসী সন্ন্যাসিনী শ্রীকে আর এক রূপসী সন্ন্যাসিনী সাজাইল। কেশদামে ভস্ম মাখাইল, অঙ্গে গৈরিক পরাইল, কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ পরাইল, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিল, পরে রঙ্গের দিকে মন দিয়া শ্রীর

কপালে একটি চন্দনের টিপ দিয়া দিল। তখন ভুবনবিজয়াভিলাষী মধুমন্মথের ন্যায় দুই জনে যাত্রা করিয়া, বৈতরণী পার হইয়া, সে দিন এক দেবমন্দিরের অতিথিশালায় রাত্রি যাপন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, খরস্রোতা*জলে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও সন্ন্যাসিনী, বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি-শোভিতা হইয়া পুনরপি, "সঞ্চারিণী দীপশিখা"দ্বয়ের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল। তৎপ্রদেশবাসীরা সর্ব্বদাই নানাবিধ যাত্রীকে সেই পথে যাতায়াত করিতে দেখে, কোন প্রকার যাত্রী দেখিয়া বিস্মিত হয় না, কিন্তু আজ ইহাদিগকে দেখিয়া তাহারাও বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, "কি পরি মাইকিনিয়া মানে যাউছন্তি পারা?" কেহ বলিল, "সে মানে স্থাবতা হ্যাব।" কেহ আসিয়া প্রণাম করিল; কেহ ধন দৌলত বর মাগিল। একজন পণ্ডিত তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, "কিছু বলিও না; ইঁহারা বোধ হয় রুক্মিণী সত্যভামা স্বশরীরে স্বামিদর্শনে যাইতেছেন।" অপরে মনে করিল যে, রুক্মিণী সত্যভামা শ্রীক্ষেত্রেই আছেন, তাঁহাদিগের গমন সম্ভব নহে; অতএব নিশ্চয়ই ইঁহারা শ্রীরাধিকা এবং †চন্দ্রাবলী, গোপকন্যা বলিয়া পদব্রজে যাইতেছেন। এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইলে, এক দুষ্টা স্ত্রী বলিল, "হউ হউ! যা! যা! সেঠিয়ে তা ভৌউড়ি অছি, তুমানঙ্কো মারি পকাইব।"

এ দিকে শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী আপন মনে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছিল। সন্ন্যাসিনী বিরাগিণী প্রব্রজিতা, অনেক দিন হইতে তাহার সুহৃদ্ কেহ নাই; আজ এক জন সমবয়স্কা প্রব্রজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল। এখনও তার জীবনস্রোতঃ কিছুই শুকায় নাই। বরং শ্রীর শুকাইয়াছিল; কেন না, শ্রী দুঃখ কি, তাহা জানিয়াছিল, সন্ন্যাসী বৈরাগীর দুঃখ নাই। কথাবার্ত্তা যাহা হইতেছিল, তাহার মধ্যে গোটা দুই কথা কেবল পাঠককে শুনান আবশ্যক।

---

* নদীর নাম।

† সুভদ্রা।

সন্ন্যাসিনী। তুমি বলিতেছ, তোমার স্বামী আছেন। তিনি তোমাকে লইয়া ঘর সংসার করিতেও ইচ্ছুক। তাতে তুমি গৃহত্যাগিনী হইয়াছ কেন, তাও তোমায় জিজ্ঞাসা করি না। কেন না, তোমার ঘরের কথা আমার জানিয়া কি হইবে? তবে এটা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, কখনও ঘরে ফিরিয়া যাইবার তোমার ইচ্ছা আছে কি না?

শ্রী। তুমি হাত দেখিতে জান?

সন্ন্যা। না। হাত দেখিয়া কি তাহা জানিতে হইবে?

শ্রী। না। তাহা হইলে আমি তোমাকে হাত দেখাইয়া, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে বিষয় স্থির করিতাম।

সন্ন্যা। আমি হাত দেখিতে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইতে পারি যে, তিনি এ বিদ্যায় ও আর সকল বিদ্যাতেই অভ্রান্ত।

শ্রী। কোথায় তিনি?

সন্ন্যা। ললিতগিরিতে হস্তিগুম্ফায় এক যোগী বাস করেন। আমি তাঁহার কথা বলিতেছি।

শ্রী। ললিতগিরি কোথায়?

সন্ন্যা। আমরা চেষ্টা করিলে আজ সন্ধ্যার পর পৌছিতে পারি।

শ্রী। তবে চল।

তখন দুই জনে দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ দেখিলে বলিত, আজ বৃহস্পতি শুক্র উভয় গ্রহ যুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হইয়াছে।*

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী, নীলবারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে।†

---

* হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে Accelerated Motionকে শীঘ্রগতি বলে। দুইটী গ্রহকে পৃথিবী হইতে যখন এক রাশিস্থিত দেখা যায়, তখন তাহাদিগকে যুক্ত বলা যায়।

† এখন বিরূপা অতিশয় বিরূপা। এখন তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজের প্রতাপে বৈতরণী স্বয়ং বাঁধা— বিরূপাই বা কে—আর কেই বা কে?

গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত, পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান অল্‌তিগিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্‌তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ, এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখর-দেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্নগৃহবিশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রিয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্থইন্‌বর্ণ্‌ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্‌ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া, সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারি দিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র,—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু-যোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কার স্বরূপ, তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তার পর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ; সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে,—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা হোক—চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্‌ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে, হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া, আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভপ্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারি দিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়া আছে।

কিন্তু গুহার এ দশা আজকাল হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এমন ছিল না—গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে সন্ন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথা উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া, তাঁহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিলেন।

প্রত্যূষে ধ্যান ভঙ্গ হইলে, গঙ্গাধর স্বামী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিরূপায় স্নান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী শ্রীর সঙ্গে তখন কোন কথা কহিলেন না, বা তৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসিনীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি কেবল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য—সকল কথাই সংস্কৃত ভাষায় হইল

শ্রী তাহার এক বর্ণ বুঝিল না। যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালায় বলিতেছি।

স্বামী। এ স্ত্রী কে?

সন্ন্যাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যা। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে। উহার প্রতি ধর্ম্মানুমত আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখ পানে চাহিয়া দেখিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "তোমার কর্কট রাশি।"*

শ্রী নীরব।

"তোমার পুষ্যা নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

শ্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া, তাহার বাম হস্তের রেখা সকল, স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল, সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহাস্থিত তালপত্র-লিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া, দ্বাদশ ভাবে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, "তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।"**

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ, এবং শুভগ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রে† পাপদৃষ্ট হইয়া আছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

---

* পরকনকশরীরো দেবনম্রপ্রকাশ্যো
ভবতি বিপুলবক্ষাঃ কর্কটো যস্য রাশিঃ।—কোষ্ঠীপ্রদীপে।
এইরূপ লক্ষণাদি দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা রাশি ও নক্ষত্র নির্ণয় করেন।

** জায়াস্থে চ শুভত্রয়ে প্রণয়িনী রাজ্ঞী ভবেদ্‌ভূপতেঃ।

† মকরে।

শ্রী তা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল। আরও একটু দেখিয়া স্বামীকে বলিল, "আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?"

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী। তাহাতে কি হয়?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন, "তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামিসন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথা যাইতেছ?

শ্রী। পুরুষোত্তমদর্শনে যাইব, মনে করিয়াছি।

স্বামী। যাও। সময়ান্তরে, আগামী বৎসরে, তুমি আমার নিকট আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

তখন স্বামী সন্ন্যাসিনীকেও বলিলেন, "তুমিও আসিও।"

তখন গঙ্গাধর স্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আবার সেই যুগল সন্ন্যাসিনীমূর্ত্তি উড়িষ্যার রাজপথ আলো করিয়া পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিল। উড়িয়ারা পথে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। কেহ আসিয়া তাহাদের পায়ের কাছে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "মো মুণ্ডেরে চরড় দিবারে হউ।" কেহ কেহ বলিল, "টিকে ঠিয়া হৈকিরি ম দুঃখ শুনিবারে হউ।" সকলকে যথাসম্ভব উত্তরে প্রফুল্ল করিয়া সুন্দরীদ্বয় চলিল।

চঞ্চলগামিনী শ্রীকে একটু স্থির করিবার জন্য সন্ন্যাসিনী বলিল, "ধীরে যা গো বহিন্! একটু ধীরে যা। ছুটিলে কি অদৃষ্ট ছাড়াইয়া যাইতে পারিবি?"

স্নেহসম্বোধনে শ্রীর প্রাণ একটু জুড়াইল। দুই দিন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থাকিয়া, শ্রী তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ দুই দিন, মা! বাছা! বলিয়া কথা হইতেছিল,—কেন না, সন্ন্যাসিনী শ্রীর পূজনীয়া। সন্ন্যাসিনী সে সম্বোধন ছাড়িয়া বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল যে, সেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রী ধীরে চলিল।

সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিল, "আর মা বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না—আমাদের দুজনেরই সমান বয়স, আমরা দুই জনে ভগিনী।"

শ্রী। তুমিও কি আমার মত দুঃখে সংসার ত্যাগ করিয়াছ?

সন্ন্যাসিনী। আমার সুখ দুঃখ নাই।' তেমন অদৃষ্ট নয়। তোমার দুঃখের কথা শুনিব। সে এখনকার কথা নয়। তোমার নাম এখনও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—কি বলিয়া তোমায় ডাকিব?

শ্রী। আমার নাম শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?

সন্ন্যাসিনী। আমার নাম জয়ন্তী। আমাকে তুমি নাম ধরিয়াই ডাকিও। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে? এখন বোধ হয় তোমার আর ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। দিন কাটাইবারও অন্য উপায় নাই। দিন কাটাইবে কি প্রকারে, কখনও কি ভাবিয়াছ?

শ্রী। না ভাবি নাই। কিন্তু এত দিন ত কাটিয়া গেল।

জয়ন্তী। কিরূপে কাটিল?

শ্রী। বড় কষ্টে—পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আঁর নাই।

জয়ন্তী। ইহার এক উপায় আছে—আর কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দিব?

জয়ন্তী। এত বড় জগৎ—কিছুই কি মন দিবার নাই?

শ্রী। পাপে?

জয়ন্তী। না। পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামিসেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে?

জয়ন্তী। স্বামীর এক জন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী—কেন না, তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামিবিরহদুঃখই আমি ভালবাসি।

জয়ন্তী। যদি এত ভাল বাসিয়াছিলে—তবে ত্যাগ করিলে কেন?

শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না? কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে?

শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ববিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু একটু ছল ছল করিল। জয়ন্তী বলিল, "তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়—এত ভাল বাসিলে কিসে?"

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস—কয়দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?

জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম।

জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চকলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল, "যদি একত্র ঘর সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষ' গুণ আছে। তাঁরও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মন ভার, অকৌশল ঘটিত। তা হইলে, এ আগুন এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া, দেয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিনভোর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলভরা গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে

করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া কখনও মনে হয় নাই যে, ঠাকুরপ্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তার পর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

জয়ন্তীরও চক্ষু ছল ছল করিল। এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী ?

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্ধ্যা—জয়ন্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সীতারাম প্রথমাবধিই শ্রীর বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল। এই কয় বৎসর সীতারাম ক্রমশঃ শ্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অন্য লোকে শ্রীকে চিনে না বলিয়া সন্ধান হইতেছে না, এই শঙ্কায় গঙ্গারামকেও কিছু দিনের জন্য রাজকর্ম্ম হইতে অবসৃত করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গারামও বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

শেষে সীতারাম স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ পর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই; কেন না, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। তাঁর সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির করিলেন।

কিন্তু সময়টা বড় মন্দ উপস্থিত হইল। কেন না, হিন্দুর হিন্দুয়ানী বড় মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, মুসলমানের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজ মহম্মদপুর উচ্চচূড় দেবালয় সকলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিকটে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গৃহে গৃহে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দৈবোৎসব, নৃত্য গীত, হরিসংকীর্ত্তনে দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ, মনুষ্যাধম মুর্শিদ্ কুলি খাঁ* মুরশিদাবাদের মসনদে আরূঢ় থাকায়, সুবে বাঙ্গালার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল—বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লিখে না। মুর্শিদ্ কুলি খাঁ শুনিলেন, সর্ব্বত্র হিন্দু ধূল্যবলুণ্ঠিত, কেবল এইখানে তাহাদের বড় প্রশ্রয়। তখন তিনি তোরাব্ খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন—"সীতারামকে বিনাশ কর।"

---

* ইংরেজ ইতিহাসবেত্তৃগণের পক্ষপাত এবং কতকটা অজ্ঞতা নিবন্ধন সেরাজউদ্দৌলা ঘৃণিত, এবং মুর্শিদ্ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুর্শিদের তুলনায় সেরাজউদ্দৌলা দেবতাবিশেষ ছিলেন।

অতএব ভূষণায় সীতারামের ধ্বংসের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তবে, 'উদ্যোগ কর' বলিবামাত্র উদ্যোগটা হইয়া উঠিল না, কেন না, মুর্‌শিদ্ কুলি খাঁ সীতারামের বধের জন্য হুকুম পাঠাইয়াছিলেন, ফৌজ পাঠান নাই। ইহাতে তিনি তোরাবের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই, মুসলমানের পক্ষে তাঁহার অবিচার ছিল না। তখনকার সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে—সাধারণ 'শান্তিরক্ষার' কার্য্য ফৌজদারেরা নিজ ব্যয়ে করিবেন,—বিশেষ কারণ ব্যতীত নবাবের সৈন্য ফৌজদারের সাহায্যে আসিত না। এক জন জমীদারকে শাসিত করা, সাধারণ শান্তিরক্ষার কার্য্যের মধ্যে গণ্য—তাই নবাব কোন সিপাহী পাঠাইলেন না। এ দিকে ফৌজদার হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, যখন শুনা যাইতেছে যে, সীতারাম রায়, আপনার এলাকার সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়াছে, তখন ফৌজদারের যে কয় শত সিপাহী আছে, তাহা লইয়া মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে যাওয়া বিধেয় হয় না। অতএব ফৌজদারের প্রথম কার্য্য সিপাহী-সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেটা দুই এক দিনে হয় না। বিশেষ তিনি পশ্চিমে মুসলমান—দেশী লোকের যুদ্ধ করিবার শক্তির উপর তাঁহার কিছু মাত্র বিশ্বাস ছিল না। অতএব মুরশিদাবাদ বা বেহার বা পশ্চিমাঞ্চল হইতে সুশিক্ষিত পাঠান আনাইতে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সীতারামও অনেক শিক্ষিত রাজপুত ও ভোজপুরী (বেহারবাসী) আপনার সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কাজেই তদুপযোগী সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া সীতারামকে ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিতে পারিলেন না। তাহাতে একটু কালবিলম্ব হইল। তত দিন যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল।

তোরাব্ খাঁ বড় গোপনে গোপনে এই সকল উদ্যোগ করিতেছিলেন। সীতারাম অগ্রে যাহাতে কিছুই না জানিতে পারে, হঠাৎ গিয়া তাহার উপর ফৌজ লইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু সীতারাম সমুদয়ই জানিতেন। চতুর চন্দ্রচূড় জানিতেন। গুপ্তচর ভিন্ন রাজ্য নাই—রামচন্দ্রেরও দুর্ম্মুখ ছিল। চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর ভূষণার ভিতরেও ছিল। অতএব সীতারামকে রাজধানী সহিত ধ্বংস করিবার আজ্ঞা যে মুরশিদাবাদ হইতে আসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বাছা বাছা সিপাহী সংগ্রহ হইতেছে, ইহা চন্দ্রচূড় জানিলেন।

ইহার সকল উদ্যোগ করিয়া সীতারাম কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। গমনকালে সীতারাম রাজ্যরক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃণ্ময় ও গঙ্গারামের উপর দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর, সৈন্যের অধিকার মৃণ্ময়কে, নগররক্ষার ভার গঙ্গারামকে, এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না। সুতরাং রমা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কান্নাকাটি একটু থামিলে, রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। তাহার বুদ্ধিতে এই উদয় হইল যে, এ সময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসিয়া যায় না। হয় ত তাহারা বর্শা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয় ত তরবারি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, নয় ত বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে, নয় ত খোঁপা ধরিয়া ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে। তা যা করে, করুক, রমার তাতে তত ক্ষতি নাই, সীতারাম ত নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে বসিয়া থাকিবেন। তা, সে এক রকম ভালই হইয়াছে। তবে কি না, রমা তাঁকে আর এখন দেখিতে পাইবে না, তা না পাইল, আর জন্মে দেখিবে। কই, মহম্মদপুরেও ত এখন আর বড় দেখা শুনা হইত না। তা দেখা না হউক, সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।

যদি এক বৎসর আগে হইত, তবে এইটুকু ভাবিয়াই রমা ক্ষান্ত হইত; কিন্তু বিধাতা তার কপালে শান্তি লিখেন নাই। এক বৎসর হইল, রমার একটি ছেলে হইয়াছে। সীতারাম যে আর তাহাকে দেখিতে পারিতেন না, ছেলের মুখ দেখিয়া রমা তাহা একরকম সহিতে পারিয়াছিল। রমা আগে সীতারামের ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তার পর আপনার ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তার পর ছেলের ভাবনা ভাবিল—ছেলের কি হইবে? "আমি যদি মরি, আমায় যদি মারিয়া ফেলে,

তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে? তা ছেলে না হয়, দিদিকে দিয়া যাইব। কিন্তু সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না; সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে? ভাল কথা, আমাকেই যদি মুসলমানে মারিয়া ফেলে, তা আমার সতীনকেই কি রাখিবে? সেও ত আর পীর নয়। তা, আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে। তা ছেলে কাকে দিয়ে যাব?"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল, মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশ! রমা এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল? মুসলমানেরা ডাকাত, চুয়াড়, গোরু খায়, শক্র— তাহারা ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশের কথা! কেন সীতারাম দিল্লী গেলেন! রমা এ কথা কাকে জিজ্ঞাসা করে? কিন্তু মনের মধ্যে এ সন্দেহ লইয়াও ত শরীর বহা যায় না। রমা আর ভাবিতে চিন্তিতে পারিল না। অগত্যা নন্দার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

গিয়া বলিল, "দিদি, আমার বড় ভয় করিতেছে—রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন?"

নন্দা বলিল, "রাজার কাজ রাজাই বুঝেন—আমরা কি বুঝিব বহিন!"

রমা। তা এখন যদি মুসলমান আসে, তা কে পুরী রক্ষা করিবে?

নন্দা। বিধাতা করিবেন। তিনি না রাখিলে কে রাখিবে?

রমা। তা মুসলমান কি সকলকেই মারিয়া ফেলে?

নন্দা। যে শক্র, সে কি আর দয়া করে?

রমা। তা, না হয়, আমাদেরই মারিয়া ফেলিবে—ছেলেপিলের উপর দয়া করিবে না কি?

নন্দা। ও সকল কথা কেন মুখে আন, দিদি? বিধাতা যা কপালে লিখেছেন, তা অবশ্য ঘটিবে। কপালে মঙ্গল লিখিয়া থাকেন, মঙ্গলই হইবে। আমরা ত তাঁর পায়ে কোন অপরাধ করি নাই—আমাদের কেন মন্দ হইবে? কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও! আয়, পাশা খেলিবি? তোর নথের নূতন নোলক জিতিয়া নিই আয়।

এই বলিয়া নন্দা, রমাকে অন্যমনা করিবার জন্য পাশা পাড়িল। রমা অগত্যা এক বাজি খেলিল, কিন্তু খেলায় তার মন গেল না। নন্দা ইচ্ছাপূর্ব্বক

বাজি হারিল—রমার নাকের নোলক বাঁচিয়া গেল। কিন্তু রমা আর খেলিল না—এক বাজি উঠিলেই রমাও উঠিয়া গেল।

রমা, নন্দার কাছে আপন জিজ্ঞাস্য কথার উত্তর পায় নাই—তাই সে খেলিতে পারে নাই। কতক্ষণে সে আর এক জনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে, সেই ভাবনাই ভাবিতেছিল। রমা আপনার মহলে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার এক জন বর্ষীয়সী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা—মুসলমানেরা কি ছেলে মারে?"

বর্ষীয়সী বলিল, "তারা কাকে না মারে? তারা গোরু খায়, নেমাজ করে, তারা ছেলে মারে না ত কি?"

রমার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। রমা তখন যাহাকে পাইল, তাহাকেই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল, পুরবাসিনী আবালবৃদ্ধা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই মুসলমানভয়ে ভীত, কেহই মুসলমানকে ভাল চক্ষুতে দেখে না—সকলেই প্রায় বর্ষীয়সীর মত উত্তর দিল। তখন রমা সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া, বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া, ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে তোরাব্ খাঁ সংবাদ পাইলেন যে, সীতারাম মহম্মদপুরে নাই, দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, এই শুভ সময়, এই সময় মহম্মদপুর পোড়াইয়া ছারখার করাই ভাল। তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সংবাদও মহম্মদপুরে পৌঁছিল। নগরে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গৃহস্থেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল। কেহ মাসীর বাড়ী, কেহ পিসীর বাড়ী, কেহ খুড়ার বাড়ী, কেহ মামার বাড়ী, কেহ শ্বশুরবাড়ী, কেহ জামাইবাড়ী, কেহ বেহাইবাড়ী, বোনাইবাড়ী, সপরিবার, ঘটি বাটি, সিন্দুক, পেটারা, তক্তপোষ সমেত গিয়া দাখিল হইল। দোকানদার দোকান লইয়া পলাইতে লাগিল, মহাজন গোলা বেচিয়া পলাইতে লাগিল, আড়তদার আড়ত বেচিয়া পলাইল, শিল্পকর যন্ত্র তন্ত্র মাথায় করিয়া পলাইল। বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম দাস, চন্দ্রচূড়ের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিলেন। বলিলেন, "এখন ঠাকুর কি করিতে বলেন? সহর ত ভাঙ্গিয়া যায়।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ যে পলায় পলাক, নিষেধ করিও না। বরং তাহাতে প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু তোরাব্ খাঁ আসিয়া যদি গড় ঘেরাও করে, তবে গড়ে যত খাইবার লোক কম থাকে, ততই ভাল, তা হলে দুই মাস ছয় মাস চালাইতে পারিব। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, তাহাদের একজনকেও যাইতে দিবে না, যে যাইবে, তাহাকে গুলি করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্র শস্ত্র একখানিও সহরের বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না। আর খাবার সামগ্রী এক মুঠাও বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না।"

সেনাপতি মৃণ্ময় রায় আসিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "এখানে পড়িয়া মার খাইব কেন? যদি তোরাব্ খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অর্দ্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মারিয়া আসি না কেন?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এই প্রবলা নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি অর্দ্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না; কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এ পারে কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ নদী পার হয়? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়। সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান এ পারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।"

চন্দ্রচূড় গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্তচর ফিরিলেই তিনি সংবাদ পাইবেন, কখন কোন্ পথে তোরাব্ খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে; তখন ব্যবস্থা করিবেন।

এ দিকে অন্তঃপুরে সংবাদ পৌছিল যে, তোরাব্ খাঁ সসৈন্যে মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে। বহির্ব্বাটীর অপেক্ষা অন্তঃপুরে সংবাদটা কিছু বাড়িয়া যাওয়াই রীতি। বাহিরে, "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, আসিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভিতর মহলে, "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, "প্রায় আসিয়া পৌছিয়াছে।" তখন সে অন্তঃপুর মধ্যে কাঁদাকাটার ভারি ধুম পড়িয়া গেল। নন্দার বড় কাজ বাড়িয়া গেল—কয়জনকে একা বুঝাইবে, কয়জনকে

থামাইবে! বিশেষ রমাকে লইয়াই নন্দাকে বড় ব্যস্ত হইতে হইল—কেন না, রমা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। নন্দা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি—কিন্তু প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমাকে আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে।" তাই নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।

এ দিকে পৌরস্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল—"মা! তুমি এক কাজ কর—সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর—সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাঙ্গিয়া লও। আমরা বাঙ্গালী মানুষ, আমাদের লড়াই ঝগড়া কাজ কি মা! প্রাণ বাঁচিলে আবার সব হবে। সকলের প্রাণ তোমার হাতে—মা, তোমার মঙ্গল হোক—আমাদের কথা শোন।"

নন্দা তাহাদিগকে বুঝাইলেন। বলিলেন, "ভয় কি মা! পুরুষ মানুষের চেয়ে তোমরা কি বেশী বুঝ? তাঁরা যখন বলিতেছেন ভয় নাই, তখন ভয় কেন? তাঁদের কি আপনার প্রাণে দরদ নাই—না আমাদের প্রাণে দরদ নাই?"

এই সকল কথার পর রমা বড় মূর্চ্ছা গেল না। উঠিয়া বসিল। কি কথা ভাবিয়া মনে সাহস পাইয়াছিল, তাহা পরে বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম নগররক্ষক। এ সময়ে রাত্রিতে নগর পরিভ্রমণে তিনি বিশেষ মনোযোগী। যে দিনের কথা বলিলাম, সেই রাত্রিতে, তিনি নগরের অবস্থা জানিবার জন্য, পদব্রজে, সামান্য বেশে, গোপনে, একা নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, ক্লান্ত হইয়া, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার বাসনায়, গৃহাভিমুখী হইতেছিলেন, এমন সময়ে কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

গঙ্গারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক। রাত্রি অন্ধকার, রাজপথে আর কেহ নাই—কেবল একাকিনী সেই স্ত্রীলোক। অন্ধকারে স্ত্রীলোকের আকার, স্ত্রীলোকের বেশ, ইহা জানা গেল—কিন্তু আর কিছুই বুঝা গেল না। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

স্ত্রীলোক বলিল, "আমি যে হই, তাতে আপনার কিছু প্রয়োজন নাই। আমাকে বরং জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি চাই।"

কথার স্বরে বোধ হইল যে, এই স্ত্রীলোকের বয়স বড় বেশী নয়। তবে কথাগুলা জোর জোর বটে। গঙ্গারাম বলিল, "সে কথা পরে হইবে। আগে বল দেখি, তুমি স্ত্রীলোক, এত রাত্রে একাকিনী রাজপথে কেন বেড়াইতেছ? আজকাল কিরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহা কি জান না?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এত রাত্রে একাকিনী আমি এই রাজপথে, আর কিছু করিতেছি না—কেবল আপনারই সন্ধান করিতেছি।"

গঙ্গারাম। মিছা কথা। প্রথমতঃ তুমি চেনই না যে, আমি কে?

স্ত্রীলোক। আমি চিনি যে, আপনি দাস মহাশয়, নগররক্ষক।

গঙ্গারাম। ভাল, চেন দেখিতেছি। কিন্তু আমাকে এখানে পাইবার সম্ভাবনা, ইহা তুমি জানিবার সম্ভাবনা নাই; কেন না, আমিই জানিতাম না যে, আমি এখন এ পথে আসিব।

স্ত্রীলোক। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনাকে গলিতে গলিতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আপনার বাড়ীতেও সন্ধান লইয়াছি।

গঙ্গারাম। কেন?

স্ত্রীলোক। সেই কথাই আপনার আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। আপনি একটা দুঃসাহসিক কাজ করিতে পারিবেন?

গঙ্গা। কি?

স্ত্রীলোক। আমি আপনাকে যেখানে লইয়া যাইব, সেইখানে এখনই যাইতে পারিবেন?

গঙ্গা। কোথায় যাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তাহা আমি আপনাকে বলিব না। আপনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। সাহস হয় কি?

গঙ্গা। আচ্ছা, তা না বল, আর দুই একটা কথা বল। তোমার নাম কি? তুমি কে? কি কর? আমাকেই বা কি করিতে হইবে?

স্ত্রীলোক। আমার নাম মুরলা, ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিব না। আপনি আসিতে সাহস না করেন, আসিবেন না। কিন্তু যদি এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানের হাত হইতে নগর রক্ষা করিবেন কি প্রকারে?

আমি স্ত্রীলোক যেখানে যাইতে পারি, আপনি নগররক্ষক হইয়া সেখানে এত কথা নহিলে যাইতে পারিবেন না ?

কাজেই গঙ্গারামকে মুরলার সঙ্গে যাইতে হইল। মুরলা আগে আগে চলিল, গঙ্গারাম পাছু পাছু। কিছু দূর গিয়া গঙ্গারাম দেখিলেন, সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা। চিনিয়া বলিলেন, "এ যে রাজবাড়ী যাইতেছ ?"

মুরলা। তাতে দোষ কি ?

গঙ্গারাম। সিং-দরজা দিয়া গেলে দোষ ছিল না। এ যে খিড়কী। অন্তঃপুরে যাইতে হইবে না কি ?

মুরলা। সাহস হয় না ?

গঙ্গা। না—আমার সে সাহস হয় না, এ আমার প্রভুর অন্তঃপুর ! বিনা হুকুমে যাইতে পারি না।

মুরলা। কার হুকুম চাই ?

গঙ্গা। রাজার হুকুম।

মুরলা। তিনি ত দেশে নাই। রাণীর হুকুম হইলে চলিবে ?

গঙ্গা। চলিবে।

মুরলা। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শুনাইব।

গঙ্গা। কিন্তু পাহারাওয়ালা তোমাকে যাইতে দিবে ?

মুরলা। দিবে।

গঙ্গা। কিন্তু আমাকে না চিনিলে ছাড়িয়া দিবে না। এ অবস্থায় পরিচয় দিবার আমার ইচ্ছা নাই।

মুরলা। পরিচয় দিবারও প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। মুরলা তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন পাঁড়ে ঠাকুর, দ্বার খোলা রাখিয়াছ ত ?"

পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, রাখিয়েসে। এ কোন্ ?"

প্রহরী গঙ্গারামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিল। মুরলা বলিল, "এ আমার ভাই।"

পাঁড়ে। মরদ্ যাতে পার্‌বে না। হুকুম নেহি।

মুরলা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ইঃ, কার হুকুম রে? তোর আবার কার হুকুম চাই? আমার হুকুম ছাড়া তুই কার হুকুম খুঁজিস্? খ্যাংরা মেরে দাড়ি মুড়িয়ে দেব জানিস্ না?"

প্রহরী জড়সড় হইল, আর কিছু বলিল না। মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। এবং অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোতালায় উঠিল। সে একটি কুঠারি দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইহার ভিতর প্রবেশ করুন। আমি নিকটেই রহিলাম, কিন্তু ভিতরে যাইব না।"

গঙ্গারাম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কুঠারির ভিতর প্রবেশ করিলেন। মহামূল্য দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত গৃহ, রজতপালঙ্কে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক—উজ্জ্বল দীপাবলির স্নিগ্ধ রশ্মি তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে, সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। আর কেহ নাই। গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম কখনও সীতারামের অন্তঃপুরে আসে নাই, নন্দা কি রমাকে কখনও দেখে নাই। কিন্তু মহামূল্য গৃহসজ্জা দেখিয়া বুঝিল যে, ইনি এক জন রাণী হইবেন; রাণীদিগের মধ্যে নন্দার অপেক্ষা রমারই সৌন্দর্য্যের খ্যাতিটা বেশী ছিল—এ জন্য গঙ্গারাম সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি কনিষ্ঠা মহিষী রমা। অতএব জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাণী কি আমাকে তলব করিয়াছেন?"

রমা উঠিয়া গঙ্গারামকে প্রণাম করিল। বলিল, "আপনি আমার দাদা হন—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইয়াছি, তাহাতে দোষ ধরিবেন না।"

গঙ্গা। আমাকে যখন আজ্ঞা করিবেন, তখনই আসিতে পারি—আপনিই কর্ত্রী—

রমা। মুরলা বলিল যে, প্রকাশ্যে আপনি আসিতে সাহস করিবেন না। সে আরও বলে—পোড়ারমুখী কত কি বলে, তা আমি কি বলব? তা, দাদা মহাশয়! আমি বড় ভীত হইয়াই এমন সাহসের কাজ করিয়াছি। তুমি আমায় রক্ষা কর।

বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না দেখিয়া গঙ্গারাম কাতর হইল। বলিল, "কি হইয়াছে? কি করিতে হইবে?"

রমা। কি হইয়াছে? কেন, তুমি কি জান না যে, মুসলমান মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে—আমাদের সব খুন করিয়া, সহর পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে?

গঙ্গা। কে তোমাকে ভয় দেখাইয়াছে? মুসলমান আসিয়া সহর পোড়াইয়া দিয়া যাইবে, তবে আমরা কি জন্য? আমরা তবে তোমার অন্ন খাই কেন?

রমা। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সাহস বড়—তোমরা অত বোঝ না। যদি তোমরা না রাখিতে পার, তখন কি হবে?

রমা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গঙ্গা। সাধ্যানুসারে আপনাদের রক্ষা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রমা। তা ত করবে—কিন্তু যদি না পারিলে?

গঙ্গা। না পারি, মরিব।

রমা। তা করিও না। আমার কথা শোন। আজ সকলে বড় রাণীকে বলিতেছিল, মুসলমানকে আদর করিয়া ডাকিয়া, সহর তাদের সুঁপিয়া দাও—আপনাদের সকলের প্রাণভিক্ষা মাগিয়া লও। বড় রাণী সে কথায় বড় কাণ দিলেন না—তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল নয়। আমি তাই তোমায় ডাকিয়াছি। তা কি হয় না?

গঙ্গা। আমাকে কি করিতে বলেন?

রমা। এই আমার গহনা পাতি আছে, সব নাও। আর আমার টাকা কড়ি যা আছে, সব না হয় দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মুসলমানের কাছে যাও। বল গিয়া যে, আমরা রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি, নগর তোমাদের ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকে প্রাণে মারিবে না, কেবল এইটি স্বীকার কর। যদি তাহারা রাজি হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও। সকলে বাঁচিয়া যাইবে।

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "মহারাণী! আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন বল্লেন—আর কখনও কাহারও সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না।

আমি প্রাণে মরিলেও এ কাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

রমার শেষ আশা ভরসা ফরসা হইল। রমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "তবে আমার বাছার দশা কি হইবে?" গঙ্গারাম ভীত হইয়া বলিল, "চুপ করুন! যদি আপনার কান্না শুনিয়া কেহ এখানে আসে, তবে আমাদের দুই জনেরই পক্ষে অমঙ্গল। আপনার ছেলের জন্যই আপনি এত ভীত হইয়াছেন, আমি সে বিষয়ে কোন উপায় করিব। আপনি স্থানান্তরে যাইতে রাজি আছেন?"

রমা। যদি আমায় বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিতে পার, তবে যাইতে পারি। তা বড় রাণীই বা যাইতে দিবেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বা যাইতে দিবেন কেন?

গঙ্গা। তবে লুকাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। যদি তেমন বিপদ্ দেখি, আমি আসিয়া আপনাদিগকে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিব।

রমা। আমি কি প্রকারে সংবাদ পাইব?

গঙ্গা। মুরলার দ্বারা সংবাদ লইবেন। কিন্তু মুরলা যেন অতি গোপনে আমার নিকট যায়।

রমা নিশ্বাস ছাড়িয়া, কাঁপিয়া বলিল, "তুমি আমার প্রাণ দান করিলে, আমি চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিব। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া রমা, গঙ্গারামকে বিদায় দিল। মুরলা গঙ্গারামকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

কাহারও মনে কিছু মলা নাই। তথাপি একটা গুরুতর দোষের কাজ হইয়া গেল। রমা ও গঙ্গারাম উভয়ে তাহা মনে বুঝিল। গঙ্গারাম ভাবিল, "আমার দোষ কি?" রমা বলিল, "এ না করিয়া কি করি—প্রাণ যায় যে।" কেবল মুরলা সন্তুষ্ট।

গঙ্গারামের যদি তেমন চক্ষু থাকিত, তবে গঙ্গারাম ইহার ভিতর আর এক জন লুকাইয়া আছে দেখিতে পাইতেন। সে মনুষ্য নহে—দেখিতেন—

* দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।

* * * চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥

এ দিকে বাদীর মনেও যা, বিধির মনেও তা। চন্দ্রচূড় ঠাকুর তোরাব্ খাঁর কাছে, এই বলিয়া গুপ্তচর পাঠাইলেন যে, "আমরা এ রাজ্য মায় কেল্লা সেলেখানা আপনাদিগকে বিক্রয় করিব—কত টাকা দিবেন ? যুদ্ধে কাজ কি—টাকা দিয়া নিন না ?"

চন্দ্রচূড় মৃণ্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ কথা জানাইলেন। মৃণ্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "কি ! এত বড় কথা ?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "দূর মূর্খ ! কিছু বুদ্ধি নাই কি ? দরদস্তুর করিতে করিতে এখন দুই মাস কাটাইতে পারিব। তত দিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন।"

গঙ্গারামের মনে কি হইল, বলিতে পারি না। সে কিছুই বলিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তা, সে দিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর ! কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল ? তা হ'লে মানুষ রাত্রিদিন বাতির আলো জালিয়া বসিয়া থাকে না কেন ? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা ! কি ফলান রঙ্ ! কি ভুরু ! কি চোখ ! কি ঠোঁট—যেমন রাঙা, তেমনই পাতলা ! কি গড়ন ! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে ? সবই যেন দেবীদুর্ল্লভ ! গঙ্গারাম ভাবিল, "মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জান্‌তেম না ! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব।"

তা কি পারা যায় রে মূর্খ ! একবার দেখিয়া, অমন হইলে, আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। দুপর বেলা গঙ্গারাম ভাবিতেছিল, "একবার যে দেখিয়াছি, আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচি, সেই কয় বৎসর সুখে কাটাইতে পারিব।"—কিন্তু সন্ধ্যা বেলা ভাবিল, "আর একবার কি দেখিতে পাই না ?" রাত্রি দুই চারি দণ্ডের সময়ে গঙ্গারাম ভাবিল, "আজ আবার মুরলা আসে না !" রাত্রি প্রহরেকের সময়ে মুরলা তাঁহাকে নিভৃত স্থানে গিরেফ্‌তার করিল।

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর ?"

মুরলা। তোমার খবর কি ?

গঙ্গা। কিসের খবর চাও ?

মুরলা। বাপের বাড়ী যাওয়ার।

গঙ্গা। আবশ্যক হইবে না বোধ হয়। রাজ্য রক্ষা হইবে

মুরলা। কিসে জানিলে ?

গঙ্গা। তা কি তোমায় বলা যায় ?

মুরলা। তবে আমি এই কথা বলি গে ?

গঙ্গা। বল গে।

মুরলা। যদি আমাকে আবার পাঠান ?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরিয়াছিলে, সেইখানে আমাকে পাইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া, রাজ্ঞীসমীপে সংবাদ নিবেদন করিল। গঙ্গারাম কিছুই খুলিয়া বলেন নাই, সুতরাং রমাও কিছু বুঝিতে পারিল না। না বুঝিতে পারিয়া আবার ব্যস্ত হইল। আবার মুরলা গঙ্গারামকে ধরিয়া লইয়া তৃতীয় প্রহর রাত্রে রমার ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই পাহারাওয়ালা সেইখানে ছিল, আবার গঙ্গারাম মুরলার ভাই বলিয়া পার হইলেন।

গঙ্গারাম রমার কাছে আসিয়া মাথা মুণ্ড কি বলিল, তাহা গঙ্গারাম নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না, রমা ত নয়ই। আসল কথা, গঙ্গারামের মাথা মুণ্ড তখন কিছুই ছিল না, সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুর ফুলের বাণ মারিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কেবল তাহার চক্ষু দুইটি ছিল, প্রাণপাত করিয়া গঙ্গারাম দেখিয়া লইল, কাণ ভরিয়া কথা শুনিয়া লইল, কিন্তু তৃপ্তি হইল না।

গঙ্গারামের এতটুকু মাত্র চৈতন্য ছিল যে, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কল কৌশল রমার সাক্ষাতে কিছুই সে প্রকাশ করিল না। বস্তুতঃ কোন কথা প্রকাশ করিতে সে আসে নাই, কেবল দেখিতে আসিয়াছিল। তাই দেখিয়া, দক্ষিণাস্বরূপ আপনার চিত্ত রমাকে দিয়া চলিয়া গেল। আবার মুরলা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া আসিল। গমনকালে মুরলা গঙ্গারামকে বলিল, "আবার আসিবে ?"

গঙ্গা। কেন আসিব ?

মুরলা বলিল, "আসিবে বোধ হইতেছে।"

গঙ্গারাম চোখ বুজিয়া পিছল পথে পা দিয়াছে—কিছু বলিল না।

এ দিকে চন্দ্রচূড়ের কথায় তোরাব্ খাঁ উত্তর পাঠাইলেন, "যদি অল্প স্বল্প টাকা দিলে মুলুক ছাড়িয়া দাও, তবে টাকা দিতে রাজি আছি। কিন্তু সীতারামকে ধরিয়া দিতে হইবে।"

চন্দ্রচূড় উত্তর পাঠাইলেন, "সীতারামকে ধরাইয়া দিব, কিন্তু অল্প টাকায় হইবে না।"

তোরাব্ খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন, "কত টাকা চাও?" চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন; তোরাব্ খাঁ একটা নরম দর দিয়া পাঠাইলেন। তার পর চন্দ্রচূড় কিছু নামিলেন, তোরাব্ খাঁ তদুত্তরে কিছু উঠিলেন। চন্দ্রচূড় এইরূপে মুসলমানকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালামুখী মুরলা যা বলিল, তাই হইল। গঙ্গারাম আবার রমার কাছে গেল। তার কারণ, গঙ্গারাম না গিয়া আর থাকিতে পারিবে না। রমা আর ডাকে নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে মুরলাকে গঙ্গারামের কাছে সংবাদ লইতে পাঠাইত; কিন্তু গঙ্গারাম মুরলার কাছে কোন কথাই বলিত না, বলিত, "তোমাদের বিশ্বাস করিয়া এ সকল গোপন কথা কি বলা যায়? আমি একদিন নিজে গিয়া বলিয়া আসিব।" কাজেই রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল—মুসলমান কবে আসিবে, সে বিষয়ে খবর না জানিলে রমার প্রাণ বাঁচে না—যদি হঠাৎ একদিন দুপর বেলা খাওয়া দাওয়ার সময় আসিয়া পড়ে?

কাজেই গঙ্গারাম আবার আসিল। এবার গঙ্গারাম সাহস দিল না—বরং একটু ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে, তার পথ করিয়া গেল। রমাকে আপনার প্রাণের কথা বলে, গঙ্গারামের সে সাহস হয় না—সরলা রমা তার মনের সে কথা অণুমাত্র বুঝিতে পারে না। তা, প্রেমসম্ভাষণের ভরসায় গঙ্গারামের যাতায়াতের চেষ্টা নয়। গঙ্গারাম জানিত, সে পথ বন্ধ। তবু শুধু দেখিয়া, কেবল কথাবার্ত্তা কহিয়াই এত আনন্দ!

একে ভালবাসা বলে না—তাহা হইলে গঙ্গারাম কখন রমাকে ভয় দেখাইয়া, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা বাড়ে, তাহা করিয়া যাইতে পারিত না। এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি—যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে। এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে।

ভয় দেখাইয়া, গঙ্গারাম চলিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম, আজ কালি নহে বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই আজ কাল বাদে রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল। আবার গঙ্গারাম আসিল। এই রকম চলিল।

একেবারে "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" চলে না। রমার সঙ্গে লোকালয়ে যদি গঙ্গারামের পঞ্চাশ বার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কিছুই দোষ হইত না; কেন না, রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র। কিন্তু এমন ভয়ে ভয়ে, অতি গোপনে, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎটা ভাল নহে। আর কিছু হউক না হউক, একটু বেশী আদর, একটু বেশী খোলা কথা, কথাবার্ত্তায় একটু অসাবধানতা, একটু বেশী মনের মিল হইয়া পড়ে। তাহা হইল না যে এমন নহে। রমা তাহা আগে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মুরলার একটা কথা দৈববাণীর মত তাহার কাণে লাগিল। একদিন মুরলার সঙ্গে পাঁড়ে ঠাকুরের সে বিষয়ে কিছু কথা হইল। পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, "তোমারা ভাই, হামেশা রাত্‌কো ভিতরমে যায়া আয়া করতাহৈ কাহেকো?"

মু। তোর কিরে বিট্‌লে? খ্যাংরার ভয় নেই?

পাঁড়ে। ভয় ত হৈ, লেকেন্ জান্‌কাভী ডর হৈ।

মু। তোর আবার আরও জান্ আছে না কি? আমিই ত তোর জান্!

পাঁড়ে। তোম্ ছাড়্‌নেসে মরেঙ্গে নেহি, লেকেন্ জান্ ছোড়্‌নেসে সব আঁধিয়ারা লাগেগী। তোমারা ভাইকো হম্ ঔর্ ছোড়েঙ্গে নেহি।

মু। তা না ছোড়িস্ আমি তোকে ছোড়ঙ্গে। কেমন কি বলিস্?

পাঁড়ে। দেখো, বহ আদমি তোমারা ভাই নেহি, কোই বড়ে আদমী হোগা, বস্কা হিঁয়া কিয়া কাম্ হাম্‌কো কুছু মালুম নেহি, মালুম হোনেভি কুছ্ জরুর নেহি। কিয়া জানে, বহ অন্দরকা খবরদারিকে লিয়ে আতা যাতা হৈ। তৌ ভী, যব্ গুপিদা হোকে আতে যাতে তব্ হম্ লোগ্‌কো কুছ মিল্‌না

চাহিয়ে। তোম্‌কো কুছ মিলা হোগা—আধা হাম্‌কো দে দেও, হম্ নেহি কুছ বোলেঙ্গে।

মু। সে আমায় কিছু দেয় নাই। পাইলে দিব।

পাঁড়ে। আদা কবুকে লে লেও।

মুরলা ভাবিল, এ সৎপরামর্শ। রাণীর কাছে গহনাখানা কাপড়খানা মুরলার পাওয়া হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গারামের কাছে কিছু হয় নাই। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া পাঁড়েজীকে বলিল, "আচ্ছা, এবার যে দিন আসিবে, তুমি ছাড়িও না। আমি বলিলেও ছাড়িও না। তা হলে কিছু আদায় হইবে।"

তার পর যে রাত্রিতে গঙ্গারাম পুরপ্রবেশার্থ আসিল, পাঁড়েজী ছাড়িলেন না। মুরলা অনেক বকিল ঝকিল, শেষ অনুনয় বিনয় করিল, কিছুতেই না। গঙ্গারাম পরামর্শ করিলেন, পাঁড়ের কাছে প্রকাশ হইবেন, নগররক্ষক জানিতে পারিলে, পাঁড়ে আর আপত্তি করিবে না। মুরলা বলিল, "আপত্তি করিবে না, কিন্তু লোকের কাছে গল্প করিবে। এ আমার ভাই যায় আসে, গল্প করিলে যা দোষ, আমার ঘাড়ের উপর দিয়া যাইবে।" কথা যথার্থ বলিয়া গঙ্গারাম স্বীকার করিলেন। তার পর গঙ্গারাম মনে করিলেন, "এটাকে এইখানে মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যাই।" কিন্তু তাতে আরও গোল। হয় ত একেবারে এ পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নিরস্ত হইলেন। পাঁড়ে কিছুতেই ছাড়িল না, সুতরাং সে রাত্রিতে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইল।

মুরলা একা ফিরিয়া আসিলে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি আজ আসিবেন না?"

মু। তিনি আসিয়াছিলেন—পাহারাওয়ালা ছাড়িল না।

রাণী। রোজ ছাড়ে, আজ ছাড়িল না কেন?

মু। তার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে।

রাণী। কি সন্দেহ?

মু। আপনার শুনিয়া কাজ কি? সে সকল আপনার সাক্ষাতে আমরা মুখে আনিতে পারি না, তাহাকে কিছু দিয়া বশীভূত করিলে ভাল হয়।

যে অপবিত্র, সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিয়া কাজ করে, বুঝিতে পারে না যে, পবিত্র মানুষ আছে, সুতরাং তাহার কার্য্য ধ্বংস হয়। মুরলার কথা শুনিয়া রমার গা দিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল। রমা ঘামিয়া,

কাঁপিয়া, বসিয়া পাড়ল। বসিয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া চক্ষু বুজিয়া অজ্ঞান হইল। এমন কথা, রমার মনে এক দিনও হয় নাই। আর কেহ হইলে মনে আসিত, কিন্তু রমা এমনই ভয়বিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল যে, সে দিক্‌টা একেবারে নজর করিয়া দেখে নাই। এখন বজ্রাঘাতের মত কথাটা বুকের উপর পড়িল। দেখিল, ভিতরে যাই থাক, বাহিরে কথাটা ঠিক। মনে ভাবিয়া দেখিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। রমার স্থূল বুদ্ধি, তবু স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ হিন্দুর মেয়ের একটা বুদ্ধি আছে, যাহা একবার উদয় হইলে এ সকল কথা বড় পরিষ্কার হইয়া থাকে। যত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, রমা মনে করিয়া দেখিল—বুঝিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। তখন রমা মনে ভাবিল, বিষ খাইব, কি গলায় ছুরি দিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, গলায় ছুরি দেওয়াই উচিত, তাহা হইলে সব পাপ চুকিয়া যায়, মুসলমানের ভয়ও ঘুচিয়া যায়, কিন্তু ছেলের কি হইবে? রমা শেষ স্থির করিল, রাজা আসিলে গলায় ছুরি দেওয়া যাইবে, তিনি আসিয়া ছেলের বন্দোবস্ত যা হয় করিবেন—তত দিন মুসলমানের হাতে যদি বাঁচি। মুসলমানের হাতে ত বাঁচিব না নিশ্চিত, তবু গঙ্গারামকে আর ডাকিব না, কি লোক পাঠাইব না। তা রমা আর গঙ্গারামের কাছে লোক পাঠাইল না, কি মুরলাকে যাইতে দিল না।

মুরলা আর আসে না, রমা আর ডাকে না, গঙ্গারাম অস্থির হইল। আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। গঙ্গারাম মুরলার সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু মুরলা রাজবাটীর পরিচারিকা—রাস্তা ঘাটে সচরাচর বাহির হয় না, কেবল মহিষীর হুকুমে গঙ্গারামের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। গঙ্গারাম মুরলার কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষ নিজে এক দূতী খাড়া করিয়া মুরলার কাছে পাঠাইলেন—তাকে ডাকিতে। রমার কাছে পাঠাইতে সাহস হয় না।

মুরলা আসিল—জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিয়াছ কেন?"

গঙ্গারাম। আর খবর নাও না কেন?

মুরলা। জিজ্ঞাসা করিলে খবর দাও কই? আমাদের ত তোমার বিশ্বাস হয় না।

গঙ্গা। তা ভাল, আমি গিয়াও না হয় বলিয়া আসিতে পারি।

মুরলা। তাতে, যে ফল নৈবিদ্যিতে দেয় তার আটটি।

গঙ্গা। সে আবার কি ?

মুরলা। ছোট রাণী আরাম হইয়াছেন।

গঙ্গা। কি হইয়াছিল যে আরাম হইয়াছেন ?

মুরলা। তুমি আর জান না কি হইয়াছিল ?

গঙ্গা। না।

মুরলা। দেখ নাই, বাতিকের ব্যামো ?

গঙ্গা। সে কি ?

মুরলা। নহিলে তুমি অন্দর মহলে ঢুকিতে পাও ?

গঙ্গা। কেন, আমি কি ?

মুরলা। তুমি কি সেখানকার যোগ্য ?

গঙ্গা। আমি তবে কোথাকার যোগ্য ?

মুরলা। এই ছেঁড়া আঁচলের। বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে হয় ত আমাকে লইয়া চল। অনেক দিন বাপ মা দেখি নাই।

এই বলিয়া মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। গঙ্গারাম বুঝিলেন, এ দিকে কোন ভরসা নাই। ভরসা নাই, এ কথা কি কখনও মন বুঝে ? যতক্ষণ পাপ করিবার শক্তি থাকে, ততক্ষণ যার মন পাপে রত হইয়াছে, তার ভরসা থাকে। পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, তবু আমি রমাকে ছাড়িব না। এই সঙ্কল্প করিয়া কৃতঘ্ন গঙ্গারাম, ভীষণমূর্ত্তি হইয়া আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেই রাত্রিতে ভাবিয়া ভাবিয়া গঙ্গারাম, রমা ও সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক দিন পরে, শ্রী ও জয়ন্তী বিরূপাতীরে, ললিতগিরির উপত্যকায় আসিয়াছে। মহাপুরুষ আসিতে বলিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। তাই দুই জনে আসিয়া উপস্থিত।

মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী একা হস্তিগুম্ফামধ্যে প্রবেশ করিল,—শ্রী ততক্ষণে বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। পরে, শিখরদেশে আরোহণ করিয়া, চন্দনবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া,

নিম্নে ভূতলস্থ নদীতীরের এক তালবনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল।

মহাপুরুষ কি আদেশ করিলেন, জয়ন্তীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া, শ্রী বলিল, "কি মিষ্ট পাখীর শব্দ! কাণ ভরিয়া গেল!"

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। এই নদীর তর তর গদ গদ শব্দের তুল্য।

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। অনেক দিন স্বামীর কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।

হায়! সীতারাম!

জয়ন্তী তাহা জানিত, মনে করাইবার জন্য সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। জয়ন্তী বলিল, "এখন শুনিলে আর তেমন ভাল লাগিবে না কি?"

শ্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া, জয়ন্তীর পানে চাহিয়া, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ঠাকুর কি আমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?"

জয়ন্তী। তোমাকে ত যাইতেই হইবে—আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে।

শ্রী। এখন আর আমার তাহাতে শুভাশুভ, সুখ দুঃখ কি ভগিনি?

জয়ন্তী। বুঝিতে পারিলে না কি শ্রী? তোমায় আজিও কি এত বুঝাইতে হইবে?

শ্রী। না—বুঝি নাই।

জয়ন্তী। তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হইলে, ঠাকুর তোমাকে কোন আদেশ করিতেন না—আপনার স্বার্থ খুঁজিতে তিনি কাহাকেও আদেশ করেন না। ইহাতে তোমার শুভাশুভ কিছুই নাই।

শ্রী। বুঝিয়াছি—আমি এখন গেলে আমার স্বামীর শুভ হইবার সম্ভাবনা?

জয়ন্তী। তিনি কিছুই স্পষ্ট বলেন না—অত ভাঙ্গিয়াও বলেন না, আমাদিগের সঙ্গে বেশী কথা কহিতে চাহেন না। তবে তাঁহার কথার

এইমাত্র তাৎপর্য্য হইতে পারে, ইহা আমি বুঝি। আর তুমিও আমার কাছে এত দিন যাহা শুনিলে শিখিলে, তাহাতে তুমিও বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ।

শ্রী। তুমি যাইবে কেন?

জয়ন্তী। তাহা আমাকে কিছুই বলেন নাই। তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আমি যাইব। না যাইব কেন? তুমি যাইবে?

শ্রী। তাই ভাবিতেছি।

জয়ন্তী। ভাবিতেছ কেন? সেই প্রিয়প্রাণহন্ত্রী কথাটা মনে পড়িয়াছে বলিয়া কি?

শ্রী। না। এখন আর তাহাতে ভীত নই।

জয়ন্তী। কেন ভীত নও, আমাকে বুঝাও। তা বুঝিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া আমি স্থির করিব।

শ্রী। কে কাকে মারে বহিন্? মারিবার কর্ত্তা একজন—যে মরিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না, ইহা বলাই বাহুল্য; তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি যদি ঠিক করিয়া থাকেন যে, আমারই হাতে তাঁহার সংসারযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে? আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্রপারেই যাই, তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে। আপনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব—তাহাতে তাঁহার বিপদ্ ঘটে, আমার তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।

হো হো সীতারাম! কাহার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ!

জয়ন্তী মনে মনে বড় খুসী হইল। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে ভাবিতেছ কেন?"

শ্রী। ভাবিতেছি, গেলে যদি তিনি আর না ছাড়িয়া দেন?

জয়ন্তী। যদি কোষ্ঠীর ভয় আর নাই, তবে ছাড়িয়া নাই দিলেন? তুমিই আসিবে কেন?

শ্রী। আমি কি আর রাজার বামে বসিবার যোগ্য?

জয়ন্তী। এক হাজার বার। যখন তোমাকে সুবর্ণরেখার ধারে, কি বৈতরণীতীরে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা তোমার রূপ কত গুণে বাড়িয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জান না।

শ্রী। ছি!

জয়ন্তী। গুণ কত গুণে বাড়িয়াছে, তাও কি জান না? কোন্ রাজমহিষী গুণে তোমার তুল্যা?

শ্রী। আমার কথা বুঝিলে কই? কই, তোমার আমার মনের মধ্যে বাঁধা রাস্তা বাঁধিয়াছ কই? আমি কি তাহা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম যে, যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন কি? না তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া সুখী হইবে? রাজরাণীগিরি চাকরি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।

জয়ন্তী। আমার শিষ্যার আবার সুখ দুঃখ কি? (পরে সহাস্যে) ধিক্ এমন শিষ্যায়!

শ্রী। আমার সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার আছে। যখন দেখিবেন, তাঁহার শ্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ লইয়া একজন সন্ন্যাসিনী প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে, তখন কি তাঁর দুঃখ হইবে না?

জয়ন্তী। হইতে পারে, না হইতে পারে। সে সকল কথার বিচারে কোন প্রয়োজন নাই। যে অনন্তসুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মন স্থির করিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহার চিত্তে যেন স্থান না পায়—তাহা হইলে সকল দিকেই ঠিক কাজ হইবে; এক্ষণে চল, তোমার স্বামীর হউক, কি যাহারই হউক, যখন শুভ সাধন করিতে হইবে, তখন এখনই যাত্রা করি।

যতক্ষণ এই কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ জয়ন্তীর হাতে দুইটা ত্রিশূল ছিল। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "ত্রিশূল কেন?"

"মহাপুরুষ আমাদিগকে ভৈরবীবেশে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। এই দুইটি ত্রিশূল দিয়াছেন। বোধ হয়, ত্রিশূল মন্ত্রপূত।" *

---

* আধুনিক ভাষায় "magnetized."

তখন দুই জনে ভৈরবীবেশ গ্রহণ করিল এবং উভয়ে পর্ব্বত অবরোহণ করিয়া, বিল্বপাতীরবর্ত্তী পথে গঙ্গাভিমুখে চলিল। পথপার্শ্ববর্ত্তী বন হইতে বন্য পুষ্প চয়ন করিয়া উভয়ে তাহার দল কেশর রেণু প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এবং পুষ্পনির্ম্মাতার অনন্ত কৌশলের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। সীতারামের নাম আর কেহ একবারও মুখে আনিল না। এ পোড়ারমুখীদিগকে জগদীশ্বর কেন রূপ যৌবন দিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর যে গণ্ডমূর্খ সীতারাম, শ্রী! শ্রী! করিয়া পাতি পাতি করিল, সেই বলিতে পারে। পাঠক বোধহয়, দুইটাকেই ডাকিনী-শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিবেন। তাহাতে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ মত আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বন্দেআলি নামে ভূষণার এক জন ছোট মুসলমান, এক জন বড় মুসলমানের কবিলাকে বাহির করিয়া তাহাকে নেকা করিয়াছিল। খসম গিয়া বলপূর্ব্বক অপহৃতা সীতার উদ্ধারের উদ্যোগী হইল; দোস্ত বিবি লইয়া মহম্মদপুর পলায়ন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। গঙ্গারামের নিকট সে পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিল। তাঁহার অনুগ্রহে সে সীতারামের নাগরিক সৈন্য মধ্যে সিপাহী হইল। গঙ্গারাম তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। তিনি এক্ষণে গোপনে তাহাকে তোরাব্ খাঁর নিকট পাঠাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, "চন্দ্রচূড় ঠাকুর বঞ্চক। চন্দ্রচূড় যে বলিতেছেন যে, টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হস্তে দিব, সে কেবল প্রবঞ্চনাবাক্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা কাল হরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাঁহার হাতে নয়। তিনি মনে করিলেও নগর ফৌজদারকে দিতে পারেন না। নগর আমার হাতে। আমি না দিলে নগর কেহ পাইবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা আমি ফৌজদার সাহেবের সহিত স্বয়ং কহিতে ইচ্ছা করি—নহিলে হইবে না। কিন্তু আমি ত ফেরারী আসামী—প্রাণভয়ে যাইতে সাহস করি না। ফৌজদার সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

গঙ্গারামের সৌভাগ্যক্রমে বন্দেআলির ভগিনী এক্ষণে তোরাব্ খাঁর এক জন মতাহিয়া বেগম। সুতরাং ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ বন্দেআলির পক্ষে কঠিন হইল না। কথাবার্ত্তা ঠিক হইল। গঙ্গারাম অভয় পাইলেন।

তোরাব্ স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন, "তোমার সকল কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে।"

বন্দেআলি ভূষণা হইতে ফিরিল। যে নৌকায় সে পার হইল, সেই নৌকায় চাঁদ শাহা ফকির—সেও পার হইতেছিল। ফকির বন্দেআলির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "কোথায় গিয়াছিলে?" জিজ্ঞাসা করায় বন্দেআলি বলিল, "ভূষণায় গিয়াছিলাম।" ফকির ভূষণার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বন্দেআলি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু উঁচু মেজাজে ছিল। ভূষণার খবর বলিতে একেবারে কোতোয়াল, বখশী, মুনশী, কারকুন, পেস্কার, লাগায়েৎ খোদ ফৌজদারের খবর বলিয়া ফেলিল। ফকির বিস্মিত হইল। ফকির সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে মনে মনে স্থির করিল, "আমাকে একটু সন্ধানে থাকিতে হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম ফৌজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। ফৌজদার তাঁহাকে কোন প্রকার ভয় দেখাইল না। কাজের কথা সব ঠিক হইল। ফৌজদারের সৈন্য মহম্মদপুরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ফৌজদার বলিলেন, "দুর্গদ্বারে পৌছিলে ত তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে। এখন মৃণ্ময়ের তাঁবে অনেক সিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ পারের সময়ে, তাহারা যুদ্ধ করিবে, ইহাই সম্ভব। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে। যদি যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, তবে তোমার সাহায্য ব্যতীতও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারি। যদি পরাজয় হয়, তবে তোমার সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে না। তার কি পরামর্শ করিয়াছ?"

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুই পথ আছে। এক উত্তর পথ, এক দক্ষিণ পথ। দক্ষিণ পথে, দূরে নদী পার হইতে হয়—উত্তর পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে দক্ষিণ পথে সেনা লইয়া যাইবেন। মৃণ্ময় তাহা বিশ্বাস করিবে; কেন না, কিল্লার সম্মুখে নদীপার কঠিন বা অসম্ভব। অতএব সেও সৈন্য লইয়া দক্ষিণ পথে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে। আপনি সেই সময়ে উত্তর পথে সৈন্য লইয়া কিল্লার সম্মুখে নদী পার হইবেন। তখন দুর্গে সৈন্য থাকিবে না বা অল্পই থাকিবে। অতএব আপনি অনায়াসে নদী পার হইয়া খোলা পথে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ফৌজদার। কিন্তু যদি মৃণ্ময় দক্ষিণ পথে যাইতে যাইতে শুনিতে পায় যে, আমরা উত্তর পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছি, তবে সে পথ হইতে ফিরিতে পারে।

গঙ্গারাম। আপনি অর্দ্ধেক সৈন্য দক্ষিণ পথে, অর্দ্ধেক সৈন্য উত্তর পথে পাঠাইবেন। উত্তর পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, পূর্ব্বে যেন কেহ তাহা না জানিতে পারে। ঐ সৈন্য রাত্রিতে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছু দূরে বনজঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তার পর মৃণ্ময় ফৌজ লইয়া কিছু দূর গেলে পর নদী পার হইলেই নির্ব্বিঘ্ন হইবেন। মৃণ্ময়ের সৈন্যও উত্তর দক্ষিণ দুই পথের সৈন্যের মাঝখানে পড়িয়া নষ্ট হইবে।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন, "উত্তম। তুমি আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে। কোন পুরস্কারের লোভেতেই এরূপ করিতেছ সন্দেহ নাই। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত?"

গঙ্গারাম অভীষ্ট পুরস্কার চাহিলেন—বলা বাহুল্য, সে পুরস্কার রমা।

সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল। এবং সেই রাত্রিতেই মহম্মদপুর ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গারাম জানিত না, যে চাঁদশাহ ফকির তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর গুপ্তচর আসিয়া চন্দ্রচূড়কে সংবাদ দিল যে, ফৌজদারী সৈন্য দক্ষিণ পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।

চন্দ্রচূড় তখন মৃণ্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকাইয়া, পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ এই স্থির হইল যে, মৃণ্ময় সৈন্য লইয়া সেই রাত্রিতে দক্ষিণ পথে যাত্রা করিবেন—যাহাতে যবনসেনা নদী পার হইতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন।

এদিকে রণসজ্জার ধূম পড়িয়া গেল। মৃণ্ময় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সৈন্য লইয়া রাত্রিতেই দক্ষিণ পথে যাত্রা করিলেন। গড় রক্ষার্থ অল্প মাত্র সিপাহী রাখিয়া গেলেন। তাহারা গঙ্গারামের আজ্ঞাধীনে রহিল।

এই সকল গোলমালের সময়ে পাঠকের কি গরিব রমাকে মনে পড়ে? সকলের কাছে মুসলমানের সৈন্যাগমনবার্ত্তা যেমন পৌছিল, রমার কাছেও সেইরূপ পৌছিল। মুরলা বলিল, "মহারাণী, এখন বাপের বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ কর।"

রমা বলিল, "মরিতে হয় এইখানেই মরিব। কলঙ্কের পথে যাইব না। কিন্তু তুমি একবার গঙ্গারামের কাছে যাও। আমি মরি, এইখানেই মরিব, কিন্তু আমার ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন, তাহা স্মরণ করিয়া দিও। সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন। আমার সঙ্গে কিছুতেই আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাও বলিও।"

রমা মনস্থির করিবার জন্য নন্দার কাঁছে গিয়া বসিয়া রহিল। পুরীমধ্যে কেহই সে রাত্রিতে ঘুমাইল না।

মুরলা আজ্ঞা পাইয়া গঙ্গারামের কাছে চলিল। গঙ্গারাম নিশীথকালে গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। রত্ন আশায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে তিনি প্রবৃত্ত—সাঁতার দিয়া আবার কূল পাইবেন কি? গঙ্গারাম সাহসে ভর করিয়াও এ কথার কিছু মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারে, তাহার শেষ ভরসা জগদীশ্বর। সে বলে, "জগদীশ্বর যা করেন।" কিন্তু গঙ্গারাম তাহাও বলিতে পারিতেছিলেন না—যে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত,

সে জানে যে, জগদীশ্বর তার বিরুদ্ধ—জগতের বন্ধু তাহার শত্রু। অতএব গঙ্গারাম বড় বিষণ্ণ হইয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন।

এমন সময়ে মুরলা আসিয়া দেখা দিল। রমার প্রেরিত সংবাদ তাঁহাকে বলিল।

গঙ্গারাম বলিল, 'বলেন ত এখন গিয়া ছেলে নিয়া আসি।"

মুরলা। তাহা হইবে না। যখন মুসলমান পুরীতে প্রবেশ করিবে, আপনি তখন গিয়া রক্ষা করিবেন, ইহাই রাণীর অভিপ্রায়।

গঙ্গা। তখন কি হইবে, কে বলিতে পারে? যদি রক্ষার অভিপ্রায় থাকে, তবে এই বেলা বালকটিকে আমাকে দিন।

মুরলা। আমি তাহাকে লইয়া আসিব?

গঙ্গা। না। আমার অনেক কথা আছে।

মুরলা। আচ্ছা—পৌষ মাসে।

এই বলিয়া, মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারামের গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে উঠিতে না উঠিতে মুরলার সে হাসি হঠাৎ নিবিয়া গেল—ভয়ে মুখ কালি হইয়া উঠিল। দেখিল, সম্মুখে রাজপথে, প্রভাতশুক্র-তারাবৎ সমুজ্জ্বলা ত্রিশূলধারিণী যুগল-ভৈরবীমূর্ত্তি! মুরলা তাহাদিগকে শঙ্করীর অনুচারিণী ভাবিয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া, যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

এক জন ভৈরবী বলিল, "তুই কে?"

মুরলা কাতরস্বরে বলিল, "আমি মুরলা।"

ভৈরবী। মুরলা কে?

মুরলা। আমি ছোট রাণীর দাসী।

ভৈরবী। নগরপালের ঘরে এত রাত্রিতে কি করিতে আসিয়াছিলি?

মুরলা। মহারাণী পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। সম্মুখে এই দেবমন্দির দেখিতেছিস্?

মুরলা। আজ্ঞা হাঁ।

ভৈরবী। আমাদের সঙ্গে উহার উপরে আয়।

মুরলা। যে আজ্ঞা।

তখন দুই জনে, মুরলাকে দুই ত্রিশূলাগ্রমধ্যবর্ত্তিনী করিয়া মন্দিরমধ্যে লইয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সে রাত্রিতে নিদ্রা নাই। কিন্তু সমস্ত রাত্রি নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, নগর রক্ষার কোন উদ্যোগই নাই। গঙ্গারামকে সে কথা বলায়, গঙ্গারাম তাঁহাকে কড়া কড়া বলিয়া হাঁকাইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি অতিশয় অনুতপ্তচিত্তে কুশাসনে বসিয়া সর্ব্বরক্ষাকর্ত্তা বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে চাঁদশাহ ফকির আসিয়া গঙ্গারামের ভূষণাগমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল। শুনিয়া চন্দ্রচূড় শিহরিয়া উঠিলেন। একবার মনে করিতেছিলেন যে, জনকত সিপাহী লইয়া গঙ্গারামকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া, নগর রক্ষার ভার অন্য লোককে দিবেন, কিন্তু ইহাও ভাবিলেন যে, সিপাহীরা তাঁহার বাধ্য নহে, গঙ্গারামের বাধ্য। অতএব সে সকল উদ্যম সফল হইবে না। মৃণ্ময় থাকিলে কোন গোল উপস্থিত হইত না, সিপাহীরা মৃণ্ময়ের আজ্ঞাকারী। মৃণ্ময়কে বাহিরে পাঠাইয়া তিনি এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি এত অনুতাপপীড়িত হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ কেবল অসুরনিসূদন হরির চিন্তা করিতেছিলেন। তখন সহসা সম্মুখে প্রফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীকে দেখিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কে?"

ভৈরবী বলিল, "বাবা! শত্রু নিকটে, এ পুরীর রক্ষার কোন উদ্যোগ নাই কেন? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

মুরলার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল ও চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে,

প্রশ্ন শুনিয়া চন্দ্রচূড় আরও বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি এই নগরের রাজলক্ষ্মী?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, আমার কথার উত্তর দাও। নহিলে মঙ্গল হইবে না।

চন্দ্র। মা! আমার সাধ্য আর কিছু নাই। রাজা নগররক্ষকের উপর নগর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, নগররক্ষক নগর রক্ষা করিতেছে না। সৈন্য আমার বশ নহে। আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন।

জয়ন্তী। নগররক্ষকের সংবাদ আপনি কিছু জানেন? কোন প্রকার অবিশ্বাসিতা শুনেন নাই?

চন্দ্র। শুনিয়াছি। তিনি তোরাব্ খাঁর নিকট গিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহাকে নগর সমর্পণ করিবেন। আমার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমি তাহার কোন উপায় করি নাই। মা! বোধ করিতেছি, আপনি এই নগরীর রাজলক্ষ্মী। দয়া করিয়া এ দাসকে ভৈরবীবেশে দর্শন দিয়াছেন। মা! আপনি অপরিম্লানতেজস্বিনী হইয়া আপনার এই পুরী রক্ষা করুন।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন।

"তবে, আমিই এই পুরী রক্ষা করিব।" এই বলিয়া জয়ন্তী প্রস্থান করিল। চন্দ্রচূড়ের মনে ভরসা হইল।

জয়ন্তীরও আশার অতিরিক্ত ফললাভ হইয়াছিল। শ্রী বাহিরে ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহাভিমুখে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুরলা চলিয়া গেলে গঙ্গারাম চারি দিকে আরও অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যাহার জন্য তিনি এই বিপদ্‌সাগরে ঝাঁপ দিতেছেন, সে ত তাঁহার অনুরাগিণী নয়। তিনি চক্ষু বুজিয়া সমুদ্রমধ্যে ঝাঁপ দিতেছেন, সমুদ্রতলে রত্ন মিলিবে কি? না, ডুবিয়া মরাই সার হইবে? আঁধার! চারি দিকে আঁধার! এখন কে তাঁকে উদ্ধার করিবে?

সহসা গঙ্গারামের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। দেখিলেন, দ্বারদেশে প্রভাতনক্ষত্রোজ্জ্বলরূপিণী ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীমূর্ত্তি। অঙ্গপ্রভায় গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি ম্লান হইয়া গেল। সাক্ষাৎ ভবানী ভূতলে অবতীর্ণা মনে করিয়া, গঙ্গারামও মুরলার ন্যায় প্রণত হইয়া যোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মা, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি।"

ভৈরবীর কথা শুনিয়া, গঙ্গারাম বলিল, "মা! আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। আমাকে এক গাড়ী গোলা বারুদ দাও। আর একজন ভাল গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারাম ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—কে এ? জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আপনি গোলা বারুদ লইয়া কি করিবেন?"

জয়ন্তী। দেবতার কাজ।

গঙ্গারামের মনে বড় সন্দেহ হইল। এ যদি কোন দেবী হইবে, তবে গোলা গুলি ইহার প্রয়োজন হইবে কেন? যদি মানুষী হয়, তবে ইহাকে গোলা গুলি দিব কেন? কাহার চর তা কি জানি? এই ভাবিয়া গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "মা! তুমি কে?"

জয়ন্তী। আমি যেই হই, রমা ও মুরলা ঘটিত সংবাদ আমি সব জানি। তা ছাড়া তোমার ভূষণাগমন-সংবাদ ও সেখানকার কথাবার্ত্তার সংবাদ আমি জানি। আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা এই মুহূর্ত্তে আমাকে দাও, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমাকে বধ করিব।

এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী ভৈরবী উজ্জ্বল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিল।

গঙ্গারাম একেবারে নিবিয়া গেল। "আসুন দিতেছি।" বলিয়া ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্রাগারে গেল। জয়ন্তী যাহা যাহা চাহিল, সকলই দিল, এবং পিয়ারীলাল নামে এক জন গোলন্দাজকে সঙ্গে দিল। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়া গঙ্গারাম দুর্গদ্বার বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। যেন তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ যাইতে আসিতে না পারে।

জয়ন্তী ও শ্রী গোলা বারুদ লইয়া, গড়ের বাহির হইয়া, যেখানে রাজবাড়ীর ঘাট, সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক উন্নতবপু সুন্দরকান্তি পুরুষ তথা বসিয়া আছেন।

দুই জন ভৈরবীর মধ্যে এক জন ভৈরবী বারুদ, গোলার গাড়ী ও গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, আর এক জন সেই কান্তিমান্ পুরুষের নিকট গিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যে হই না। তুমি কে?"

জয়ন্তী বলিল, "যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলা গুলি আনিয়া দিতেছি—এই পুরী রক্ষা কর।"

সে পুরুষ বিস্মিত হইল, দেবতাভ্রমে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তাতেই বা কি ?"

জয়ন্তী। তুমি কি চাও ?

পুরুষ। যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব ?

জয়ন্তী। পাইবে।

এই বলিয়া জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বলিয়াছি, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সে রাত্রিতে ঘুম হইল না। অতি প্রত্যূষে তিনি রাজপ্রাসাদের উচ্চ চূড়ে উঠিয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, নদীর অপর পারে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে, বহুসংখ্যক নৌকা একত্র হইয়াছে। তীরে অনেক লোকও আছে বোধ হইতেছে, কিন্তু তখনও তেমন ফর্সা হয় নাই, বোঝা গেল না যে, তাহারা কি প্রকারের লোক। তখন তিনি গঙ্গারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

গঙ্গারাম আসিয়া সেই অট্টালিকাশিখরদেশে উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও পারে অত নৌকা কেন ?"

গঙ্গারাম নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কি জানি ?'

চন্দ্র। দেখ, তীরে বিস্তর লোক। এত নৌকা, এত লোক কেন ?

গঙ্গারাম। বলিতে ত পারি না।

কথা কহিতে কহিতে বেশ আলো হইল। তখন বোধ হইল, ঐ সকল লোক সৈনিক। চন্দ্রচূড় তখন বলিলেন, "গঙ্গারাম! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমাদের চর আমাদের প্রতারণা করিয়াছে। অথবা সেই প্রতারিত হইয়াছে। আমরা দক্ষিণ পথে সৈন্য পাঠাইলাম, কিন্তু ফৌজদারের সেনা এই পথে আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইল। এখন রক্ষা করে কে ?

গঙ্গারাম। কেন, আমি আছি কি করিতে ?

চন্দ্র। তুমি এই কয় জন মাত্র দুর্গরক্ষক লইয়া এই অসংখ্য সেনার কি করিবে ? আর তুমিও দুর্গরক্ষার কোন উদ্যোগ করিতেছ না। কাল

বলিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে কড়া কড়া শুনাইয়াছিলে। এখন কে দায় ভার ঘাড়ে করে ?

গঙ্গা। অত ভয় পাইবেন না। ও পারে যে ফৌজ দেখিতেছেন তাহা অসংখ্য নয়। এই কয়খানা নৌকায় কয় জন সিপাহী পার হইতে পারে ? আমি তীরে গিয়া ফৌজ লইয়া দাঁড়াইতেছি। উহারা যেমন তীরে আসিবে, অমনি উহাদিগকে টিপিয়া মারিব।

গঙ্গারামের অভিপ্রায়, সেনা লইয়া বাহির হইবেন, কিন্তু এখন নয়, আগে ফৌজদারের সেনা নির্ব্বিঘ্নে পার হউক। তার পর তিনি সেনা লইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া বাহির হইবেন, মুক্ত দ্বার পাইয়া মুসলমানেরা নির্ব্বিঘ্নে গড়ের ভিতর প্রবেশ করিবে। তিনি কোন আপত্তি করিবেন না। কাল যে মূর্ত্তিটা দেখিয়াছিলেন, সেটা কি বিভীষিকা! কৈ, তার আর কিছু প্রকাশ নাই।

চন্দ্রচূড় সব বুঝিলেন। তথাপি বলিলেন, "তবে শীঘ্র যাও। সেনা লইয়া বাহির হও। বিলম্ব করিও না। নৌকা সকল সিপাহী বোঝাই লইয়া ছাড়িতেছে।"

গঙ্গারাম তখন তাড়াতাড়ি ছাদের উপর হইতে নামিল। চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিতে লাগিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকায় পাঁচ ছয় শত মুসলমান সিপাহী এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম সিপাহী লইয়া বাহির হয়। সিপাহী সকল সাজিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, সারি দিতেছে—কিন্তু বাহির হইতেছে না। চন্দ্রচূড় তখন ভাবিলেন, "হায়! হায়! কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—কেন গঙ্গারামকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম! এখন সর্ব্বনাশ হইল। কৈ, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রাজলক্ষ্মীই বা কৈ ? তিনিও কি ছলনা করিলেন ?" চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের সন্ধানে আসিবার অভিপ্রায়ে সৌধ হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে গুড়ুম্ করিয়া এক কামানের আওয়াজ হইল। মুসলমানের নৌকাশ্রেণী হইতে আওয়াজ হইল, এমন বোধ হইল না। তাহাদের সঙ্গে কামান আছে, এমন বোধ হইতেছিল না। চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, মুসলমানের কোন নৌকায় কামানের ধুঁয়া দেখা যায় না। চন্দ্রচূড় সবিস্ময়ে দেখিলেন, যেমন কামানের শব্দ হইল,

অমনি মুসলমানদিগের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল ; আরোহী সিপাহীরা সন্তরণ করিয়া অন্য নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"তবে কি এ আমাদের তোপ !"

এই ভাবিয়া চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, একটি সিপাহীও গড় হইতে বাহির হয় নাই। দুর্গপ্রাকারে, যেখানে তোপ সকল সাজান আছে, সেখানে একটি মনুষ্যও নাই। তবে এ তোপ ছাড়িল কে ?

কোনও দিকে ধূম দেখা যায় কি না, ইহা লক্ষ্য করিবার জন্য চন্দ্রচূড় চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন,—দেখিলেন, গড়ের সম্মুখে যেখানে রাজবাটীর ঘাট, সেইখান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ধূমরাশি আকাশমার্গে উঠিয়া পবন-পথে চলিয়া যাইতেছে।

তখন চন্দ্রচূড়ের স্মরণ হইল যে, ঘাটের উপরে, গাছের তলায় একটা তোপ আছে। কোন শত্রুর নৌকা আসিয়া ঘাটে না লাগিতে পারে, এ জন্য সীতারাম সেখানে একটা কামান রাখিয়াছিলেন—কেহ এখন সেই কামান ব্যবহার করিতেছে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে কে ? গঙ্গারামের একটি সিপাহীও বাহির হয় নাই—এখনও ফটক বন্ধ। মৃণ্ময়ের সিপাহীরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। মৃণ্ময় যে কোন সিপাহী ঐ কামানের জন্য রাখিয়া যাইবেন, ইহা অসম্ভব ; কেন না, দুর্গরক্ষার ভার গঙ্গারামের উপর আছে। কোন বাজে লোক আসিয়া কামান ছাড়িল—ইহাও অসম্ভব ; কেন না, বাজে লোকে গোলা বারুদ কোথা পাইবে ? আর এরূপ অব্যর্থ সন্ধান—বাজে লোকের হইতে পারে না—শিক্ষিত গোলন্দাজের। কার এ কাজ ? চন্দ্রচূড় এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই কামান বজ্রনাদে চতুর্দ্দিক্ শব্দিত করিল—আবার ধূমরাশি আকাশে উঠিয়া নদীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে গগন বিচরণ করিতে লাগিল—আবার মুসলমান সিপাহীপরিপূর্ণ আর একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

"ধন্য! ধন্য!" বলিয়া চন্দ্রচূড় করতালি দিতে লাগিলেন। নিশ্চিত এই সেই মহাদেবী! বুঝি কালিকা সদয় হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। জয় লক্ষ্মীনারায়ণজী! জয় কালী! জয় পুররাজলক্ষ্মী! তখন চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিলেন যে, যে সকল নৌকা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল—অর্থাৎ যে সকল নৌকার সিপাহীদের গুলি তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সম্ভাবনা, তাহারা তীর লক্ষ্য করিয়া

বন্দুক চালাইতে লাগিল। ধূমে সহসা নদীবক্ষ অন্ধকার হইয়া উঠিল—শব্দে কাণ পাতা যায় না। চন্দ্রচূড় ভাবিলেন, "যদি আমাদের রক্ষক দেবতা হয়েন—তবে এ গুলিবৃষ্টি তাঁহার কি করিবে? আর যদি মনুষ্য হয়েন, তবে আমাদের জীবন এই পর্য্যন্ত—এ লোহাবৃষ্টিতে কোন মনুষ্যই টিকিবে না।"

কিন্তু আবার সেই কামান ডাকিল—আবার দশ দিক্ কাঁপিয়া উঠিল—ধূমের চক্রে চক্রে ধূমাকার বাড়িয়া গেল। আবার সসৈন্য নৌকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

তখন এক দিকে—এক কামান—আর এক দিকে শত শত মুসলমান সেনায় তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শব্দে আর কাণ পাতা যায় না। উপর্য্যুপরি গম্ভীর, তীব্র, ভীষণ, মুহুর্ম্মুহুঃ ইন্দ্রহস্তপরিত্যক্ত বজ্রের মত, সেই কামান ডাকিতে লাগিল,—প্রশস্ত নদীবক্ষ, এমন ধূমাচ্ছন্ন হইল যে, চন্দ্রচূড় সেই উচ্চ সৌধ হইতে উত্তালতরঙ্গসংক্ষুব্ধ ধূমসমুদ্র ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই তীব্রনাদী বজ্রনাদে বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী দেবী জীবিতা আছেন। চন্দ্রচূড় তীব্র দৃষ্টিতে ধূমসমুদ্রের বিচ্ছেদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন—এই আশ্চর্য্য সমরের ফল কি হইল—দেখিবেন।

ক্রমে শব্দ কম পড়িয়া আসিল—একটু বাতাস উঠিয়া ধুঁয়া উড়াইয়া লইয়া গেল—তখন চন্দ্রচূড় সেই জলময় রণক্ষেত্র পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে, ছিন্ন, নিমগ্ন, নৌকা সকল স্রোতে উলটি পালটি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃত ও জীবিত সিপাহীর দেহে নদীস্রোত ঝটিকাশান্তির পর পল্লবকুসুমসমাকীর্ণ উদ্যানবৎ দৃষ্ট হইতেছে। কাহারও অস্ত্র, কাহারও বস্ত্র, কাহারও বাদ্য, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও দেহ ভাসিয়া যাইতেছে—কেহ সাঁতার দিয়া পলাইতেছে—কাহাকেও কুম্ভীরে গ্রাস করিতেছে। যে কয়খানা নৌকা ডোবে নাই—সে কয়খানা, নাবিকেরা প্রাণপাত করিয়া বাহিয়া সিপাহী লইয়া অপর পারে পলায়ন করিয়াছে। একমাত্র বজ্রের প্রহারে আহতা আসুরী সেনার ন্যায় মুসলমান সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

দেখিয়া চন্দ্রচূড় হাত যোড় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে, গদ্গদকণ্ঠে, সজলনয়নে বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর! জয় দৈত্যদমন, ভক্ততারণ, ধর্ম্মরক্ষণ হরি! আজ

বড় দয়া করিলে! আজ তুমি স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নহিলে এই পুর-রাজলক্ষ্মী স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, নহিলে তোমার দাসানুদাস সীতারাম আসিয়াছে। তোমার সেই ভক্ত ভিন্ন এ যুদ্ধ মনুষ্যের সাধ্য নহে।"

তখন চন্দ্রচূড়, প্রাসাদশিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কামানের বন্দুকের হুড়্মুড়্ হুড়্মুড়্ শুনিয়া গঙ্গারাম মনে ভাবিল—এ আবার কি? লড়াই কে করে? সেই ডাকিনী নয় ত? তিনি কি দেবতা? গঙ্গারাম এক জন জমাদ্দারকে দেখিতে পাঠাইলেন। জমাদ্দার নিষ্ক্রান্ত হইল। সে দিন, সেই প্রথম ফটক খোলা হইল।

জমাদ্দার ফিরিয়া গিয়া নিবেদন করিল, "মুসলমান লড়াই করিতেছে।"

গঙ্গারাম বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা ত জানি। কার সঙ্গে মুসলমান লড়াই করিতেছে?"

জমাদ্দার বলিল, "কারও সঙ্গে নহে।"

গঙ্গারাম হাসিল, "তাও কি হয় মূর্খ! তোপ কার?"

জমাদ্দার। হুজুর, তোপ কারও না।

গঙ্গারাম বড় রাগিল। বলিল, "তোপের আওয়াজ শুনিতেছিস্ না?"

জমাদ্দার। তা শুনিতেছি।

গঙ্গারাম। তবে? সে তোপ কে দাগিতেছে?

জমা। তাহা দেখিতে পাই নাই।

গঙ্গা। চোখ কোথা ছিল?

জমা। সঙ্গে।

গঙ্গা। তবে তোপ দেখিতে পাও নাই কেন?

জমা। তোপ দেখিয়াছি—ঘাটের তোপ।

গঙ্গা। বটে! কে আওয়াজ করিতেছে?

জমা। গাছের ডাল।

গঙ্গা। তুই কি ক্ষেপিয়াছিস্? গাছের ডালে তোপ দাগে?

জমা। সেখানে আর কাহাকে দেখিতে পাইলাম না—কেবল কতকগুলা গাছের ডাল তোপ ঢাকিয়া নুড়িয়া পড়িয়া আছে দেখিলাম।

গঙ্গা। তবে কেহ ডাল নোওাইয়া বাঁধিয়া তাহার আশ্রয়ে তোপ দাগিতেছে। সে বুদ্ধিমান্ সন্দেহ নাই। সিপাহীরা তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু সে পাতার আড়াল হইতে তাহাদের লক্ষ্য করিবে। ডালের ভিতর কে আছে, তা দেখে এলি না কেন?

জমা। সেখানে কি যাওয়া যায়?

গঙ্গা। কেন?

জমা। সেখানে বৃষ্টির ধারার মত গুলি পড়িতেছে।

গঙ্গা। গুলিতে এত ভয় ত এ কাজে এসেছিলি কেন?

তখন গঙ্গারাম অনুচরকে হুকুম দিল যে, জমাদ্দারের পাগড়ি পোষাক কাপড় সব কাড়িয়া লয়। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া মৃণ্ময় বাছা বাছা জনকত হিন্দুস্থানীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং দুর্গরক্ষার জন্য তাহাদের রাখিয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গারাম তাহাদিগের মধ্যে চারি জনকে আদেশ করিল, "যেখানে ঘাটের উপর তোপ আছে সেইখানে যাও। যে কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া আন।"

সেই চারি জন সিপাহী যখন তোপের কাছে আসিল, তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, হতাবশিষ্ট মুসলমানেরা বাহিয়া পলাইয়া যাইতেছে। সিপাহীরা গাছের ডালের ভিতর গিয়া দেখিল—তোপের কাছে একজন মানুষ মরিয়া পড়িয়া আছে—আর একজন জীবিত, পলিতা হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সে খুব জোওয়ান, ধুতি মালকোঁচা মারা, মাথায় মুখে গালচাল্লা বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গে বারুদে আর ছাইয়ে কালো হইয়া আছে। চারি জন আসিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "তোম্ কোন্ হো রে?"

সে বলিল, "কেন বাপু!"

"তোম্ কাহে হিঁয়া বৈঠ্‌ বৈঠ্‌কে তোপ ছোড়্‌তে হো?"

"কেন বাপু, তাতে কি দোষ হয়েছে? মুসলমানের সঙ্গে তোমরা মিলেছ?"

"আরে মুসলমান আনেসে হম্‌লোক আভি হাঁকায় দেতে—তোম্ কাহেকো দিক্ কিয়ে হো? চল্ হুজুরমে যানে হোগা।"

"কার কাছে যাব ?"

"কোতোয়াল সাহেবকি হুকুমসে তোম্‌কো উন্‌কা পাশ লে যাঙ্গে।"

"আচ্ছা যাই। আগে নেড়েরা বিদায় হোক। যতক্ষণ ওদের মধ্যে এক জনকে ও পারে দেখা যাইবে, ততক্ষণ তোরা কি, তোদের কোতোয়াল এলে উঠিব না। ততক্ষণ দেখ দেখি, যে মানুষটা মরিয়া আছে, ও কে চিনিতে পারিস্ কি না ?"

সিপাহীরা দেখিয়া বলিল, "হাঁ, হামলোক ত ইস্কো পহচান্‌তে হেঁ। য়ে ত হমারা গোলন্দাজ পিয়ারীলাল হৈঁ—য়ে কাঁহাসে আয়া ?"

"তবে আগে ওকে গড়ের ভিতর নিয়ে যা—আমি যাচ্ছি।"

সিপাহীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "য়ে আদ্‌মি ত অচ্ছা বোল্‌তা হৈ। যো তোপ্‌কা পাশ রহেগা, ওসিঁকো লে যানেকো হুকুম হৈ। এই মুরদার তোপ্‌কা পাশ হৈ—উস্‌কো আলবৎ লে যানে হোগা।"

কিন্তু মড়া—হিন্দু সিপাহীরা ছুঁইবে না। তখন পরামর্শ করিয়া একজন সিপাহী, ডোম ডাকিতে গেল—আর তিন জন তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এ দিকে কালি বারুদ মাখা পুরুষ, ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যে, মুসলমান সিপাহীরা সব তীরে গিয়া উঠিল। তখন তিনি সিপাহীদিগকে বলিলেন, "চল বাবা, তোমাদের কোতোয়াল সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল।" সিপাহীরা সে ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে যেখানে ভীত নাগরিকগণ পিপীলিকাশ্রেণীবৎ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেইখানে সিপাহীরা সেই কালিমাখা বারুদমাখা পুরুষকে আনিয়া খাড়া করিল।

তখন সহসা জয়ধ্বনিতে আকাশ পূরিয়া উঠিল। সেই সমবেত সৈনিক ও নাগরিকমণ্ডলী, একেবারে সহস্র কণ্ঠে গর্জ্জন করিল, "জয় মহারাজের জয়।"

"জয় মহারাজাধিরাজকি জয়।"

"জয় শ্রীসীতারামরায় রাজা বাহাদুরকি জয়।"

"জয় লক্ষ্মীনারায়ণজীকি জয়।"

চন্দ্রচূড় দ্রুত আসিয়া সেই বারুদমাখা মহাপুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন; বারুদমাখা পুরুষও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "সমর

দেখিয়া আমি জানিয়াছি, তুমি আসিয়াছ। মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন এ অব্যর্থ সন্ধান আর কাহারও নাই। এখন অন্য কথার আগে গঙ্গারামকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দাও।"

সীতারাম সেই আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গারাম সীতারামকে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া সীতারামের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সীতারাম, তখন সিপাহীদিগকে দুর্গপ্রাকারস্থিত তোপ সকলের নিকট, এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত করিয়া, এবং মৃণ্ময়ের সম্বন্ধে সংবাদ আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া, স্বয়ং স্নানাহ্নিকে গমন করিলেন। স্নানাহ্নিকের পর, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কখন আসিয়াছেন, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। একাই বা কেন আসিলেন? আপনার অনুচরবর্গই বা কোথায়? পথে কোন বিপদ্ ঘটে নাই ত?"

সীতা। সঙ্গীদিগকে পথে রাখিয়া আমি একা আগে আসিয়াছি। আমার অবর্ত্তমানে নগরের কিরূপ অবস্থা, তাহা জানিবার জন্য ছদ্মবেশে একা রাত্রিকালে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম, নগর সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। কেন, তাহা এখন কতক কতক বুঝিয়াছি। পরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলাম, ফটক বন্ধ। দুর্গে প্রবেশ না করিয়া, প্রভাত নিকট দেখিয়া নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, মুসলমান সেনা নৌকায় পার হইতেছে। দুর্গরক্ষকেরা রক্ষার কোন উদ্যোগই করিতেছে না দেখিয়া, আপনার যাহা সাধ্য, তাহা করিলাম।

চন্দ্র। যাহা করিয়াছেন, তাহা আপনারই সাধ্য, অপরের নহে। এত গোলা বারুদ পাইলেন কোথা?

সীতা। এক দেবী সহায় হইয়া আমাকে গোলা বারুদ, এবং গোলন্দাজ আনিয়া দিয়াছিলেন।

চন্দ্র। দেবী? আমিও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী। তিনি কোথায় গেলেন?

সীতা। তিনি আমাকে গোলা বারুদ এবং গোলন্দাজ দিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। এক্ষণে এ কয় মাসের সংবাদ আমাকে বলুন।

তখন চন্দ্রচূড় সকল বৃত্তান্ত, যতদুর তিনি জানিতেন, আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন, "এক্ষণে যে জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধির সংবাদ বলুন।"

সীতা। কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহের আমি কোন উপকার করিতে পারিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য প্রদান করিয়া মহারাজাধিরাজ নাম দিয়া সনন্দ দিয়াছেন। এক্ষণে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কেন না, ফৌজদার সুবাদারের অধীন, এবং সুবাদার বাদশাহের অধীন। অতএব ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ করিলে, বাদশাহের সঙ্গেই বিরোধ করা হইল। যিনি আমাকে এতদুর অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করা নিতান্ত কৃতঘ্নের কাজ। আত্মরক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার অকর্ত্তব্য। অতএব এ বিরোধ আমার বড় দুরদৃষ্ট বিবেচনা করি।

চন্দ্র। ইহা আমাদিগের শুভাদৃষ্ট—হিন্দু মাত্রেরই শুভাদৃষ্ট; কেন না, আপনি মুসলমানের প্রতি সম্প্রীত হইলে, মুসলমান হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে? হিন্দুধর্ম্ম আর দাঁড়াইবে কোথায়? ইহা আপনারাও শুভাদৃষ্ট; কেন না, যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবে, সেই মনুষ্য মধ্যে কৃতী ও সৌভাগ্যশালী।

সীতা। মৃণ্ময়ের সংবাদ না পাইলে, কি কর্ত্তব্য, কিছুই বলা যায় না।

সন্ধ্যার পর মৃণ্ময়ের সংবাদ আসিল। পীর বক্‌স্ খাঁ নামে ফৌজদারী সেনাপতি অর্দ্ধেক ফৌজদারী সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, অর্দ্ধেক পথে মৃণ্ময়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও যুদ্ধ হয়। মৃণ্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে তিনি সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করেন। বিজয়ী মৃণ্ময় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া চন্দ্রচূড় সীতারামকে বলিলেন, "মহারাজ! আর দেখেন কি? এই সময়ে বিজয়ী সেনা লইয়া নদী পার হইয়া গিয়া ভূষণা দখল করুন।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী বলিল, "শ্রী! আর দেখ কি? এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেই জন্যই কি আসিয়াছি?

জয়ন্তী। যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি যে, তোমা হইতেই এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তি! সোণা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোনাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না, রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছু দিন না হয় এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি, যদি দেখি, আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।

অতএব শ্রী, রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।

তৃতীয় খণ্ড

রাত্রি—ডাকিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব্ খাঁ মৃণ্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন। সে সকল ঐতিহাসিক কথা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা। আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না। উপন্যাসলেখক অন্তর্ব্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান্ হইবেন—ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন।

ভূষণা অধিকৃত হইল। বাদশাহী সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহারাজা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথাটা উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না। পতিপ্রাণা অপরাধিনী রমাই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে সীতারামের নিকট প্রকাশ করিল। বাকি যেটুকু, সেটুকু মুরলা ও চাঁদশাহ ফকির সকলই প্রকাশ করিল। কেবল গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করা বাকি—এমন সময়ে এ কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল।

কথাগুলা রমা, অন্তঃপুরে বসিয়া সীতারামের কাছে, চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল। সীতারাম তাহার একবর্ণ অবিশ্বাস করিলেন না। বুঝিলেন, সরলা রমা নিরপরাধিনী, অপরাধের মধ্যে কেবল পুত্রস্নেহ। কিন্তু সাধারণ পুরবাসী লোক তাহা ভাবিল না। গঙ্গারাম কয়েদ হইল কেন? এই কথাটা লইয়া সহরে বড় আন্দোলন পড়িয়া গেল। কতক মুরলার দোষে, কতক সেই পাহারাওয়ালা পাঁড়ে ঠাকুরের গল্পের ঝাঁকে; রমার নামটা সেই সঙ্গে লোকে মিলাইতে লাগিল। কেহ বলিল যে, গঙ্গারাম মোগলকে রাজ্য বেচিতে বসিয়াছিল; কেহ বলিল যে, সে ছোট রাণীর মহলে গিরেপ্তার হইয়াছিল; কেহ বলিল, দুই কথাই সত্য, আর রাজ্য বেচার পরামর্শে ছোট রাণীও ছিলেন। রাজার কাণে এত কথা উঠে না, কিন্তু রাণীর কাণে উঠে—মেয়ে মহলে এ রকম কথাগুলা সহজে প্রচার পায়—শাখা প্রশাখা সমেত। দুই

রাণীর কাণেই কথা উঠিল। রমা শুনিয়া শয্যা লইল, কাঁদিয়া বালিশ ভাসাইল, শেষ গলায় দড়ি দিয়া, কি জলে ডুবিয়া মরা ঠিক করিল। নন্দা শুনিয়া বুদ্ধিমতীর মত কাজ করিল।

নন্দা খুঁজিয়া খুঁজিয়া রমা যেখানে বালিশে মুখ ঝাঁপিয়া কাঁদিতেছে, আর পুকুরে ডুবিয়া মরা সোজা, কি গলায় দড়ি দিয়া মরা সোজা, ইহার যতদূর সাধ্য মীমাংসা করিতেছে, সেইখানে গিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "দেখিতেছি, তুমিও ছাই কথা শুনিয়াছ।" রমা কেবল ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ "শুনিয়াছি।"—চক্ষুর জল বড় বেশী ছুটিল।

নন্দা তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া, সস্নেহবচনে বলিল, "কাঁদিলে কলঙ্ক যাবে না, দিদি! না কাঁদিয়া, যাতে এ কলঙ্ক মুছিয়া তুলিতে পারি, তাই করিতে হইবে। পারিস্ ত উঠিয়া বসিয়া, ধীরে সুস্থে আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বল্ দেখি। এখন আমাকে সতীন ভাবিস্ না—কালি চুণ তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই বড় মাথা হেঁট হয়েছে। তিনি তোরও প্রভু—আমারও প্রভু, এ লজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী, তা মনে করিস্ না। আর মহারাজা আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁর কাণে এ কথা উঠিলে আমি কি জবাব দিব?"

রমা বলিল, "যাহা যাহা হইয়াছিল, আমি তাঁহাকে বলিয়াছি; তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমার ত কোন দোষ নাই।"

নন্দা। তা বলিতে হইবে না—তোর যে কোন দোষ নাই, সে কথা আমায় বলিয়া কেন দুঃখ পাস্? তবে কি হইয়াছিল, তা আমাকে বলিস্ না বলিস্—

রমা। বলিব না কেন? আমি এ কথা সকলকেই বলিতে পারি।

এই বলিয়া রমা, চক্ষুর জল সামলাইয়া, উঠিয়া বসিয়া, সকল কথা যথার্থরূপে নন্দাকে বলিল। নন্দার সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। নন্দা বলিল, "যদি ঘুণাক্ষরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ কাজ করিতে দিদি, তবে কি এত কাণ্ড হইতে পায়? তা যাক্—যা হয়ে গিয়েছে, তার জন্ত তিরস্কার করিয়া এখন আর কি হইবে? এখন যাহাতে আবার মানসম্ভ্রম বজায় হয়, তাই করিতে হইবে।"

রমা। যদি তা না কর দিদি, তবে তোমায় নিশ্চিত বলিতেছি, আমি জলে ডুবিয়া মরিব, কি গলায় দড়ি দিয়া মরিব। আমি ত রাজার মহিষী—এমন কাঙ্গাল গরিব ভিখারীর মেয়ে কে আছে যে, অপবাদ হইলে আর প্রাণ রাখিতে চায়?

নন্দা। মরিতে হইবে না, দিদি! কিন্তু একটা খুব সাহসের কাজ করিতে পারিস্? বোধ হয়, তা হলে কাহারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

রমা। এমন কাজ নাই যে, এর জন্য আমি করিতে পারি না। কি করিতে হইবে?

নন্দা। তুমি যে রকম করিয়া আমার কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলে, এই রকম করিয়া তুমি যার সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিবে, সেই তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে, ইহা আমার নিশ্চিত বিবেচনা হয়। যদি রাজধানীর লোক সকলে তোমার মুখে এ কথা শুনে, তবে আর এ কলঙ্ক থাকে না।

রমা। তা, কি প্রকারে হইবে?

নন্দা। আমি মহারাজকে বলিয়া দরবার করাইব। তিনি ঘোষণা দিয়া সমস্ত নগরবাসীকে সেই দরবারে উপস্থিত করিবেন; সেখানে গঙ্গারামের সাক্ষাৎকারে, সমস্ত নগরবাসীর সাক্ষাৎকারে, তুমি এই কথাগুলি বলিবে। আমরা রাজমহিষী, সূর্য্যও আমাদিগকে দেখিতে পান না। এই সমস্ত নগরবাসীর সম্মুখে বাহির হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তুমি এই সকল কথা কি বলিতে পারিবে? পার ত সব কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হই।

রমা তখন সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি সমস্ত নগরবাসী কি বলিতেছ দিদি! সমস্ত জগতের লোক জমা কর, আমি জগতের লোকের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিব।"

নন্দা। পারিবি?

রমা। পারিব—নহিলে মরিব।

নন্দা। আচ্ছা, তবে আমি গিয়া মহারাজকে বলিয়া দরবারের বন্দোবস্ত করাই। তুই আর কাঁদিস্ না।

নন্দা উঠিয়া গেল। রমাও শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখের জল মুছিয়া, পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিল। এতক্ষণ তাহাও করে নাই।

নন্দা রাজাকে সংবাদ দিয়া অন্তঃপুরে আনাইল। যে কুরব উঠিয়াছে, সকলেই যাহা বলিতেছে, তাহা রাজাকে শুনাইল। তার পর রমার সঙ্গে নন্দার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সকলই অবিকল তাঁহাকে বলিল। তার পর বলিল, "আমরা দুই জনে গলায় কাপড় দিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া (বলিবার সময় নন্দা গলায় কাপড় দিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাতে দুই পা চাপিয়া ধরিল) বলিতেছি যে, এখন তুমি আমাদের মান রাখ, এ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার কর, নহিলে আমরা দুই জনেই আত্মহত্যা করিয়া মরিব।"

সীতারাম বড় বিষণ্ণভাবে—কলঙ্কের জন্যও বটে, নন্দার প্রস্তাবের জন্যও বটে,—বলিলেন, "রাজার মহিষী—আমি কি প্রকারে দরবারে বাহির করিব? কি প্রকারে আপনার মহিষীকে সামান্যা কুলটার ন্যায় বিচারালয়ে খাড়া করিয়া দিব?"

নন্দা। তুমি যেমন বুঝিবে, আমরা কিন্তু তেমন বুঝিব না; কিন্তু সে বেশী লজ্জা, না রাজমহিষীর কুলটা অপবাদ বেশী লজ্জা?

সীতা। এরূপ মিথ্যা অপবাদ রাজার ঘরে, সীতা হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রথামত কাজ করিতে হইলে এত কাণ্ড না করিয়া, সীতার ন্যায় রমাকে আমার ত্যাগ করাই শ্রেয়। তাহা হইলে আর কোন কথা থাকে না।

নন্দা। মহারাজ! নিরপরাধিনীকে ত্যাগ করিবে, তবু তার বিচার করিবে না? এই কি তোমার রাজধর্ম্ম? রামচন্দ্র করিয়াছিলেন বলিয়া কি তুমিও করিবে? যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁর আর ত্যাগই কি, গ্রহণই কি? তোমার কি তা সাজে মহারাজ?

সীতা। এই সমস্ত প্রজা, শত্রু মিত্র ইতর ভদ্র লোকের সাক্ষাতে আপনার মহিষীকে কুলটার ন্যায় খাড়া করিয়া দিতে আমার বুক কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? আমি ত পাষাণ নহি।

নন্দা। মহারাজ! যখন পঞ্চাশ হাজার লোক সামনে, শ্রী গাছের ডালে চড়িয়া নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?

সীতারাম নন্দার প্রতি ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "তা হয়েছিল, নন্দা! আবার তেমন হইল না, সেই দুঃখই আমার বেশী।"

ইটুটি মারিয়া পাটখেল খাইয়া, নন্দা যোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। যোড় হাত করিয়া, নন্দা জিতিয়া গেল। সীতারাম শেষে দরবারে সম্মত হইলেন। বুঝিলেন, ইহা না করিলে রমাকে ত্যাগ করিতে হয়। অথচ রমা নিরপরাধিনী। কাজেই দরবার ভিন্ন আর কর্ত্তব্য নাই।

বিষণ্ণভাবে রাজা, চন্দ্রচূড়ের নিকটে আসিয়া দরবারের কর্ত্তব্যতা নিবেদিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আব্রু পরদার উপর ততটা শ্রদ্ধা হইল না। তিনি সাধুবাদ করিয়া সম্মত হইলেন। তাঁর কেবল ভয়, রমা কথা কহিতে পারিবে না। সীতারামেরও সে ভয় ছিল। সে যদি না পারে, তবে সকল দিক্ যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন সীতারাম ঘোষণা করিলেন যে, আমদরবারে গঙ্গারামের বিচার হইবে। রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত হইয়া বিচার দর্শন করিবে। আজ্ঞা পাইয়া অবধারিত দিবসে, সহস্র সহস্র প্রজাবৃন্দ আসিয়া দরবার পরিপূর্ণ করিল। দিল্লীর অনুকরণে সীতারামও এক "দরবারে আম" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজিকার দিন তাহা কর্ম্মচারীদিগের যত্নে সুসজ্জিত হইয়াছিল। দিল্লীর মত তাহার রূপার চাঁদোবা, মতির ঝালর ছিল না; কিন্তু তথাপি চন্দ্রাতপ পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত, তাহাতে জরির কাজ। স্তম্ভ সকল সেইরূপ কারুকার্য্যখচিত, পট্টবস্ত্রে আবৃত। নানাচিত্রবর্ণরঞ্জিত কোমল গালিচায় সভামণ্ডপ শোভিত, তাহার চারি পার্শ্বে বিচিত্রপরিচ্ছদধারী সৈনিকগণ সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। বাহিরে অশ্বারূঢ় রক্ষিবর্গ শান্তি রক্ষা করিতেছে। সভামণ্ডপমধ্যে শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত উচ্চ বেদীর উপর সীতারামের জন্য স্বর্ণখচিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, মুক্তাঝালরশোভিত সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে দুর্গ লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সভামণ্ডপমধ্যে কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই স্থান পাইল। নিম্ন শ্রেণীর লোকে সহস্রে সহস্রে সভামণ্ডপ পরিবেষ্টিত করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

বাতায়ন হইতে এই মহাসমারোহ দেখিতে পাইয়া মহারাজ্ঞী নন্দা দেবী রমাকে ডাকিয়া আনিয়া এই ব্যাপার দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন,

এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে? সাহস হইতেছে ত?"

রমা। যদি আমার স্বামিপদে ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব? বল ত আমি যাই।

রমা। তুমিও কেন আমার সঙ্গে এ অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে? কাহাকে যাইতে হইবে না। কেবল একটা কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।

নন্দা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "এখন সভামধ্যে যাইতে হইবে, একটু কাপড় চোপড় দুরস্ত করিয়া নাও। এই বেলা প্রস্তুত হও।"

রমা স্বীকৃত হইয়া আপনার মহলে গেল। সেখানে ঘর রুদ্ধ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যুক্তকরে ডাকিতে লাগিল, "জয় লক্ষ্মীনারায়ণ! জয় জগদীশ্বর! আজিকার দিনে আমার যাহা বলিবার, তাহা বলিয়া, আমি যদি তার পর জন্মের মত বোবা হই, তাহাও আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন সভামধ্যে আপনার কথা বলিয়া, আর কখনও ইহ জন্মে কথা না কই, তাও তোমার কাছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন মুখ রাখিও। তার পর মরণে আমার কোন দুঃখ থাকিবে না।"

তার পর বেশ পরিবর্ত্তনের কথাটা মনে পড়িল। রমা ধাত্রীদিগের একখানা সামান্য বস্ত্র চাহিয়া লইয়া, তাই পরিয়া সভামণ্ডপে যাইতে প্রস্তুত হইল। নন্দা দেখিয়া বলিল, "এ কি এ?"

রমা বলিল, "আজ আমার সাজিবার দিন নয়। বিধাতা যদি আবার কখন সাজিবার দিন দেন, তবে আবার সাজিব। নহিলে এই সাজাই শেষ। এই বেশেই সভায় যাইব।"

নন্দা বুঝিল, ইহা উপযুক্ত। আর কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাকালে, মহারাজ সীতারাম রায় সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। নকিব স্তুতিবাদ করিল, কিন্তু গীত বাদ্য সে দিন নিষেধ ছিল।

তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারাম সম্মুখে আনীত হইল। তাহাকে দেখিবার জন্য বাহিরে দণ্ডায়মান জনসমূহ বিচলিত ও উন্মুখ হইয়া উঠিল। শান্তিরক্ষকেরা তাহাদিগকে শান্ত করিল।

রাজা তখন গঙ্গারামকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "গঙ্গারাম! তুমি আমার কুটুম্ব, আত্মীয়, প্রজা এবং বেতনভোগী। আমি তোমাকে বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতাম, তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে, ইহা সকলেই জানে। একবার আমি তোমার প্রাণও রক্ষা করিয়াছি। তার পর, তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ করিলে কেন? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

গঙ্গারাম বিনীতভাবে বলিল, "কোন শত্রুতে আপনার কাছে আমার মিথ্যাপবাদ দিয়াছে। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নাই। মহারাজ স্বয়ং আমার বিচার করিতেছেন—ভরসা করি, ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত প্রমাণ না পাইলে আমার কোন দণ্ড করিবেন না।"

রাজা। তাহাই হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুন, আর যথাসাধ্য উত্তর দাও।

এই বলিয়া রাজা চন্দ্রচূড়কে অনুমতি করিলেন যে, "আপনি যাহা জানেন, তাহা ব্যক্ত করুন।"

তখন চন্দ্রচূড় যাহা জানিতেন, তাহা সবিস্তারে সভামধ্যে বিবৃত করিলেন। তাহাতে সভাস্থ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল যে, যে দিন মুসলমান দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নদী পার হইতেছিল, সে দিন চন্দ্রচূড়ের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও গঙ্গারাম দুর্গরক্ষার কোন চেষ্টা করেন নাই। চন্দ্রচূড়ের কথা সমাপ্ত হইলে, রাজা গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন, "নরাধম! ইহার কি উত্তর দাও?"

গঙ্গারাম যুক্তকরে বলিল, "ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ইনি যুদ্ধের কি জানেন? মুসলমান এ পারে আসেও নাই, দুর্গ আক্রমণও করে নাই। যদি তাহা করিত, আর আমি তাহাদের না হটাইতাম, তবে ঠাকুর মহাশয় যাহা

বলিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য হইত। মহারাজ! দুর্গমধ্যে আমিও বাস করি। দুর্গের বিনাশে আমার কি লাভ?"

রাজা। কি লাভ, তাহা আর এক জনের নিকট শুন।

এই বলিয়া রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে আজ্ঞা করিলেন, "আপনি যাহা জানেন, তাহা বলুন।"

চাঁদশাহ তখন দুর্গ আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রিতে তোরাব্ খাঁর নিকট গঙ্গারামের গমনবৃত্তান্ত যাহা জানিতেন, তাহা বলিলেন। রাজা তখন গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহার কি উত্তর দাও?"

গঙ্গারাম বলিল, "আমি সে রাত্রে তোরাব্ খাঁর নিকট গিয়াছিলাম বটে। বিশ্বাসঘাতক সাজিয়া, কুপথে আনিয়া, তাহাকে গড়ের নীচে আনিয়া টিপিয়া মারিব—আমার এই অভিপ্রায় ছিল।"

রাজা। সে জন্য তোরাব্ খাঁর কাছে কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলে?

গঙ্গারাম। নহিলে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিবে কেন?

রাজা। কি পুরস্কার চাহিয়াছিলে?

গঙ্গারাম। অর্দ্ধেক রাজ্য।

রাজা। আর কিছু?

গঙ্গা। আর কিছু না।

তখন রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সে কথা কিছু জানেন?"

চাঁদশাহ। জানি।

রাজা। কি প্রকারে জানিলেন?

চাঁদ। আমি মুসলমান ফকির, তোরাব্ খাঁর কাছে যাতায়াত করিতাম। তিনিও আমাকে বিশেষ আদর করিতেন। আমি কখন তাঁহার কথা মহারাজের কাছে বলিতাম না, অথবা মহারাজের কথা তাঁহার কাছে বলিতাম না। এজন্য কোন পক্ষ বলিয়া গণ্য নহি। এখন তিনি গত হইয়াছেন, এখন ভিন্ন কথা। যে দিন তিনি মহারাজের হাতে ফতে হইয়া মধুমতীর তীর হইতে প্রস্থান করেন, সেই দিন তাঁহার সঙ্গে পথিমধ্যে আমার দেখা হইয়াছিল। তখন গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা

হইয়াছিল। গঙ্গারাম তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, এই বিবেচনায়, তিনি আপনা হইতেই সে সকল কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। গঙ্গারাম অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কারস্বরূপ চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু আরও কিছু চাহিয়াছিল। তবে সে কথা হুজুরে নিবেদন করিতে বড় ভয় পাই—অভয় ভিন্ন বলিতে পারি না।

রাজা। নির্ভয়ে বলুন।

চাঁদ। দ্বিতীয় পুরস্কার মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী।

দর্শকমণ্ডলী সমুদ্রবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—গঙ্গারামকে নানাবিধ গালি পাড়িতে লাগিল। শান্তিরক্ষকেরা শান্তি রক্ষা করিল। গঙ্গারাম বলিল, "মহারাজ! এ অতি অসম্ভব কথা। আমার নিজের পরিবার আছে—মহারাজের অবিদিত নাই। আর আমি নগররক্ষক—স্ত্রীলোকে আমার রুচি থাকিলে, আমার দুষ্প্রাপ্য বড় অল্প। আমি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষীকে কখনও দেখি নাই—কি জন্য তাঁহাকে কামনা করিব?"

রাজা। তবে তুমি কুকুরের মত রাত্রে লুকাইয়া আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে কেন?

গঙ্গারাম। কখনও না।

তখন সেই পাঁড়েঠাকুর পাহারাওয়ালাকে তলব হইল। পাঁড়েঠাকুর, দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন যে, গঙ্গারাম প্রত্যহ গভীর রাত্রিতে মুরলার সঙ্গে, তাহার ভাই পরিচয়ে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত।

শুনিয়া গঙ্গারাম বলিল, "মহারাজ! ইহা সম্ভব নহে। মুরলার ভাইকেই বা ঐ ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিবে কেন?"

তখন পাঁড়েঠাকুর উত্তর করিলেন যে, তিনি গঙ্গারামকে বিলক্ষণ চিনিতেন; তবে কোতোয়ালকে তিনি রোখেন কি প্রকারে? এজন্য চিনিয়াও চিনিতেন না।

গঙ্গারাম দেখিল, ক্রমে গতিক মন্দ হইয়া আসিল। এক ভরসা মনে এই উদয় হইল, মুরলা নিজে কখনও এ সকল কথা প্রকাশ করিবে না—কেন না, তাহা হইলে সেও দণ্ডনীয়—তার কি আপনার প্রাণের ভয় নাই? তখন গঙ্গারাম বলিল, "মুরলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক—কথা সকলই মিথ্যা প্রকাশ পাইবে।"

বেচারা জানিত না যে, মুরলাকে, মহারাজ্ঞী শ্রীমতী নন্দা ঠাকুরাণী পূর্ব্বেই হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নন্দা, মুরলাকে বুঝাইয়াছিল যে, "মহারাজা স্ত্রীহত্যা করেন না—তোর মরিবার ভয় নাই। স্ত্রীলোককে শারীরিক কোন রকম সাজা দেন না। অতএব বড় সাজার তোর ভয় নাই। কিছু সাজা তোর হইবেই হইবে। তবে, তুই যদি সত্য কথা ব'লিস্—তোর সাজা বড় কম হবে।" মুরলাও তাহা বুঝিয়াছিল, সুতরাং সব কথা ঠিক বলিল—কিছুই ছাড়িল না।

মুরলার কথা গঙ্গারামের মাথায় বজ্রাঘাতের মত পড়িল। তথাপি সে আশা ছাড়িল না। বলিল, "মহারাজ! এ স্ত্রীলোক অতি কুচরিত্রা! আমি নগরমধ্যে ইহাকে অনেক বার ধরিয়াছি, এবং কিছু শাসনও করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় সেই রাগে এ সকল কথা বলিতেছে।"

রাজা। তবে কার কথায় বিশ্বাস করিব, গঙ্গারাম? খোদ মহারাণীর কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

গঙ্গারাম যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, রমা কখনও এ সভামধ্যে আসিবে না বা এ সভায় এ সকল কথা বলিতে পারিবে না। গঙ্গারাম বলিল, "অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর কথায় যদি আমি দোষী হই, আমাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন।"

রাজা অন্তঃপুর অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। তখন গঙ্গারাম সবিস্ময়ে দেখিল, অতি ধীরে ধীরে সশঙ্কিত শিশুর মত, এক মলিনবেশধারিণী অবগুণ্ঠনবতী রমণী সভামধ্যে আসিতেছে। যে রূপ, গঙ্গারামের হাড়ে হাড়ে আঁকা, তাহা দেখিয়াই চিনিল। গঙ্গারাম বড় শঙ্কিত হইল। দর্শকমণ্ডলী-মধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। শান্তিরক্ষকেরা তাহাদের থামাইল।

রমা আসিয়া আগে রাজাকে, পরে গুরু চন্দ্রচূড়কে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইল—মলিন বেশেও রূপরাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। চন্দ্রচূড় দেখিল, রাজা কথা কহিতে পারিতেছেন না—অধোবদনে আছেন। তখন চন্দ্রচূড় রমাকে বলিলেন, "মহারাণী! এই গঙ্গারামের বিচার হইতেছে। এ ব্যক্তি কখন আপনার অন্তঃপুরে গিয়াছিল কি না, গিয়া থাকে, তবে কেন গিয়াছিল, আপনার সঙ্গে

কি কি কথা হইয়াছিল, সব স্বরূপ বলুন। রাজার আজ্ঞা, আর আমি তোমার গুরু, আমারও আজ্ঞা, সকল কথা সত্য বলিবে।"

রমা গ্রীবা উন্নত করিয়া গুরুকে বলিল, "রাজার রাণীতে কখনও মিথ্যা বলে না। আমরা যদি মিথ্যাবাদিনী হইতাম, তবে এই সিংহাসন এত দিন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত।"

দর্শকমণ্ডলী বাহির হইতে জয়ধ্বনি দিল—"জয় মহারাণীজিকী!"

রমা সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, "বলিব কি গুরুদেব! আমি রাজার মহিষী—রাজার ভৃত্য, আমার ভৃত্য—আমি যে আজ্ঞা করিব—রাজার ভৃত্য তা কেন পালন করিবে না? আমি রাজকার্য্যের জন্য কোতোয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম—কোতোয়াল আসিয়া আজ্ঞা শুনিয়া গিয়াছিল—তার আর বিচারই বা কেন, আমি বলিবই বা কি?"

কথা শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী এবার আর জয়ধ্বনি করিল না—অনেকে বিষণ্ণ হইল—অনেকে বলিল, "কবুল।" চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এমন কি রাজকার্য্য মা! যে, রাত্রিতে কোতোয়ালকে ডাকিতে হয়?"

রমা তখন বলিল, "তবে সকল কথা শুনুন।" এই বলিয়া রমা দেখিল, পুত্র কোথা? পুত্র সুসজ্জিত হইয়া ধাত্রীক্রোড়ে। মুখ দেখিয়া সাহস পাইল। তখন রমা সবিশেষ বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমে অতি ধীরে ধীরে, অতি দূরাগত সঙ্গীতের মত, রমা বলিতে লাগিল—সকলে শুনিতে পাইল না। বাহিরের দর্শকমণ্ডলী বলিতে লাগিল, "মা! আমরা শুনিতে পাইতেছি না—আমরা শুনিব।" রমা আরও একটু স্পষ্ট বলিতে লাগিল। ক্রমে আরও স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট। তার পর যখন রমা পুত্রের বিপদ্ শঙ্কায় এই সাহসের কাজ করিয়াছিল, এই কথা বুঝাইতে লাগিল—যখন একবার একবার সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিল, আর অশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া, মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল—তখন পরিষ্কার স্বর্গীয়, অপ্সরোনিন্দিত তিন গ্রাম সংমিলিত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের মত শ্রোতৃগণের কর্ণে সেই মুগ্ধকর বাক্য বাজিতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তার পর সহসা রমা, ধাত্রী-ক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া, সীতারামের পদতলে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া, যুক্তকরে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আপনার আরও সন্তান আছে—

আমার আর নাই! মহারাজ! আপনার রাজ্য আছে—আমার রাজ্য এই শিশু। মহারাজ! তোমার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই—মহারাজ! অপরাধিনী হইয়া থাকি, তবে দণ্ড করুন—" শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী অশ্রুপূর্ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু লোক ভাল মন্দ দুই রকমই আছে—অনেকেই জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—কিন্তু আবার অনেকেই তাহাতে যোগ দিল না। জয়ধ্বনি ফুরাইলে তাহারা কেহ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "আমার ত এ কথায় বিশ্বাস হয় না।" কোন বর্ষীয়সী বলিল, "পোড়া কপাল! রাত্রে মানুষ ডাকিয়া নিয়া গিয়াছেন—উনি আবার সতী!" কেহ বলিল, "রাজা এ কথায় ভুলেন ভুলুন—আমরা এ কথায় ভুলিব না।" কেহ বলিল, "রাণী হইয়া যদি উনি এই কাজ করিবেন, তবে আমরা গরিব দুঃখী কি না করিব?"

এ সকল কথা সীতারামের কাণে গেল। তখন রাজা রমাকে বলিলেন, "প্রজাবর্গ সকলে ত তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছে না।"

রমা কিছুক্ষণ মুখ অবনত করিয়া রহিল। চক্ষুতে প্রবল বারিধারা বহিল—তার পর রমা সামলাইল। তখন মুখ তুলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "যখন লোকের বিশ্বাস হইল না, তখন আমার একমাত্র গতি—আপনার রাজপুরীর কলঙ্কস্বরূপ এ জীবন আর রাখিতে পারিব না। আপনি চিতা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিন—আমি সকলের সম্মুখেই পুড়িয়া মরি। দুঃখ তাহাতে কিছু নাই। লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিল—মরিলেই সে দুঃখ গেল। কিন্তু এক নিবেদন মহারাজ! আপনিও কি আমাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিতেছেন? তাহা হইলে বুঝি—(আবার রমার চক্ষুতে জলের ধারা ছুটিল,)—বুঝি আমার পুড়িয়া মরাও বৃথা হইবে। তুমি যদি এই লোকসমারোহের সম্মুখে বল যে, আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস নাই—তাহা হইলে আমি সেই চিতাই স্বর্গ মনে করিব। মহারাজ! পরলোকের উদ্ধারকর্ত্তা, ভূদেব তুল্য আমার গুরুদেব এই সম্মুখে। আমি তাঁহার সম্মুখে, ইষ্টদেবকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। যিনি গুরুর অপেক্ষাও আমার পূজ্য, যিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতার অপেক্ষা আমার পূজ্য, সেই পতিদেবতা, আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে—আমি

পতিদেবতাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। মহারাজ! এই নারীদেহ ধারণ করিয়া যে কিছু দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা, দান ব্রত নিয়ম করিয়াছি, যদি আমি বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া থাকি, তবে সে সকলেরই ফলে যেন বঞ্চিত হই। পতিসেবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর পুণ্য নাই, কায়মনোবাক্যে আমি যে আপনার চরণসেবা করিয়াছি, তাহা আপনিই জানেন,—আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে আমি যেন সে পুণ্যফলে বঞ্চিত হই। আমি ইহজীবনে যে কিছু আশা, যে কিছু ভরসা, যে কিছু কামনা, যে কিছু মানস করিয়াছি,—আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, সকলই যেন নিষ্ফল হয়। মহারাজ! নারীজন্মে স্বামিসন্দর্শনের তুল্য পুণ্যও নাই, সুখও নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, যেন ইহজন্মে আমি সে সুখে চিরবঞ্চিত হই। যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটাইয়াছি—যাহার তুলনায় জগতে আমার আর কিছুই নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হই, আমি যেন সেই পুত্রমুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই। মহারাজ! আর কি বলিব—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে জন্মে জন্মে যেন নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া, জন্মে জন্মে স্বামিপুত্রের মুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই।”

রমা আর বলিতে পারিল না—ছিন্ন লতার মত সভাতলে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা হইল—ধাত্রীগণে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে বহিয়া লইয়া গেল। ধাত্রীক্রোড়স্থ শিশু মার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল; সভাতলস্থ সকলে অশ্রুমোচন করিল। গঙ্গারামের করচরণস্থিত শৃঙ্খলে ঝঞ্চনা বাজিয়া উঠিল। দর্শকমণ্ডলী বাত্যাপীড়িত সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া মহান্ কোলাহল সমুত্থিত করিল—রক্ষিবর্গ কিছুই নিবারণ করিতে পারিল না।

তখন “গঙ্গারাম কি বলে?” “গঙ্গারাম কি এ কথা মিছা বলে?” “গঙ্গারাম যদি মিছা বলে, তবে আইস, আমরা সকলে মিলিয়া গঙ্গারামকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি।” এইরূপ রব চারি দিক্ হইতে উঠিতে লাগিল। গঙ্গারাম দেখিল, এই সময়ে লোকের মন ফিরাইতে না পারিলে, তাহার আর রক্ষা নাই। গঙ্গারাম বুদ্ধিমান্, বুঝিয়াছিল যে, প্রজাবর্গ যেমন নিষ্পত্তি করিবে, রাজাও সেই মত করিবেন। তখন সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া লোকের মনভুলান কথা বলিতে আরম্ভ করিল, “মহারাজ! কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন—না আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন?

প্রভু! আপনার এই রাজ্য কি স্ত্রীলোকে সংস্থাপিত করিয়াছে—না আমার ন্যায় রাজভৃত্যদিগের বাহুবলে স্থাপিত হইয়াছে? মহারাজ! সকল স্ত্রীলোকেই বিপথগামিনী হইতে পারে, রাজরাণীরাও বিপথগামিনী হইয়া থাকেন; রাজরাণী বিপথগামিনী হইলে রাজার কর্ত্তব্য যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। বিশ্বাসী ভৃত্য কখনও বিপথগামী হয় না; তবে স্ত্রীলোকে আপনার দোষ ক্ষালন জন্য ভৃত্যের ঘাড়ে চাপ দিতে পারে। এই মহারাণী রাত্রিতে কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে দোষী করিতেছেন, তাহার স্থিরতা —মহারাজ, রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

কথা কহিতে কহিতে গঙ্গারাম কথা সমাপ্ত না করিয়া,—অতিশয় ভীত হইয়া, "মহারাজ, রক্ষা কর! রক্ষা কর!" এই শব্দ করিয়া স্তম্ভিত বিহ্বলের মত হইয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে দেখিল, গঙ্গারাম থর থর কাঁপিতেছে। তখন সমস্ত জনমণ্ডলী সবিস্ময়ে সভয়ে চাহিয়া দেখিল— অপূর্ব্বমূর্ত্তি! জটাজূটবিলম্বিনী, গৈরিকধারিণী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী দুর্গা তুল্য, ত্রিশূল হস্তে, গঙ্গারামকে ত্রিশূলাগ্রভাগে লক্ষ্য করিয়া, প্রখরগমনে তাহার অভিমুখে সভামণ্ডপ পার হইয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র সেই সাগরবৎ সংক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী একেবারে নিস্তব্ধ হইল। গঙ্গারাম একদিন রাত্রিতে সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল—আবার এই বিপৎকালে, যখন মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা নিরপরাধিনী রমার সর্ব্বনাশ করিতে সে উদ্যত, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, চণ্ডী তাহাকে বধ করিতে আসিতেছেন বিবেচনা করিয়া, ভয়ে কাতর হইয়া "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" শব্দ করিয়া উঠিল। এ দিকে রাজা, ও দিকে চন্দ্রচূড়, সেই রাত্রিদৃষ্ট দেবীতুল্য মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিলেন, এবং নগরের রাজলক্ষ্মী মনে করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন সভাস্থ সকলেই গাত্রোত্থান করিল।

জয়ন্তী কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া, খরপদে গঙ্গারামের নিকট আসিয়া, গঙ্গারামের বক্ষে সেই মন্ত্রপূত ত্রিশূলাগ্রভাগ স্থাপন করিল। কথার মধ্যে কেবল বলিল, "এখন বল।"

ত্রিশূল গঙ্গারামের গাত্র স্পর্শ করিল মাত্র, তথাপি গঙ্গারামের শরীর হঠাৎ অবসন্ন হইয়া আসিল, গঙ্গারাম মনে করিল, আর একটি মিথ্যা কথা বলিলেই এই ত্রিশূল আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে। গঙ্গারাম তখন সভয়ে,

বিনীতভাবে, সত্য বৃত্তান্ত সভাসমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ না তাহার কথা সমাপ্ত হইল, ততক্ষণ জয়ন্তী তাহার হৃদয় ত্রিশূলাগ্রভাগের দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিল। গঙ্গারাম তখন রমার নির্দ্দোষিতা, আপনার মোহ, লোভ, ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ, কথোপকথন এবং বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা সমুদায় সাবিস্তারে কহিল।

জয়ন্তী তখন ত্রিশূল লইয়া খরপদে চলিয়া গেল। গমনকালে সভাস্থ সকলেই নতশিরে সেই দেবীতুল্য মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার অনুসরণ করিতে সাহস পাইল না। সে কোন্ দিকে কোথায় চলিয়া গেল, কেহ সন্ধান করিল না।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে রাজা, গঙ্গারামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আপন মুখে সকল অপরাধ স্বীকৃত হইলে। এরূপ কৃতঘ্নের মৃত্যু ভিন্ন অন্য দণ্ড উপযুক্ত নহে। অতএব তুমি রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও।"

গঙ্গারাম দ্বিরুক্তি করিল না। প্রহরীরা তাহাকে লইয়া গেল। বধদণ্ডের আজ্ঞা শুনিয়া সকল লোক স্তম্ভিত হইয়াছিল। কেহ কিছু বলিল না। নীরবে সকলে আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। গৃহে গিয়া সকলেই রমাকে "সাক্ষাৎ লক্ষ্মী" বলিয়া প্রশংসা করিল। রমার আর কোন কলঙ্ক রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজা মুরলাকে মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, নগরের বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। সে হুকুম তখনই তামিল হইল। মুরলার নির্গমন কালে এক পাল ছেলে, এবং অন্যান্য রসিক লোক দল বাঁধিয়া করতালি দিতে দিতে এবং গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

গঙ্গারামের ন্যায় কৃতঘ্নের পক্ষে, শূলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড তখনকার রাজনীতিতে ব্যবস্থিত ছিল না। অতএব তাহার প্রতি সেই আজ্ঞাই হইল। কিন্তু গঙ্গারামের মৃত্যু আপাততঃ দিনকতক স্থগিত রাখিতে হইল। কেন না, সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত। সীতারাম নিজ বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেক হয় নাই। হিন্দু-

শাস্ত্রানুসারে তাহা হওয়া উচিত। চন্দ্রচূড় ঠাকুর এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে, সীতারাম তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এরূপ একটা মহোৎসবের দ্বারা প্রজাবর্গ পরিতুষ্ট হইলে তাহাদের রাজভক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। অতএব বিশেষ সমারোহের সহিত অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবার কল্পনা হইতেছিল। নন্দা এবং চন্দ্রচূড়, উভয়েই এক্ষণে সীতারামকে অনুরোধ করিলেন যে, এখন একটা মাঙ্গলিক ক্রিয়া উপস্থিত, এখন গঙ্গারামের বধরূপ অশুভ কর্ম্মটা করা বিধেয় নহে; তাহাতে অমঙ্গলও যদি না হয়, লোকের আনন্দেরও লাঘব হইতে পারে। এ কথায় রাজা সম্মত হইলেন। ভিতরের আসল কথা এই যে, গঙ্গারামকে শূলে দিতে সীতারামের আন্তরিক ইচ্ছা নহে, তবে রাজধর্ম্ম পালন ও রাজ্য শাসন জন্যই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাহা স্থির করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল না, তাহার কারণ—গঙ্গারাম শ্রীর ভাই। শ্রীকে সীতারাম ভুলেন নাই, তবে এত দিন ধরিয়া তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া, নিরাশ হইয়া বিষয়কর্ম্মে চিত্তনিবেশ করিয়া শ্রীকে ভুলিবেন, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। অতএব আবার রাজ্যের উপর তিনি মন স্থির করিতেছিলেন। সেই জন্যই দিল্লীতে গিয়া, বাদশাহের দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। এবং বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া সনদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই জন্য উৎসাহ সহকারে সংগ্রাম করিয়া ভূষণা অধিকার করিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণ বাঙ্গালায় এক্ষণে একাধিপত্য প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রী এখনও হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারিণী! অতএব গঙ্গারামের শূলে যাওয়া এখন স্থগিত রহিল।

এ দিকে অভিষেকের বড় ধুম পড়িয়া গেল। অত্যন্ত সমারোহ—অত্যন্ত গোলযোগ, দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া নগর পরিপূর্ণ করিল—রাজা, রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, দৈবজ্ঞ, ইতর, ভদ্র, আহূত, অনাহূত, রবাহূত, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, সাধু, অসাধুতে নগরে আর স্থান হয় না। এই অসংখ্য জনমণ্ডলের কর্ম্মের মধ্যে প্রতিনিয়ত আহার। ভক্ষ্য ভোজ্য লুচি সন্দেশ দধির ছড়াছড়িতে সহরে এক হাঁটু কাদা হইয়া উঠিল, পাতা কাটার জ্বালায় সীতারামের রাজ্যের সব কলাগাছ নিষ্পত্র হইল, ভাঙ্গা ভাঁড় ও ছেঁড়া কলাপাতে গড়খাই ও মধুমতী বুজিয়া উঠিবার গোছ হইয়া উঠিল। অহরহ বাদ্য ও নৃত্য গীতের দৌরাত্ম্যে ছেলেদের পর্য্যন্ত মাথা গরম হইয়া উঠিল।

এই অভিষেকের মধ্যে একটা ব্যাপার দান। সীতারাম অভিষেকের দিনে সমস্ত দিবস, কখনও স্বহস্তে, কখনও আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে ভৃত্যহস্তে, সুবর্ণ, রজত, তৈজস এবং বস্ত্রদান করিতে লাগিলেন। এত লোক আসিয়াছিল যে, সমস্ত দিনে দান ফুরাইল না। অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ দান করিয়া সীতারাম আর পারিয়া উঠিলেন না। অবশিষ্ট লোকের বিদায় জন্য রাজ-পুরুষদিগের উপর ভার দিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন। যাইতে সভয়ে, সবিস্ময়ে, অন্তঃপুরদ্বারে দেখিলেন যে, সেই ত্রিশূলধারিণী সুবর্ণময়ী রাজলক্ষ্মীমূর্ত্তি।

রাজা ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! আপনি কে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! আমি ভিখারিণী। আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিয়াছি।"

রাজা। মা! কেন আমায় ছলনা করেন? আপনি দেবী, আমি চিনিয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ কমলা—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জয়ন্তী। মহারাজ! আমি সামান্য মানুষী। নহিলে আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিতাম না। শুনিলাম, আজ যে যাহা চাহিতেছে, আপনি তাহাকে তাই দিতেছেন। আমার আশা বড়, কিন্তু যার এমন দান, তার কাছে আশা নিষ্ফলা হইবে না মনে করিয়া আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন, "মা, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আপনি একবার আমার রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, দ্বিতীয় বারে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, আপনি দেবীই হউন, আর মানবীই হউন—আপনাকে সকলই আমার দেয়। কি বস্তু কামনা করেন, আজ্ঞা করুন, আমি এখনই আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।"

জয়ন্তী। মহারাজ! গঙ্গারামের বধদণ্ডের বিধান হইয়াছে। কিন্তু এখনও সে মরে নাই। আমি তার জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

রাজা। আপনি!

জয়ন্তী। কেন মহারাজ? অসম্ভাবনা কি?

রাজা। গঙ্গারাম কীটাণুকীট—আপনার তার প্রতি দয়া কিসে হইল?

জয়ন্তী। আমরা ভিখারী—আমাদের কাছে সবাই সমান।

রাজা। কিন্তু আপনিই ত তাহাকে ত্রিশূল বিঁধিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন—আপনা হইতেই দুই বার তাহার অসদভিসন্ধি ধরা পড়িয়াছে। বলিতে কি, আপনি মহারাণীর প্রতি দয়াবতী না হইলে সে সত্য স্বীকার করিত না, তাহার বধদণ্ড হইত না। এখন তাহার অন্যথা করিতে চান কেন?

জয়ন্তী। মহারাজ! আমা হইতে ইহা ঘটিয়াছে বলিয়াই তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি। ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য ত্রিশূলাঘাতে অধর্ম্মাচারীর প্রাণবিনাশেও দোষ বিবেচনা করি না, কিন্তু ধর্ম্মের এখন রক্ষা হইয়াছে, এখন প্রাণিহত্যা-পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। গঙ্গারামের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

রাজা। আপনাকে অদেয় কিছুই নাই। আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা দিলাম। গঙ্গারাম এখনই মুক্ত হইবে। কিন্তু মা! তোমাকে ভিক্ষা দিই, আমি তাহার যোগ্য নহি। আমি তোমায় ভিক্ষা দিব না। গঙ্গারামের জীবন তোমাকে বেচিব—মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

জয়ন্তী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) কি মূল্য মহারাজ! রাজভাণ্ডারে এমন কোন্ ধনের অভাব যে, ভিখারিণী তাহা দিতে পারিবে?

রাজা। রাজভাণ্ডারে নাই—রাজার জীবন। আপনি সেই মধুমতীতীরে ঘাটের উপর কামানের নিকট দাঁড়াইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আমি যাহা খুঁজি, তাহা পাইব। সে অমূল্য সামগ্রী আমাকে দিন—সেই মূল্যে আজ গঙ্গারামের জীবন আপনার নিকট বেচিব।

জয়ন্তী। কি সে অমূল্য সামগ্রী মহারাজ? আপনি রাজ্য পাইয়াছেন।

রাজা। যাহার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিতে পারি, তাই চাহিতেছি।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ?

রাজা। শ্রী নামে আমার প্রথমা মহিষী আমার জীবনস্বরূপ। আপনি দেবী, সব দিতে পারেন। আমার জীবন আমায় দিয়া, সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন কিনিয়া লউন।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ! আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা রাজাধিরাজের জীবনের সঙ্গে সেই নরাধম পাপাত্মার জীবনের কি বিনিময় হয়? মহারাজ! কাণা কড়ির বিনিময়ে রত্নাকর?

রাজা। মা! জননী যত দেন, ছেলে কি মাকে কখনও তত দিতে পারে!

জয়ন্তী। মহারাজ! আপনি আজ অন্তঃপুর দ্বার সকল মুক্ত রাখিবেন; আর অন্তঃপুরের প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন, ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রিতেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হৌক।

রাজা হর্ষে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "গঙ্গারামের এখনই মুক্তি দিতেছি।" এই বলিয়া অনুচরবর্গকে সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

জয়ন্তী বলিলেন, "আমি এই অনুচরদিগের সঙ্গে গঙ্গারামের কারাগারে যাইতে পারি কি?"

রাজা। আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আপনার নিষেধ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে কূপের ন্যায় নিম্ন আর্দ্র, বায়ুশূন্য কারাগৃহমধ্যে, গঙ্গারাম শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া একা পড়িয়া আছে। সেই নিশীথকালেও তাহার নিদ্রা নাই—যে পর্য্যন্ত সে শুনিয়াছে যে, তাহাকে শূলে যাইতে হইবে, সেই পর্য্যন্ত আর সে ঘুমায় নাই—আহার নিদ্রা সকলই বন্ধ। এক দণ্ডে মরা যায়, মৃত্যু তত বড় কঠিন দণ্ড নহে; কিন্তু কারাগৃহে একাকী পড়িয়া দিবারাত্র সম্মুখেই মৃত্যুদণ্ড, ইতি ভাবনা করার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আর কিছুই নাই। গঙ্গারাম পলকে পলকে শূলে যাইতেছিল। দণ্ডের আর তাহার কিছু অধিক বাকি নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া, চিত্তবৃত্তি সকল প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। মন অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছিল—ক্লেশ অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন তিরোহিত হইয়াছিল। মনের মধ্যে কেবল দুটি ভাব এখনও জাগরিত ছিল—ভৈরবীকে ভয়, আর রমার উপর রাগ। ভয়ের অপেক্ষা, এই রাগই প্রবল। গঙ্গারাম, আর রমার প্রতি আসক্ত নহে, এখন রমার তেমন আন্তরিক শত্রু আর কেহ নহে।

গঙ্গারাম এখন রমাকে সম্মুখে পাইলে নখে বিদীর্ণ করিতে প্রস্তুত। গঙ্গারামের যখন কিছু চিন্তাশক্তি হইল, তখন কি উপায়ে মরিবার সময়ে

রমার সর্ব্বনাশ করিয়া মরিতে পারিবে, গঙ্গারাম তাহাই ভাবিতেছিল। শূলতলে দাঁড়াইয়া রমার সম্বন্ধে কি অশ্লীল অপবাদ দিয়া যাইবে, গঙ্গারাম তাহাই কখন কখন ভাবিত। অন্য সময়ে জড়পিণ্ডের মত স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া থাকিত। কেবল মধ্যে মধ্যে বাহিরে অভিষেকের উৎসবের মহৎ কোলাহল শুনিত। যে পাচক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাহার নুন ভাত লইয়া আসিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গঙ্গারাম উৎসবের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল। শুনিল যে, রাজ্যের সমস্ত লোক অতি বৃহৎ উৎসবে নিমগ্ন—কেবল সেই একা অন্ধকারে আর্দ্র ভূমিতে মূষিকদষ্ট হইয়া, কীটপতঙ্গপীড়িত হইয়া, শৃঙ্খলভার বহন করিতেছে। মনে মনে বলিতে লাগিল, রমার কবে এই রকম স্থান মিলিবে!

যেমন অন্ধকারে বিদ্যুৎ জ্বলে, তেমনি গঙ্গারামের একটা কথা মনে পড়িত, যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত! শ্রী একবার প্রাণভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল, আবার ভিক্ষা চাহিলে কি ভিক্ষা পাইত না! আমি যত পাপী হই না কেন, শ্রী কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিত না। এমন ভগিনীও মরিল!

দুই প্রহর রাত্রিতে ঝঞ্জনা বাজাইয়া কারাগৃহের বাহিরের শিকল খুলিল। গঙ্গারামের প্রাণ শুকাইল—এত রাত্রিতে কেন শিকল খুলিতেছে! আরও কিছু নূতন বিপদ আছে না কি?

অগ্রে রাজপুরুষেরা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। গঙ্গারাম স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তাহার পর জয়ন্তীকে দেখিল—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমি কি করিয়াছি?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! কি করিয়াছ তাহা জান। কিন্তু তুমি রক্ষা পাইবে। শ্রীকে মনে আছে কি?"

গঙ্গা। শ্রী! যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত!

জয়ন্তী। শ্রী বাঁচিয়া আছে। তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। ভিক্ষা পাইয়াছি। তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। পলাও গঙ্গারাম! কাল প্রভাতে এ রাজ্যে আর মুখ দেখাইও না। দেখাইলে আর তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না।

গঙ্গারাম বুঝিতে পারিল কি না, সন্দেহ। বিশ্বাস করিল না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু দেখিল যে, রাজপুরুষেরা বেড়ী খুলিতে লাগিল। গঙ্গারাম নীরবে দেখিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা! রক্ষা করিলে কি?"

জয়ন্তী বলিলেন, "বেড়ী খুলিয়াছে। চলিয়া যাও।"

গঙ্গারাম ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই রাত্রিতেই নগর ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের মুক্তির আজ্ঞা প্রচার করিয়া, জয়ন্তীর আজ্ঞা মত দ্বার মুক্ত রাখিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, রাজা শয্যাগৃহে আসিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। নন্দা তখনই আসিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা কেমন আছে?"

রমার পীড়া। সে কথা পরে বলিব। নন্দা উত্তর করিল, "কই—কিছু বিশেষ হইতে ত দেখিলাম না।"

রাজা। আমি এত রাত্রিতে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি; তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও—তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনি যত্ন করিও; আর আমি যে জন্য যাইতে পারিলাম না, তাহাও বলিও।

কথাটা শুনিয়া পাঠক সীতারামকে ধিক্কার দিবেন। কিন্তু সে সীতারাম আর নাই। যে সীতারাম হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, সে সীতারাম রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকে খুঁজিয়া বেড়াইল। যে সীতারাম আপনার প্রাণ দিয়া শরণাগত বলিয়া গঙ্গারামের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়াছিলেন—সেই সীতারাম রাজা হইয়া, রাজদণ্ডপ্রণেতা হইয়া, শ্রীর লোভে গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিল। যে লোকবৎসল ছিল, সে এখন আত্মবৎসল হইতেছে।

নন্দা বুঝিল, প্রভু আজ একা থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। নন্দা আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সীতারাম তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া শ্রীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সীতারাম সমস্ত দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত ছিলেন। অন্য দিন হইলে পড়িতেন আর নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। কিন্তু আজ স্বতন্ত্র কথা—যাহার জন্য রাজ্যসুখ বা রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া এত কাল ধরিয়া দেশে দেশে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়াছেন, যাহার চিন্তা অগ্নিস্বরূপ দিবারাত্র হৃদয় দাহ করিতেছিল, তাহার সাক্ষাৎলাভ হইবে। সীতারাম জাগিয়া রহিলেন।

কিন্তু নিদ্রাদেবীও ভুবন-বিজয়িনী। যে যতই বিপদাপন্ন হউক না কেন, এক সময়ে না এক সময়ে তাহারও নিদ্রা আসে। সীতারাম বিপদাপন্ন নহেন, সুখের আশায় নিমগ্ন, সীতারামের একবার তন্দ্রা আসিল। কিন্তু মনের ততটা চাঞ্চল্য থাকিলে তন্দ্রাও বেশী ক্ষণ থাকে না। ক্ষণকাল মধ্যেই সীতারামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল—চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে গৈরিকবস্ত্র রুদ্রাক্ষ-ভূষিতা মুক্ত-কুন্তলা কমনীয়া মূর্ত্তি!

সীতারাম প্রথমে জয়ন্তী মনে করিয়া অতি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই? শ্রী কই?" কিন্তু তখনই দেখিলেন, জয়ন্তী নহে, শ্রী।

তখন চিনিয়া, "শ্রী! শ্রী! ও শ্রী! আমার শ্রী!" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাহু প্রসারণ করিলেন। কিন্তু কেমন মাথা ঘুরিয়া গেল—চক্ষু বুজিয়া রাজা আবার শুইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনিই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

তখন সীতারাম, ঊর্দ্ধমুখে, স্পন্দিততারলোচনে, অতৃপ্তদৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা নাই—যেন বা নয়নের তৃপ্তি না হইলে কথার স্ফূর্ত্তি সম্ভাবিত হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে—যেন তাঁহার আনন্দ-প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আর তত প্রফুল্ল রহিল না—একটা নিশ্বাস পড়িল। রাজা, আমার শ্রী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন যে, স্থিরমূর্ত্তি, অবিচলিতধৈর্য্য-সম্পন্না, অশ্রুবিন্দুমাত্রশূন্যা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, মহামহিমাময়ী, এ যে দেবীপ্রতিমা! বুঝি এ শ্রী নহে!

হায়! মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল—দেবী লইয়া কি করিবে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজার কথা শ্রী সব শুনিল, শ্রীর কথা রাজা সব শুনিলেন। যেমন করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া সীতারাম শ্রীর জন্য পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সীতারাম তাহা বলিলেন। শ্রী আপনার কথাও কতক কতক বলিল, সকল বলিল না।

তার পর, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে ?"

প্রশ্ন শুনিয়া সীতারামের নয়নে জল আসিল। চিরজীবনের পর স্বামীকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি না, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে ?" সীতারামের মনে হইল, উত্তর করেন, "কড়িকাঠে দড়ি ঝুলাইয়া দিবে, আমি গলায় দিব।"

তাহা না বলিয়া সীতারাম বলিলেন, "আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আমার মহিষী খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। এখন তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো করিবে।"

শ্রী। মহারাজ! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনিয়াছি। তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি তেমন মহিষী পাইয়াছ। অন্য মহিষীর কামনা করিও না।

সীতা। তুমি জ্যেষ্ঠা। নন্দা যেমন হোক, তোমার পদ তুমি গ্রহণ করিবে না কেন ?

শ্রী। যে দিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।

সীতারাম। সে কি ? কেন গিয়াছে ? কিসে গিয়াছে ?

শ্রী। আমি সন্ন্যাসিনী ; সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

সীতারাম। পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতিসেবাই তোমার ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে ; দেবসেবাও তাহার ধর্ম্ম নহে।

সীতা। সর্ব্ব কর্ম্ম কেহ ত্যাগ করিতে পারে না ; তুমিও পার নাই। গঙ্গারামের জীবন রক্ষা করিয়া কি তুমি কর্ম্ম করিলে না ? আমাকে দেখা দিয়া তুমি কি কর্ম্ম করিলে না ?

শ্রী। করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে, একবার ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া এখন চিরকাল ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে বল ?

সীতা। স্বামিসহবাস স্ত্রীজাতির পক্ষে ধর্ম্মভ্রংশ, এমন কুশিক্ষা তোমায় কে দিল? যেই দিক, ইহার উপায় আমার হাতে আছে। আমি তোমার স্বামী, তোমার উপর আমার অধিকার আছে। সেই অধিকার বলে, আমি তোমাকে আর যাইতে দিব না।

শ্রী। তুমি স্বামী, আর তুমি রাজা। তা ছাড়া তুমি উপকারী, আমি উপকৃত। অতএব তুমি যাইতে না দিলে আমি যাইতে পারিব না।

সীতা। আমি স্বামী, আমি রাজা, আর আমি উপকারী, তাই আমি যাইতে না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না। বলিতেছ না কেন, আমি তোমায় ভালবাসি, তাই আমি ছাড়িয়া না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না? স্নেহের সোণার শিকল কাটিবে কি প্রকারে?

শ্রী। মহারাজ! সে ভ্রমটা এখন গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, যে ভালবাসে, ভালবাসায় তাহার ধর্ম্ম এবং সুখ আছে। কিন্তু যে ভালবাসা পায়, তাহার তাতে কি? তুমি মাটির ঠাকুর গড়িয়া, তাহাতে পুষ্পচন্দন দাও, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম আছে, সুখও আছে, কিন্তু তাহাতে মাটির পুতুলের কি?

সীতা। কি ভয়ানক কথা!

শ্রী। ভয়ানক নহে—অমৃতময় কথা। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভাল বাসিবে। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার, তাঁর সুখ দুঃখ নাই। ঈশ্বরের অংশস্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তাঁহারও তাই। ঈশ্বরে অর্পিত যে প্রীতি, তাহাতে তাঁহার সুখ দুঃখ নাই। তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়ার বিক্ষেপ।

সীতা। শ্রী! দেখিতেছি কোন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া তুমি স্ত্রীবুদ্ধিবশতঃ কতকগুলা বাজে কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছ। ও সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নহে। ভাল যা, তা বলিতেছি, শুন। আমি তোমার স্বামী, আমার সহবাসই তোমার ধর্ম্ম; তোমার ধর্ম্মান্তর নাই। আমি রাজা, সকলেরই ধর্ম্মরক্ষা আমার কর্ম্ম; এবং স্বামীরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, স্ত্রীকে ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী করে। অতএব তোমার ধর্ম্মে আমি তোমাকে প্রবৃত্ত করিব। তোমাকে যাইতে দিব না।

শ্রী। তা বলিয়াছি. তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কেবল আমার এইটুকু বলিয়া রাখা যে, আমা হইতে তুমি সুখী হইবে না।

সীতা। তোমাকে দেখিলেই আমি সুখী হইব।

শ্রী। আর এক ভিক্ষা এই, যদি আমাকে গৃহে থাকিতে হইল, তবে আমাকে এই রাজপুরীমধ্যে স্থান না দিয়া, আমাকে একটু পৃথক্ কুটীর তৈয়ার করিয়া দিবেন। আমি সন্ন্যাসিনী, রাজপুরীর ভিতর আমিও সুখী হইব না, লোকেও আপনাকে উপহাস করিবে।

সীতা। আর কুটীরে রাজমহিষীকে রাখিলে লোকে উপহাস করিবে না কি?

শ্রী। রাজমহিষী বলিয়া কেহ নাই জানিল।

সীতা। আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে না কি?

শ্রী। সে আপনার অভিরুচি।

সীতা। তোমার সঙ্গে আমি দেখা শুনা করিব, অথচ তুমি রাজমহিষী নও, লোকে তোমাকে কি বলিবে জান?

শ্রী। জানি বৈ কি! লোকে আমাকে রাজার উপপত্নী বিবেচনা করিবে। মহারাজ! আমি সন্ন্যাসিনী—আমার মান অপমান কিছুই নাই। বলে বলুক না। আমার মান অপমান আপনারই হাতে।

সী। সে কি রকম?

শ্রী। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিও না। ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখনও বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া, সহধর্ম্মিণীসহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রই পাপ। আপনি যখন নিষ্পাপ হইয়া, শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন, তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়িব। যত দিন আমি এ গেরুয়া না ছাড়িব, তত দিন মহারাজ! তোমাকে পৃথক্ আসনে বসিতে হইবে।

সী। আমি তোমার প্রভু, আমার কথাই চলিবে।

শ্রী। একবার চলিতে পারে, কেন না, তুমি বলবান্। কিন্তু আমারও এক বল আছে। আমি বনবাসিনী, বনে আমরা অনেক প্রকার বিপদে পড়ি। এমন বিপদ্ ঘটিতে পারে যে, তাহা হইতে উদ্ধার নাই। সে সময়ে আপনার রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে একটু বিষ রাখি। আমার নিকট বিষ আছে—আবশ্যক হইলে খাইব।

হায়! এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সীতারাম তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। মন কিছুতেই বুঝিল না। যাহার ভালবাসার জিনিষ মরিয়া যায়, সেও মৃত দেহের কাছে বসিয়া থাকে, কিছু ক্ষণ বিশ্বাস করে না যে, আর নিশ্বাস নাই। পাগল লিয়রের মত দর্পণ খুঁজিয়া বেড়ায়, দর্পণে নিশ্বাসের দাগ ধরে কি না। সীতারাম এত বৎসর ধরিয়া, মনোমধ্যে একটা শ্রীমূর্ত্তি গড়িয়া, তাহার আরাধনা করিয়াছিল। বাহিরে শ্রী যাই হৌক, ভিতরের শ্রী তেমনিই আছে। বাহিরের শ্রীকেই ত সীতারাম হৃদয়ে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বাহিরের শ্রী ত বাহিরেই আছে, তবে সে হৃদয়ের শ্রী হইতে ভিন্ন কিসে? ভিন্ন বলিয়া সীতারাম বারেক মাত্রও ভাবিতে পারিলেন না। লোকের বিশ্বাস আর সব যাই হৌক, লোকে মনে করে, মানুষ যা তাই থাকে। মানুষ যে কত বার মরে, তাহা আমরা বুঝি না। এক দেহেই কত বার যে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মনেও করি না। সীতারাম বুঝিল না যে, সে শ্রী মরিয়াছে, আর একটা শ্রী সেই দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে করিল যে, আমার শ্রী আমার শ্রীই আছে। তাই শ্রীর চড়া চড়া কথাগুলা কানে তুলিল না। তুলিবারও বড় শক্তি ছিল না। শ্রীকে ছাড়িলে সব ছাড়িতে হয়।

তা, শ্রী কিছুতেই রাজপুরীমধ্যে থাকিতে রাজি হইল না। তখন সীতারাম "চিত্তবিশ্রাম" নামে ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিল। রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক্ আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। ইহাতে রাজার পক্ষে বড় বিষময় ফল ফলিল।

আলাপটা কি রকম হইল মনে কর? রাজা বলিতেন ভালবাসার কথা, শ্রীর জন্য তিনি এতদিন যে দুঃখ পাইয়াছেন তাহার কথা, শ্রী ভিন্ন জীবনে তাঁহার আর কিছুই নাই সেই কথা। কত দেশে কত লোক পাঠাইয়াছেন, কত দেশে নিজে কত খুঁজিয়াছেন, সেই কথা। শ্রী বলিত, কত পর্ব্বতের কথা, কত অরণ্যের কথা, কত বন্য পশু পক্ষী ফল মূলের কথা, কত যতি পরমহংস ব্রহ্মচারীর কথা, কত ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্মের কথা, কত পৌরাণিক উপন্যাসের কথা, কত দেশবিদেশী রাজার কথা, কত দেশাচার লোকাচারের কথা।

শুনিতে শুনিতে, সেই পৃথক্ আসনে বসিয়াও রাজার বড় বিপদ্ হইল! কথাগুলি বড় মনোমোহিনী। যে বলে, সে আরও মনোমোহিনী। আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল। শ্রী ত চিরকালই মনোমোহিনী। যে শ্রী বৃক্ষবিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল হেলাইয়া রণজয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি হইতেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে;—শ্রীর শরীরের স্বাস্থ্য, এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছিল; তাই রূপও শতগুণে বাড়িয়াছিল। সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুষ্ক নয়—সর্ব্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, শীতল, সুবর্ণ,—শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য;—শরীর সম্পূর্ণ, সেই জন্য শ্রী প্রকৃতির মূর্ত্তিমতী শোভা। তার পর চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়,—কাজেই সেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটু মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই, সর্ব্বত্র সুমধুর, সহাস্য, সুখময়—এ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কাছে সে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কোথায় দাঁড়ায়! তাহার পর সেই মনোমোহিনী কথা—নানা দেশের, নানা বিষয়ের, নানাবিধ অশ্রুতপূর্ব্ব কথা, কখনও কৌতূহলের উদ্দীপক, কখনও মনোরঞ্জন, কখনও জ্ঞানগর্ভ—এই দুই মোহ একত্রে মিশিলে কোন্ অসিদ্ধ ব্যক্তির রক্ষা আছে? সীতারামের অনেক দিন ত আগুন জ্বলিয়াছিল, এখন ঘর পুড়িতে লাগিল। শ্রী হইতে সীতারামের সর্ব্বনাশ হইল।

প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তার পর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে

লাগিল। পৃথক্ আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম, চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন আহার এবং রাত্রিতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার বা শয়ন পৃথক্ গৃহে; শ্রীর বাঘছালের নিকটে ঘেঁষিতে পারিতেন না। ইহাতেও সাধ মিটিল না। প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিন দিন বেলা হইতে লাগিল। শ্রীর সঙ্গে ক্ষণেক প্রাতেও কথাবার্ত্তা না কহিয়া যাইতে পারিতেন না। যখন বড় বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক আহারটাও চিত্তবিশ্রামেই হইতে লাগিল। রাজা আহারান্তে একটু নিদ্রা দিয়া, বৈকালে একবার রাজকার্য্যের জন্য রাজবাড়ী যাইতেন। তার পর কোন দিন যাইতেন, কোন দিন বা কথায় কথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, যখন যাইতেন, তখনই একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিতেন, চিত্তবিশ্রাম ছাড়িয়া তিষ্ঠিতেন না। চিত্তবিশ্রামেই রাজা বাস করিতে লাগিলেন, কখন কখন রাজভবনে বেড়াইতে যাইতেন।

এ দিকে চিত্তবিশ্রামে কাহারও কোন কার্য্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কীটপতঙ্গও প্রবেশ করিতে পারিত না। কাজেই রাজকার্য্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ, দুই জন নিরীহ গৃহস্থ লোক, মহম্মদপুরে বাস করে। রামচাঁদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, প্রদোষকালে, নিভৃতে তামাকুর সাহায্যে দুই জন কথোপকথন করিতেছিল। কিয়দংশ পাঠককে শুনিতে হইবে।

রামচাঁদ। ভাল, ভায়া, বলিতে পার, চিত্তবিশ্রামের আসল ব্যাপারটা কি?

শ্যামচাঁদ। কি জান, দাদা, ও সব রাজা রাজড়ার হয়েই থাকে। আমাদের গৃহস্থ ঘরে কারই বা ছাড়া—তার আর রাজা রাজড়ার কথায় কাজ কি? তবে আমাদের মহারাজাকে ভাল বল্‌তে হবে—মাত্রায় বড় কম। মোটে এই এ একটি।

রাম। হাঁ, তা ত বটেই। তবে কি জান, আমাদের মহারাজা না কি সে রকম নয়, পরম ধার্ম্মিক, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা করি। বলি, এত কাল ত এ সব ছিল না।

শ্যাম। রাজাও আর সে রকম নাই, লোকে ত বলে। কি জান, মানুষ চিরকাল এক রকম থাকে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ বাড়িলে, মনটাও কিছু এ দিক্ ও দিক্ হয়! আগে আমরা রামরাজ্যে বাস করিতাম—ভূষণা দখল হ'য়ে অবধি কি আর তাই আছে?

রাম। তা বটে। তা আমার যেন বোধ হয় যে, চিত্তবিশ্রামের কাণ্ডটা হ'য়ে অবধিই যেন বাড়াবাড়ি ঘটেছে। তা মহারাজকে এমন বশ করাও সহজ ব্যাপার নয়। মাগীও ত সামান্যা নয়—কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসিল?

শ্যাম। শুনেছি, সেটা নাকি একটা ভৈরবী। কেউ কেউ বলে, সেটা ডাকিনী। ডাকিনীরা নানা মায়া জানে, মায়াতে ভৈরবী বেশ ধ'রে বেড়ায়। আবার কেউ বলে, তার একটা জোড়া আছে, সেটা উড়ে উড়ে বেড়ায়, তাকে বড় কেউ দেখিতে পায় না।

রাম। তবে ত বড় সর্ব্বনাশ! রাজ্য পড়িল ডাকিনীর হাতে। এ রাজ্যের কি আর মঙ্গল আছে?

শ্যাম। গতিকে ত বোধ হয় না। রাজা ত আর কাজ কর্ম্ম দেখেন না। যা করেন তর্কালঙ্কার ঠাকুর। তা তিনি লড়াই ঝগড়ার কি জানেন! এ দিকে না কি নবাবি ফৌজ শীঘ্র আসিবে।

রাম। আসে, মৃণ্ময় আছে।

শ্যাম। তুমিও যেমন দাদা! পরের কি কাজ! যার কর্ম্ম তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে। এই ত দেখ্‌লে, গঙ্গারাম দাস কি কর্‌লে? আবার কে জানে, মৃণ্ময় বা কি কর্‌বে? সে যদি মুসলমানের সঙ্গে মিশে যায়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথা? গোষ্ঠী শুদ্ধ জবাই হব দেখতে পাচ্চি।

রাম। তা বটে। তাই একে একে সব সরিতে আরম্ভ করেছে বটে! সে দিন তিলক ঘোষেরা উঠে যশোর গেল, তখন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কেন যাও? বলে, এখানে জিনিসপত্র মাগ্যি। এখনই ত আরও কয় ঘর আমাদের পাড়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

শ্যাম। তা দাদা, তোমার কাছে বল্‌ছি, প্রকাশ করিও না, আমিও শিগ্‌গির সরবো।

রামচাঁদ। বটে! তা আমিই পড়ে জবাই হই কেন? তবে কি জান, এই সব বাড়ী ঘর দ্বার খরচ পত্র করে করা গেছে, এখন ফেলে ঝেলে যাওয়া গরিব মানুষের বড় দায়।

শ্যামচাঁদ। তা কি করবে, প্রাণটা আগে, না বাড়ী ঘর আগে? ভাল, রাজ্য বজায় থাকে, আবার আসা যাবে। ঘর দ্বার ত পালাবে না।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রী। মহারাজ! তুমি ত সর্ব্বদাই চিত্তবিশ্রামে। রাজ্য করে কে?

সীতা। তুমিই আমার রাজ্য। তোমাতে যত সুখ, রাজ্যে কি তত সুখ!

শ্রী। ছি! ছি! মহারাজ! এই জন্য কি হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! আমার কাছে হিন্দুসাম্রাজ্য খাটো হইয়া গেল, ধর্ম্ম গেল, আমিই সব হইলাম! এই কি রাজা সীতারাম রায়?

সীতা। রাজ্য ত সংস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রী। টিকিবে কি?

সীতা। ভাঙ্গে কার সাধ্য?

শ্রী। তুমিই ভাঙ্গিতেছ। রাজার রাজ্য, আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমান। যত্নে রক্ষা না করিলে থাকে না।

সীতা। কৈ, অরক্ষাও ত হইতেছে না।

শ্রী। তুমি রাজ্য রক্ষা কর? তোমাকে ত আমার কাছেই দেখি।

সীতা। আমি রাজকর্ম্ম না দেখি, তা নয়। প্রায় প্রত্যহই রাজপুরীতে গিয়া থাকি। আমি এক দণ্ড দেখিলে যা হইবে, অন্যের সমস্ত দিনে তত হইবে না। তা ছাড়া, তর্কালঙ্কার ঠাকুর আছেন, মৃণ্ময় আছে, তাঁহারা সকল কর্ম্মে পটু। তাঁহারা থাকিতে কিছু না দেখিলেও চলে।

শ্রী। একবার ত তাঁহারা থাকিতে রাজ্য যাইতেছিল। দৈবাৎ তুমি সে রাত্রে না পৌঁছিলে রাজ্য থাকিত না। আবার কেন কেবল তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছ?

সীতা। আমি ত আছি। কোথাও যাই নাই। আবার বিপদ পড়ে, রক্ষা করিব।

শ্রী। যতক্ষণ এই বিশ্বাস থাকিবে, ততক্ষণ তুমি কোন যত্নই করিবে না। যত্ন ভিন্ন কোন কাজই সফল হয় না।

সী। যত্নের ত্রুটি কি দেখিলে?

শ্রী। আমি স্ত্রীজাতি, সন্ন্যাসী, আমি রাজকার্য্য কি বুঝি যে, সে কথার উত্তর দিতে পারি। তবে একটা বিষয়ে মনে বড় শঙ্কা হয়। মুর্শিদাবাদের সংবাদ পাইতেছেন কি? তোরাব্ খাঁ গেল, ভূষণা গেল, বারো ভুঁইয়া গেল, নবাব কি চুপ করিয়া আছে?

সী। সে ভাবনা করিও না। মুরশিদ কুলি যতক্ষণ মাল খাজনা ঠিক কিস্তী কিস্তী পাইবে, ততক্ষণ কিছু বলিবে না।

শ্রী। পাইতেছে কি?

সীতা। হাঁ, পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে বটে—তবে এবার দেওয়া যায় নাই, অনেক খরচ পত্র হইয়াছে।

শ্রী। তবে সে চুপ করিয়া আছে কি?

সীতারাম মাথা হেঁট করিয়া কিছু ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "সে কি করিবে, কি করিতেছে, তাহার কিছু সংবাদ পাই নাই।"

শ্রী। মহারাজ! চিত্তবিশ্রামে থাক বলিয়া কি সংবাদ লইতে ভুলিয়া গিয়াছ?

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় তাই। শ্রী! তোমার মুখ দেখিলে আমি সব ভুলিয়া যাই।"

শ্রী। তবে, আমার এক ভিক্ষা আছে। এ পোড়ার মুখ, আবার লুকাইতে হইবে। নহিলে সীতারাম রায়ের নামে কলঙ্ক হইবে; ধর্ম্মরাজ্য ছারে খারে যাইবে। আমায় হুকুম দাও, আমি বনে যাই।

সীতা। যা হয় হোক, আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। হয় তোমায় ছাড়িতে হইবে, নয় রাজ্য ছাড়িতে হইবে। আমি রাজ্য ছাড়িব, তোমায় ছাড়িব না।

শ্রী। তবে তাহাই করুন। রাজ্য কোন উপযুক্ত লোকের হাতে দিন। তার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমার সঙ্গে বনে চলুন।

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। রাজার তখন ভোগলালসা অত্যন্ত প্রবলা। আগে হইলে সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিতেন। এখন সে সীতারাম নাই; রাজ্যভোগে সীতারামের চিত্ত সমল হইয়াছে। সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেই যে সভাতলে রমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল, সেই অবধি রমা আর উঠে নাই। প্রাণপণ করিয়া আপনার সতী নাম রক্ষা করিয়াছিল। মান রক্ষা হইল, কিন্তু প্রাণ বুঝি গেল।

এখন রোগ পুরাতন হইয়াছে। কিন্তু গোড়া থেকে বলি। রাজার রাণীর চিকিৎসার অভাব হয় নাই। প্রথম হইতেই কবিরাজ যাতায়াত করিতে লাগিল। অনেকগুলা কবিরাজ রাজবাড়ীতে চাকরী করে, তত কর্ম্ম নাই, সচরাচর ভৃত্যবর্গকে মসলা খাওয়াইয়া, এবং পরিচারিকাকে পোষ্টাই দিয়া কালাতিপাত করে; এক্ষণে ছোট রাণীকে রোগী পাইয়া কবিরাজ মহাশয়েরা হঠাৎ বড় লোক হইয়া বসিলেন, তখন রোগনির্ণয় লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মূর্চ্ছা, বায়ু, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ ইত্যাদি নানাবিধ রোগের লক্ষণ শুনিতে শুনিতে রাজপুরুষেরা জ্বালাতন হইয়া উঠিল। কেহ নিদানের দোহাই দেন, কেহ বাগ্‌ভটের, কেহ চরকসংহিতার বচন আওড়ান, কেহ সুশ্রুতের টীকা ঝাড়েন। রোগ অনির্ণীত রহিল।

কবিরাজ মহাশয়েরা, কেবল বচন ঝাড়িয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, এমন নিন্দা আমরা করি না। তাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বটিকা, কেহ গুঁড়া, কেহ ঘৃত, কেহ তৈল; কেহ বলিলেন, ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, কেহ বলিলেন, আমার কাছে যাহা প্রস্তুত আছে, তেমন আর হইবে না। যাই হউক, রাজার বাড়ী, রাণীর রোগ, ঔষধের প্রয়োজন থাক, না থাক, নূতন প্রস্তুত হইবে না, এমন হইতে পারে না। হইলে দশ জনে দুটাকা দুসিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, অতএব ঔষধ প্রস্তুতের ধুম পড়িয়া গেল। কোথাও হামানদিস্তায় মূল পিষ্ট হইতেছে, কোথাও ঢেঁকিতে ছাল কুটিতেছে, কোথাও হাঁড়িতে কিছু সিদ্ধ হইতেছে, কোথাও খুলিতে তৈলে

মূর্চ্ছনা পড়িতেছে। রাজবাড়ীর এক জন পরিচারিকা এক দিন দেখিয়া বলিল, "রাণী হইয়া রোগ হয়, সেও ভাল।"

যার জন্য ঔষধের এত ধূম, তার সঙ্গে ঔষধের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বড় অল্প। কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধ যোগাইতেন না, তা নয়। সে গুণে তাঁহাদের কিছু মাত্র ত্রুটি ছিল না। তবে রমার দোষে সে যত্ন বৃথা হইল—রমা ঔষধ খাইত না। মুরলার বদলে, যমুনানাম্নী এক জন পরিচারিকা, রাণীর প্রধানা দাসী হইয়াছিল। যমুনাকে একটু প্রাচীন দেখিয়া নন্দা তাহাকে এই পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। আমরা এমন বলিতে পারি না যে, যমুনা আপনাকে প্রাচীনা বলিয়া স্বীকার করিত; শুনিয়াছি, কোন ভৃত্যবিশেষের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতান্তর ছিল; তথাপি স্থূল কথা এই যে, যমুনা একটু প্রাচীন চালে চলিত, রমাকে বিলক্ষণ যত্ন করিত; রোগিণীর সেবার কোন প্রকার ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিনী ছিল। রমার জন্য কবিরাজেরা যে ঔষধ দিয়া যাইত, তাহা তাহারই হাতে পড়িত; সেবন করাইবার ভার তাহার উপর। কিন্তু সেবন করান তাহার সাধ্যাতীত; রমা কিছুতেই ঔষধ খাইত না।

এ দিকে রোগের কোন উপশম নাই, ক্রমেই বৃদ্ধি, রমা আর মাথা তুলিতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া যমুনা স্থির করিল যে, সে সকল কথা বড় রাণীকে গিয়া জানাইবে। অতএব রমাকে বলিল, "আমি বড় মহারাণীর কাছে চলিলাম; ঔষধ তিনি নিজে আসিয়া খাওয়াইবেন।"

রমা বলিল, "বাছা! মৃত্যুকালে আর কেন জ্বালাতন করিস্! বরং তোর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করি।"

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বন্দোবস্ত মা?"

রমা। তোমার এই ঔষধগুলি আমারে বেচিবে? আমি এক এক টাকা দিয়া এক একটা বড়ি কিনিতে রাজি আছি।

যমুনা। সে আবার কি মা! তোমার ঔষধ তোমায় আবার বেচিব কি?

রমা। টাকা নিয়া তুমি যদি আমায় বড়ি বেচ, তা হ'লে তোমার আর তাতে কোন অধিকার থাকিবে না। চাই আমি খাই, চাই না খাই, তুমি আর কথা কহিতে পাবে না।

যমুনা কিছুক্ষণ ভাবিল। সে বুদ্ধিমতী; মনে মনে বিচার করিল যে, এ ত মরিবেই, তবে আমি টাকাগুলা ছাড়ি কেন? প্রকাশ্যে বলিল, "তা মা,

তুমি যদি খাও, ত টাকা দিয়াই নাও, আর অমনি নাও, নাও না কেন! আর যদি না খাও, ত আমার কাছে ওষুধ প'ড়ে থেকেই কি ফল?"

অতএব চুক্তি ঠিক হইল। যমুনা টাকা লইয়া ঔষধ রমাকে বেচিল। রমা ঔষধের কতকগুলা পিকদানিতে ফেলিয়া দিল, কতক বালিশের নীচে গুঁজিল। উঠিতে পারে না যে, অন্যত্র রাখিবে।

এ দিকে, ক্রমশঃ শরীরধ্বংসের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। নন্দা প্রত্যহ রমাকে দেখিতে আসে, দুই এক দণ্ড বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া যায়। নন্দা দেখিল যে, মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে; যাহার ছায়া, সে নিকটেই। নন্দা ভাবিল, "হায়! রাজবাড়ীর কবিরাজগুলোকেও কি ডাকিনীতে পেয়েছে?" নন্দা একেবারে কবিরাজের দলকে ডাকিয়া পাঠাইল। সকলে আসিলে নন্দা অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে উত্তম মধ্যম রকম ভৎ'সনা করিল। বলিল, "যদি রোগ ভাল করিতে পার না, তবে মাসিক লও কেন?"

একজন প্রাচীন কবিরাজ বলিল, "মা! কবিরাজে ঔষধ দিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে না।"

নন্দা বলিল, "তবে আমাদের ঔষধেও কাজ নাই, কবিরাজেও কাজ নাই। তোমরা আপনার আপনার দেশে যাও।"

কবিরাজমণ্ডলী বড় ক্ষুণ্ণ হইল। প্রাচীন কবিরাজটি বড় বিজ্ঞ। তিনি বলিলেন, "মা! আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই এমন ঘটিয়াছে। নহিলে, আমি যে ঔষধ দিয়াছি, তাহা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমি এখনও আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি যে, তিন দিনের মধ্যে আরাম করিব, যদি একটা বিষয়ে আপনি অভয় দেন।"

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

কবিরাজ বলিল, "আমি নিজে বসিয়া থাকিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া আসিব।" বুড়ার বিশ্বাস, "বেটি ঔষধ খায় না; আমার ঔষধ খাইলে কি রোগী মরে!"

নন্দা স্বীকৃত হইয়া কবিরাজদিগকে বিদায় দিল। পরে রমার কাছে আসিয়া সব বলিল। রমা অল্প হাসিল, বেশী হাসিবার শক্তিও নাই, মুখে স্থানও নাই; মুখ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলি যে?"

রমা আবার তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল, "ঔষধ খাব না।"

নন্দা। ছি দিদি! যদি এত ওষুধ খেলে, ত আর তিনটা দিন খেতে কি?

রমা। আমি ওষুধ খাই নাই।

নন্দা চমকিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি? মোটে না?"

রমা। সব বালিশের নীচে আছে।

নন্দা বালিশ উল্টাইয়া দেখিল, সব আছে বটে। তখন নন্দা বলিল, "কেন বহিন্—এখন আর আত্মঘাতিনী হইবে কেন? পাপ ত মিটিয়াছে।"

রমা। তা নয়—ঔষধ খাব।

নন্দা। আর কবে খাবি?

রমা। যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।

ঝর ঝর করিয়া রমার চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দারও চক্ষে জল আসিল। আর এখন সীতারাম রমাকে দেখিতে আসেন না। সীতারাম চিত্তবিশ্রামে থাকেন। নন্দা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন", এই কথা বলিয়া নন্দা রমাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিল। সেই আশ্বাসে রমা কোন রকমে বাঁচিয়াছিল--কিন্তু আর বুঝি বাঁচে না। নন্দা তাহাকে যে আশ্বাসবাক্য দিয়া আসিয়াছে, নন্দাও তাহা জপমালা করিয়াছিল, কিন্তু রাজাকে ধরিতে পারিতেছিল না। যদি কখনও ধরে, তবে "আজ না—কাল" করিয়া রাজা প্রস্থান করেন। নন্দা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, কিছুতেই সে সীতারামের উপর রাগ করিবে না। ভাবিল, রাজাকে ত ডাকিনীতে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাই ব'লে আমায় যেন ভূতে না পায়। আমার ঘাড়ে রাগ ভূত চাপিলে—এ সংসার এখন আর রাখিবে কে? তাই নন্দা সীতারামের উপর রাগ করিল না—আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রাণপাত করিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু ডাকিনীটার উপর রাগ বড় বেশী। ডাকিনী যে শ্রী, তাহা নন্দা জানিত না; সীতারাম ভিন্ন কেহই জানিত না। নন্দা অনেকবার সন্ধান জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সীতারামের আজ্ঞা ভিন্ন

চিত্তবিশ্রামে মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারিত না, সুতরাং কিছু হইল না। তবে জনপ্রবাদ এই যে, ডাকিনীটা দিবসে পরমসুন্দরী মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহধর্ম্ম করে, রাত্রিতে শৃগালীরূপ ধারণ করিয়া শ্মশানে শ্মশানে বিচরণপূর্ব্বক নরমাংস ভক্ষণ করে। অতিশয় ভীতা হইয়া নন্দা, চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে সবিশেষ নিবেদন করিল। চন্দ্রচূড় উত্তম তন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া রাজার উদ্ধারার্থ তান্ত্রিক যজ্ঞ সকল সম্পাদন করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ডাকিনীর ধ্বংস হইল না। পরিশেষে এক জন সুদক্ষ তান্ত্রিক বলিলেন, "মনুষ্য হইতে ইহার কিছু উপায় হইবে না। ইনি সামান্যা নহেন। ইনি কৈলাসনিবাসিনী, সাক্ষাৎ ভবানীর সহচরী, ইঁহার নাম বিশালাক্ষী। ইনি রুদ্রের শাপে কিছু কালের জন্য মর্ত্যলোকে মনুষ্যসহবাসার্থ আসিয়াছেন। শাপান্ত হইলে আপনিই যাইবেন।" শুনিয়া চন্দ্রচূড় ও নন্দা নিরস্ত ও চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। তবু নন্দা মনে মনে ভাবিত, "ভবানীর সহচরী হউক, আর যেই হউক, আমি একবার তাকে পাইলে নখে মাথা চিরি।"

তাই, নন্দার সীতারামের উপর কোন রাগ নাই। সীতারামও রাজধানীতে আসিলে নন্দার সঙ্গে কখন কখন সাক্ষাৎ করিতেন; এই সকল সময়ে, নন্দা রমার কথা সীতারামকে জানাইত—বলিত, "সে বড় 'কাতর'—তুমি গিয়া একবার দেখিয়া এসো।" সীতারাম যাচ্চি যাব করিয়া, যান নাই। আজ নন্দা জোর করিয়া ধরিয়া বসিল—বলিল, "আজ দেখিতে যাও—নহিলে এ জন্মে আর দেখা হবে না।"

কাজেই সীতারাম রমাকে দেখিতে গেলেন। সীতারামকে দেখিয়া রমা বড কাঁদিল। সীতারামকে কোন তিরস্কার করিল না। কিছুই বলিতে পারিল না। সীতারামের মনে কিছু অনুতাপ জন্মিল কি না, জানি না। সীতারাম স্নেহসূচক সম্বোধন করিয়া রোগমুক্তির ভরসা দিতে লাগিলেন। ক্রমে রমা প্রফুল্ল হইল, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু কি হাসি! হাসি দেখিয়া সীতারামের শঙ্কা হইল যে, আর অধিক বিলম্ব নাই।

সীতারাম পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেইখানে রমার পুত্র আসিল। আবার রমার চক্ষুতে জল আসিল—কিছুক্ষণ অবাধে জল, শুষ্ক গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেও মার কান্না দেখিয়া কাঁদিতেছিল। রমা ইঙ্গিতে অস্ফুটস্বরে সীতারামকে বলিলেন, "ওকে একবার কোলে নাও।"

সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন রমা, সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল, "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা। বড় রাণীর হাতে ওকে সমর্পণ করিয়া যাব মনে করেছিলাম—কিন্তু তা না করিয়া তোমার হাতেই সমর্পণ করিলাম। কথা রাখিবে কি?"

সীতারাম কলের পুতুলের মত স্বীকৃত হইলেন। রমা তখন সীতারামকে আরও নিকটে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সীতারাম সরিয়া বসিলে, রমা তাঁর পায়ে হাত দিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া আপনার মাথায় দিল। বলিল, "এ জন্মের মত বিদায় হইলাম। আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।"

তার পর বাক্য বন্ধ হইল। শ্বাস বড় জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। চক্ষুর জ্যোতি গেল। মুখের উপর কালো ছায়া আরও কালো হইতে লাগিল। শেষে সব অন্ধকার হইল। সব জ্বালা জুড়াইল। রমা চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যে দিন রমা মরিল, সে দিন সীতারাম আর চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এখনও তত দূর হয় নাই। যখন সীতারাম রাজা না হইয়াছিলেন, যখন আবার শ্রীকে না দেখিয়াছিলেন, তখন সীতারাম রমাকে বড় ভাল বাসিতেন —নন্দার অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। সে ভালবাসা গিয়াছিল। কিসে গেল, সীতারাম তাহার চিন্তা কখনও করেন নাই। আজ একটু ভাবিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন—রমার দোষ বড় বেশী নয়,—দোষ তাঁর নিজের। মনে মনে আপনার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইলেন।

কাজেই মেজাজ খারাব হইয়া উঠিল। চিত্ত প্রফুল্ল করিবার জন্য শ্রীর কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না; কেন না, শ্রীর সঙ্গে এই আত্মগ্লানির বড় নিকট সম্বন্ধ; রমার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণের কারণই শ্রী। শ্রীর কাছে গেলে আগুন আরও বাড়িবে। তাই শ্রীর কাছে না গিয়া রাজা নন্দার কাছে গেলেন। কিন্তু নন্দা সেদিন একটা ভুল করিল। নন্দা বড় চটিয়াছিল। ডাকিনীই হউক আর মানুষীই হউক, কোন পাপিষ্ঠার জন্য যে রাজা নন্দাকে

অবহেলা করিতেন, নন্দা তাহাতে আপনার মনকে রাগিতে দেয় নাই। কিন্তু রমাকে এত অবহেলা করায়, রমা যে মরিল, তাহাতে রাজার উপর নন্দার রাগ হইল ; কেন না, আপনার অপমানও তাহার সঙ্গে মিশিল। রাগটা এত বেশী হইল যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও নন্দা, সকলটুকু লুকাইতে পারিল না।

রমার প্রসঙ্গ উঠিলে, নন্দা বলিল, "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।"

নন্দা এইটুকু মাত্র রাগ প্রকাশ করিল, আর কিছুই না। কিন্তু তাহাতেই আগুন জ্বলিল ; কেন না ইন্ধন প্রস্তুত। একে ত আত্মগ্লানিতে সীতারামের মেজাজ খারাব হইয়াছিল—কোন মতে আপনার নিকটে আপনার সাফাই করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উপর নন্দার এই উচিত তিরস্কার শেলের মত বিঁধিল। "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।" শুনিয়া রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঠিক কথা। আমিই তোমাদের মৃত্যুর কারণ। আমি প্রাণপাত করিয়া, আপনার রক্তে পৃথিবী ভাসাইয়া তোমাদিগকে রাজরাণী করিয়াছি—কাজেই এখন বল্‌বে বৈ কি, আমিই তোমাদের মৃত্যুর কারণ। যখন রমা, গঙ্গারামকে ডাকিয়া আমার মৃত্যুর কারণ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কৈ তখন ত কেহ কিছু বল নাই?"

এই বলিয়া রাজা রাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। সেখানে চন্দ্রচূড় ঠাকুর, রাজাকে রমার জন্য শোকাকুল বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নানা প্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন। রাজার মেজাজ তপ্ত তেলের মত ফুটিতেছিল, রাজা তাঁহার কথার বড় উত্তর করিলেন না। চন্দ্রচূড় ঠাকুরও একটা ভুল করিলেন। তিনি মনে করিলেন, রমার মৃত্যুর জন্য রাজার অনুতাপ হইয়াছে, এই সময় চেষ্টা করিলে, যদি ডাকিনী হইতে মন ফিরে, তবে সে চেষ্টা করা উচিত। তাই চন্দ্রচূড় ঠাকুর ভূমিকা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যদি ছোট রাণীর প্রতি আর একটু মনোযোগী হইতেন, তা হইলে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন।"

জ্বলন্ত আগুন এ ফুৎকারে আরও জ্বলিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন, "আপনারও কি বিশ্বাস যে, আমিই ছোট রাণীর মৃত্যুর কারণ?"

চন্দ্রচূড়ের সেই বিশ্বাস বটে। তিনি মনে করিলেন, "এ কথা রাজাকে স্পষ্ট করিয়া বলাই উচিত। আপনার দোষ না দেখিলে, কাহারও চরিত্র শোধন হয় না। আমি ইঁহার গুরু ও মন্ত্রী, আমি যদি বলিতে সাহস না

করিব, তবে কে বলিবে ?" অতএব চন্দ্রচূড় বলিলেন, "তাহা এক রকম বলা যাইতে পারে।"

রাজা। পারে বটে। বলুন। কেবল বিবেচনা করুন, আমি যদি লোকের মৃত্যুকামনা করিতাম, তাহা হইলে এই রাজ্যে এক জনও এত দিন টিকিত না।

চন্দ্র। আমি বলিতেছি না যে, আপনি কাহারও মৃত্যুকামনা করেন। কিন্তু আপনি মৃত্যুকামনা না করিলেও, যে আপনার রক্ষণীয়, তাহাকে আপনি যত্ন ও রক্ষা না করিলে, কাজেই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। কেবল ছোট রাণী কেন, আপনার তত্ত্বাবধানের অভাবে বুঝি সমস্ত রাজ্য যায়। কথাটা আপনাকে বলিবার জন্য কয় দিন হইতে আমি চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আপনার অবসর অভাবে, তাহা বলিতে পারি নাই।

রাজা মনে মনে বলিলেন, "সকল বেটাই বলে—তত্ত্বাবধানের অভাব—বেটারা করে কি ?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তত্ত্বাবধানের অভাব—আপনারা করেন কি ?"

চন্দ্র। যা করিতে পারি—সব করি। তবে আমরা রাজা নহি। যেটা রাজার হুকুম নহিলে সিদ্ধ হয় না. সেইটুকু পারি না। আমার ভিক্ষা, কাল প্রাতে একবার দরবারে বসেন, আমি আপনাকে সবিশেষ অবগত করি, কাগজপত্র দেখাই ; আপনি রাজাজ্ঞা প্রচার করিবেন।

রাজা মনে মনে বলিলেন, "তোমার গুরুগিরির কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে —আমারও ইচ্ছা, তোমায় কিছু শিখাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "বিবেচনা করা যাইবে।"

চন্দ্রচূড়ের তিরস্কারে রাজার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কেবল গুরু বলিয়া সীতারাম তাঁহাকে বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু রাগে সে রাত্রি নিদ্রা গেলেন না। চন্দ্রচূড়কে কিসে শিক্ষা দিবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই, প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া দরবারে বসিলেন। চন্দ্রচূড় খাতাপত্রের রাশি আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে কথাটা চন্দ্রচূড় রাজাকে জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা এই। যত বড় রাজ্য হউক না কেন, আর যত বড় রাজা হউক না কেন, টাকা নইলে কোন রাজ্যই চলে না। আমরা একালে দেখিতে পাই, যেমন তোমার আমার সংসার টাকা নহিলে চলে না—তেমনই ইংরেজের এত বড় রাজ্যও টাকা নহিলে চলে না। টাকার অভাবে তেমনই রোমক সাম্রাজ্য লোপ পাইল—প্রাচীন সভ্যতা অন্ধকারে মিশাইল। সীতারামের সহসা টাকার অভাব হইল।

সীতারামের টাকার অভাব হওয়া অনুচিত ; কেন না, সীতারামের আয় অনেক গুণ বাড়িয়াছিল। ভূষণার ফৌজদারীর এলাকা তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল—বারো ভুঁইয়া তাঁহার বশে আসিয়াছিল। তচ্ছাসিত প্রদেশ সম্বন্ধে দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য যে কর, সীতারামের উপর তাহার আদায়ের ভার হইয়াছিল। সীতারাম এ পর্য্যন্ত তাহার এক কড়াও মুর্শিদাবাদে পাঠান নাই—যাহা আদায় করিয়াছিলেন, তাহা নিজে ভোগ করিতেছিলেন। তবে টাকার অকুলান কেন ?

লোকের আয় বাড়িলেই অকুলান হইয়া উঠে। কেন না, খরচ বাড়ে। ভূষণা বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল—বারো ভুঁইয়াকে বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল। এখন অনেক ফৌজ রাখিতে হইত—কেন না, কখন কে বিদ্রোহী হয়, কখন কে আক্রমণ করে—সে জন্যও ব্যয় হইতেছিল। অভিষেকেও কিছু ব্যয় হইয়াছিল। অতএব যেমন আয়, তেমনই ব্যয় বটে।

কিন্তু যেমন আয়, তেমনই ব্যয় হইলে অকুলান হয় না। অকুলানের আসল কারণ চুরি। রাজা এখন আর বড় কিছু দেখেন না—চিত্তবিশ্রামেই দিনপাত করেন। কাজেই রাজপুরুষেরা রাজভাণ্ডারের টাকা লইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করে,—কে নিষেধ করে? চন্দ্রচূড় ঠাকুর নিষেধ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ কেহ মানে না। চন্দ্রচূড় অনেকত বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর চুরি ধরিলেন,—মনে করিলেন, এবার যে দিন রাজা দরবারে বসিবেন, সেই দিন খাতাপত্র সকল তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই ধরা দেন না, "কাজ যা থাকে, মহাশয় করুন" বলিয়া কোন

মতে পাশ কাটাইয়া চিত্তবিশ্রামে পলায়ন করেন। চন্দ্রচূড় হতাশ হইয়া শেষে নিজেই কয় জনের বরতরফের হুকুম জারি করিলেন। তাহারা তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল—বলিল, "ঠাকুর! যখন স্মৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজন হইবে, তখন আপনার কথা শুনিব। রাজার সহি মোহরের পরওয়ানা দেখান, নহিলে ঘরে গিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করুন।"

রাজার সহি মোহর পাওয়া কিছু শক্ত কথা নহে। এখন রাজার কাছে যা হয় একখানা কাগজ ধরিয়া দিলেই তিনি সহি দেন—পড়িবার অবকাশ হয় না—চিত্তবিশ্রামে যাইতে হইবে। অতএব চন্দ্রচূড়, এই অপরাধীদিগের বর্‌তরফি পরওয়ানাতে রাজার সহি করাইয়া লইলেন। রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন।

কিন্তু তাহাতে চন্দ্রচূড়ের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। প্রধান অপরাধী খাতাঞ্জি দরবারে উপস্থিত ছিল, সে দেখিল যে, রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন। রাজা চলিয়া গেলেন, সে বলিল, "ও হুকুম মানি না। ও তোমার হুকুম—রাজার নয়। রাজা কাগজ পড়িয়াও দেখেন নাই। যখন রাজা স্বয়ং বিচার করিয়া আমাদিগকে বর্‌তরফ করিবেন, তখন আমরা যাইব,—এখন নহে।" কেহই গেল না। খুব চুরি করিতে লাগিল। ধনাগার তাহাদের হাতে, সুতরাং চন্দ্রচূড় কিছু করিতে পারিলেন না।

তাই আজ চন্দ্রচূড় রাজাকে পাকড়াও করিয়াছিলেন। রাজা দরবারে বসিলে, অপরাধীদিগের সমক্ষেই চন্দ্রচূড় কাগজপত্র সকল রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজা একে সমস্ত জগতের উপর রাগিয়াছিলেন, তাহাতে আবার চুরির বাহুল্য দেখিয়া ক্রোধে অত্যন্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া উঠিলেন। রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, অপরাধী সকলেই শূলে যাইবে।

হুকুম শুনিয়া আম দরবার শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রচূড় যেন বজ্রাহত হইলেন। বলিলেন, "সে কি মহারাজ! লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড?"

রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "লঘু পাপ কি? চোরের শূলই ব্যবস্থা।"

চন্দ্র। ইহার মধ্যে কয় জন ব্রাহ্মণ আছে। ব্রহ্মহত্যা করিবেন কি প্রকারে?

রাজা। ব্রাহ্মণদিগের নাক কাণ কাটিয়া, কপালে তপ্ত লোহার দ্বারা “চোর” লিখিয়া ছাড়িয়া দিবে। আর সকলে শূলে যাইবে।

এই হুকুম জারি করিয়া, রাজা চিত্তবিশ্রামে চলিয়া গেলেন। হুকুম মত অপরাধীদিগের দণ্ড হইল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেক রাজ-কর্ম্মচারী কর্ম্ম ছাড়িয়া পলাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চুরি বন্ধ হইল, টাকার তবু কুলান হয় না। রাজ্যের অবস্থা রাজাকে বলা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু রাজাকে পাওয়া ভার, পাইলেও কথা হয় না। চন্দ্রচূড় সন্ধানে সন্ধানে ফিরিয়া আবার একদিন রাজাকে ধরিলেন—বলিলেন, “মহারাজ! একবার এ কথায় কর্ণপাত না করিলে রাজ্য থাকে না!”

রাজা। থাকে থাকে, যায় যায়। ভাল শুনিতেছি, বলুন কি হয়েছে?

চন্দ্র। সিপাহী সব দলে দলে ছাড়িয়া চলিতেছে।

রাজা। কেন?

চন্দ্র। বেতন পায় না।

রাজা। কেন পায় না?

চন্দ্র। টাকা নাই।

রাজা। এখনও কি চুরি চলিতেছে না কি?

চন্দ্র। না, চুরি বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাতে কি হইবে? যে টাকা চোরের পেটে গিয়েছে, তা ত আর ফেরে নাই।

রাজা। কেন, আদায় তহশীল হইতেছে না?

চন্দ্র। এক পয়সাও না।

রাজা। কারণ কি?

চন্দ্র। যাহাদের প্রতি আদায়ের ভার, তাহারা কেহ বলে, “আদায় করিয়া শেষ তহবিল গরমিল হইলে শূলে যাব না কি?”

রাজা। তাহাদের বরতরফ করুন।

চন্দ্র। নূতন লোক পাইব কোথায়? আর কেবল নূতন লোকের দ্বারায় কি আদায় তহশীলের কাজ হয়?

রাজা। তবে তাহাদিগকে কয়েদ করুন।

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ! তবে আদায় তহশীল করিবে কে?

রাজা। পনের দিনের মধ্যে যে বাকী বকেয়া সব আদায় না করিবে, তাহাকে কয়েদ করিব।

চন্দ্র। সকল তহশীলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালারা অনেকে দিতেছে না।

রাজা। কেন দেয় না?

চন্দ্র। বলে, "মুসলমানের রাজ্য হইলে দিব। এখন দিয়া কি দোকর দিব?"

রাজা। যে টাকা না দিবে, যাহার বাকী পড়িবে, তাহাকেও কয়েদ করিতে হইবে।

চন্দ্রচূড় হাঁ করিয়া রহিলেন। শেষ বলিলেন, "মহারাজ, কারাগারে এত স্থান কোথা?"

রাজা। বড় বড় চালা তুলিয়া দিবেন।

এই বলিয়া বাকিদার ও তহশীলদার, উভয়ের কয়েদের হুকুমে স্বাক্ষর করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রচূড় মনে মনে শপথ করিলেন, আর কথনও রাজাকে রাজকার্য্যের কোন কথা জানাইবেন না।

এই হুকুমে দেশে ভারি হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল—চন্দ্রচূড় চালা তুলিয়া কুলাইতে পারিলেন না। বাকিদার, তহশীলদার, উভয়েই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। যে বাকিদার নয়, সেও সঙ্গে সঙ্গে পলাইতে লাগিল।

তাই বলিতেছিলাম যে, আগে আগুন ত জ্বলিয়াইছিল, এখন ঘর পুড়িল; যদি শ্রী না আসিত, তবে সীতারামের এতটা অবনতি হইত কি না জানি না; কেন না, সীতারাম ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, রাজ্য-শাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন—সে কথা যথাস্থানে বলিয়াছি। অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, সে অভিপ্রায় বালির বাঁধের মত আসক্তির বেগে ভাসিয়া গেল। রাজ্যে মন দিলেই যে সব আপদ্ ঘুচিত, তাহা নাই বলিলাম, কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তবে সে যদি নন্দার মত রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া থাকিয়া, নন্দার মত রাজার রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তাহা হইলেও

সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধ হয়; কেন না, কেবল ঐশ্বর্য্যমদে যে অবনতিটুকু হইতেছিল, শ্রী ও নন্দার সাহায্যে সেটুকুরও কিছু খর্ব্বতা হইত। তা শ্রী, যদি রাজপুরীতে মহিষী না থাকিয়া, চিত্তবিশ্রামে আসিয়া উপপত্নীর মত রহিল, তবে সন্ন্যাসীর মত না থাকিয়া, সেই মত থাকিলেই এতটা প্রমাদ ঘটিত না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইত। কিছু দিনের পর রাজার চৈতন্য হইতে পারিত। তা, যদি শ্রী সন্ন্যাসিনী হইয়াই রহিল, তবে সোজা রকম সন্ন্যাসিনী হইলেও এ বিপদ্ হইত না। কিন্তু এই ইন্দ্রাণীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখ পানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী! পাঁচ বৎসর ধরিয়া সীতারাম তাহার জন্য প্রায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন! এ দুঃখের কি আর তুলনা হয়! ইহাতেই সীতারামের সর্ব্বনাশ ঘটিল। আগে আগুন লাগিয়াছিল মাত্র,—এখন ঘর পুড়িল! সীতারাম আর সহ্য করিতে না পারিয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, শ্রীর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন।

তবে যাকে ভালবাসে, তাহার উপর বলপ্রয়োগ বড় পামরেও পারে না। শ্রীর উপর রাজার যে ভালবাসা, তাহা এখন কাজেই ইন্দ্রিয়বশ্যতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভালবাসা এখনও যায় নাই। তাই বলপ্রয়োগে ইচ্ছুক হইয়াও সীতারাম তাহা করিতেছিলেন না। বলপ্রয়োগ করিব কি না, এ কথার মীমাংসা করিতে সীতারামের প্রাণ বাহির হইতেছিল। যত দিন না সীতারাম একটা এদিক্ ওদিক্ স্থির করিতে পারিলেন, তত দিন সীতারাম এক প্রকার জ্ঞানশূন্যাবস্থায় ছিলেন। সেই ভয়ানক সময়ের বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে রাজপুরুষেরা শূলে গেল, আদায় তহশীলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা কারাগারে গেল, বাকিদারেরা আবদ্ধ হইল, প্রজা সব পলাইল, রাজ্য ছারখারে যাইতে লাগিল।

শেষ সীতারাম স্থির করিলেন, শ্রীর প্রতি বলপ্রয়োগই করিবেন। কথাটা মনোমধ্যে স্থির হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই অকস্মাৎ এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় ঠাকুর রাজাকে আর একদিন পাকড়া করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! তীর্থপর্য্যটনে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি অনুমতি করিলেই যাই।"

কথাটা রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত পড়িল। চন্দ্রচূড় গেলে নিশ্চয়ই শ্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, নয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব রাজা চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে তীর্থযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এখন চন্দ্রচূড় ঠাকুরের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, এ পাপ রাজ্যে আর বাস করিবেন না, এই পাপিষ্ঠ রাজার কর্ম্ম আর করিবেন না। অতএব তিনি সহজে সম্মত হইলেন না। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। চন্দ্রচূড় অনেক তিরস্কার করিলেন। রাজাও অনেক উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন। শেষে চন্দ্রচূড় থাকিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল। কাজেই রাজা সে দিন চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এদিকে চিত্তবিশ্রামে সেই রাত্রে একটা কাণ্ড উপস্থিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেই দিন দৈবগতিকে চিত্তবিশ্রামের দ্বারদেশে এক জন ভৈরবী আসিয়া দর্শন দিল। এখন চিত্তবিশ্রাম ক্ষুদ্র প্রমোদগৃহ হইলেও রাজগৃহ; জনকত দ্বারবানও দ্বারদেশে আছে। ভৈরবী দ্বারবানদিগের নিকট পথ ভিক্ষা করিল।

দ্বারবানেরা বলিল, "এ রাজবাড়ী—এখানে একটি রাণী থাকেন। কাহারও যাইবার হুকুম নাই।" বলা বাহুল্য যে, রাজাদিগের উপরাণীরাও ভৃত্যদিগের নিকট রাণী নাম পাইয়া থাকে।

ভৈরবী বলিল, "আমার তাহা জানা আছে। রাজাও আমায় জানেন। আমার যাইবার নিষেধ নাই। তোমরা গিয়া রাজাকে জানাও।"

দ্বারবানেরা বলিল, "রাজা এখন এখানে নাই—রাজধানী গিয়াছেন।"

ভৈরবী। তবে যে রাণী এখানে থাকেন, তাঁহাকেই জানাও। তাঁর হুকুমে হইবে না?

দ্বারবানেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কখনও কেহ প্রবেশ করিতে পায় নাই—রাজার বিশেষ নিষেধ। রাণীরও নিষেধ। রাজার অবর্ত্তমানে দুই এক জন স্ত্রীলোক (নন্দার প্রেরিতা) অন্তঃপুরে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাণীকে সংবাদ দেওয়াতে তিনি কাহাকেও

আসিতে দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তবে আবার রাণীকে খবর দেওয়া যাইবে কি? তবে এ ভৈরবীটার মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না—তাড়াইয়া দিলেও যদি কোন গোলযোগ ঘটে!

দ্বারবানেরা সাত পাঁচ ভাবিয়া পরিচারিকার দ্বারা অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইল। ভৈরবী আসিতেছে শুনিয়া শ্রী তখনই আসিবার অনুমতি দিল। জয়ন্তী অন্তঃপুরে গেল।

দেখিয়া শ্রী বলিল, "আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। আমার এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমার পরামর্শ নহিলে চলিতেছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "আমি ত এই সময়ে তোমার সংবাদ লইতে আসিব বলিয়া গিয়াছিলাম। এখন সংবাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাজ্যের নাকি বড় গোলযোগ। আর তুমিই নাকি তার কারণ? টোলে টোলে শুনিয়া আসিলাম, ছাত্রেরা সব রঘুর উনবিংশের শ্লোক আওড়াইতেছে। ব্যাপারটা কি?"

শ্রী বলিল, "তাই তোমায় খুঁজিতেছিলাম।" শ্রী তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। জয়ন্তী বলিল, "তবে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেছ না কেন?"

শ্রী। সেটা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

জয়ন্তী। রাজধানীতে যাও। রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে রাখ। এ তোমারই কাজ।

শ্রী। তা ত জানি না। মহিষীর ধর্ম্ম ত শিখি নাই। সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম শিখাইয়াছ, তাই শিখিয়াছি। যাহা জানি না, যাহা পারি না, সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সব গোল করিব। সন্ন্যাসিনী মহিষী হইলে কি মঙ্গল হইবে?

জয়ন্তী ভাবিল। বলিল, "তা আমি বলিতে পারি না। তোমা হইতে সে ধর্ম্ম পালন হইবে না, বোধ হইতেছে—তাহা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কি এত দূর হয়?"

শ্রী। বুঝি সে একদিন ছিল। যে দিন আঁচল দোলাইয়া মুসলমান সেনা ধ্বংস করিয়াছিলাম—সে দিন থাকিলে বুঝি হইত। কিন্তু অদৃষ্ট সে পথে গেল না, সে শিক্ষা হইল না। অদৃষ্ট গেল ঠিক উল্‌টা পথে—বনবাসে—সন্ন্যাসে গেল। কে জানে আবার অদৃষ্ট ফিরিবে?

জ। এখন উপায়?

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি। রাজাকে রাত্রি দিন দেখিতে দেখিতে অনেক সময়ে মনে হয়, আমি গৃহিণী, উঁহার ধর্ম্মপত্নী।

জ। তা ত বটেই।

শ্রী। তাতে পুরাণ কথা মনে আসে; আবার কি ভালবাসার ফাঁদে পড়িব? তাই, আগেই বলিয়াছিলাম, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। শক্র, রাজা লইয়া বার জন।

জয়ন্তী। আর এগার জন আপনার শরীরে? ভারি ত সন্ন্যাস সাধিয়াছ, দেখিতেছি! যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইয়াছ, দেখিতেছি! আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ, দেখিতেছি! একে কি বলে সন্ন্যাস?

শ্রী। তাই বলিতেছিলাম, পলায়নই বিধি কি না?

জ। বিধি বটে।

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

জ। পুরুষ মানুষের মেয়ে ভুলান কথা! পুষ্পশরাহতের প্রলাপ!

শ্রী। সে ভয় নাই?

জ। থাকিলে তোমার কি? রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা? এই কি সন্ন্যাস?

শ্রী। তা হোক না হোক—রাজা মরিলেই কোন্ সর্ব্বভূতের হিতসাধন হইল?

জ। রাজা মরিবে না, ভয় নাই। ছেলে খেলানা হারাইলে কাঁদে, মরে না। তুমি ঈশ্বরে কর্ম্মসংন্যাস করিয়া যাহাতে সংযতচিত্ত হইতে পার, তাই কর।

শ্রী। তা হইলে এখান হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

জ। এখনই।

শ্রী। কি প্রকারে যাই? দ্বারবানেরা ছাড়িবে কেন?

জ। তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল, সবই আছে দেখিতেছি। ভৈরবীবেশে পলাও, দ্বারবানেরা কিছু বলিবে না।

শ্রী। মনে করিবে, তুমি যাইতেছ? তার পর তুমি যাইবে কি প্রকারে?

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "এ কি আমার সৌভাগ্য! এত কালের পর আমার জন্য ভাবিবার একটা লোক হইয়াছে! আমি নাই যাইতে পারিলাম, তাতে ক্ষতি কি দিদি?"

শ্রী। রাজার হাতে পড়িবে—কি জানি, রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন!

জ। হইলে আমার কি করিবেন? রাজার এমন কোন ক্ষমতা আছে কি যে, সন্ন্যাসিনীর অনিষ্ট করিতে পারে?

জয়ন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদানুবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

জ। তুমি বরাবর—গ্রামে যাও। সেখানে রাজার পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার ত্রিশূল আমাকে দাও, আমার ত্রিশূল তুমি নাও। সে গ্রামের রাজার পুরোহিত আমার মন্ত্রশিষ্য। তিনি আমার চিহ্নিত ত্রিশূল দেখিলে তুমি যা বলিবে, তাই করিবেন। তাঁকে বলিও, তোমাকে অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। কেন না, তোমার জন্য বিস্তর খোঁজ তল্লাস হইবে। তিনি তোমাকে রাজপুরীমধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন। সেইখানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আবার বনবাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারবানেরা কিছু বলিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ। ভয়ানক ব্যাপার! লোক অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো।

শ্যামচাঁদ। তাই ত দাদা। আর তিলার্দ্ধ এ রাজ্যে থাকা নয়।

রামচাঁদ। তা তুমি ত আজ কত দিন ধ'রে যাই যাই ক'চ্ছো—যাও নি যে?

শ্যামচাঁদ। যাওয়ারই মধ্যে, মেয়ে ছেলে সব নলডাঙ্গা পা'ঠ্‌য়ে দিয়েছি। তবে আমার কিছু লহনা পড়ে রয়েছে, সেগুলা যত দূর হয়, আদায় ওসুল ক'রে নিয়ে যাই। আর আদায় ওসুল বা করবো কার কাছে—দেনে-ওয়ালারাও সব ফেরার হয়েছে।

রামচাঁদ। আচ্ছা, এ আবার নূতন ব্যাপার কি? কেন এত হাঙ্গামা, তা কিছু জান? শুনেছি না কি, হাবুজখানায় আর কয়েদী ধরে না, নূতন চালাগুলাতেও ধরে না, এখন না কি গোহালের গোরু বাহির করিয়া কয়েদী রাখ্‌ছে?

শ্যামচাঁদ। ব্যাপারটা কি জান না? সেই ডাকিনীটা পালিয়েছে।

রাম। তা শুনেছি। আচ্ছা, সে ডাকিনীটা ত এত যাগ যজ্ঞে কিছুতেই গেল না—এখন আপনি পালাল যে?

শ্যাম। আপনি কি আর গিয়েছে? (চুপি চুপি) বল্‌তে গায়ে কাঁটা দেয়। সে নাকি দেবতার তাড়নায় গিয়েছে।

রাম। সে কি?

শ্যাম। এই নগরে এক দেবী অধিষ্ঠান করেন শুন নি? তিনি কখন কখন দেখা দেন—অনেকেই তাঁকে দেখেছে। কেন, যে দিন ছোট রাণীর পরীক্ষা হয়, সে দিন তুমি ছিলে না?

রাম। হাঁ! হাঁ! সেই তিনিই! আচ্ছা, বল দেখি তিনি কে?

শ্যাম। তা তিনি কি কারও কাছে আপনার পরিচয় দিতে গিয়েছেন! তবে পাঁচ জন লোকে পাঁচ রকম বল্‌চে।

রাম। কি বলে?

শ্যাম। কেউ বলে, তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী—কেউ বলে, তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ জিউর মন্দির হইতে কখনও কখনও রূপ ধারণ ক'রে বা'র হন, লোকে এমন দেখেছে। কেউ বলে, তিনি স্বয়ং দশভুজা; দশভুজার মন্দিরে গিয়া অন্তর্দ্ধান হ'তে তাঁকে না কি দেখেছে।

রাম। তাই হবে। নইলে তিনি ভৈরবীবেশ ধারণ করবেন কেন? সে সভায় ত তিনি ভৈরবীবেশে অধিষ্ঠান করেছিলেন?

শ্যাম। তা যিনিই হ'ন, আমাদের অনেক ভাগ্য যে, আমরা তাঁকে সে দিন দর্শন করেছিলাম। কিন্তু রাজার এমনই মতিচ্ছন্ন ধরেছে যে—

রাম। হাঁ—তার পর ডাকিনীটা গেল কি ক'রে শুনি।

শ্যাম। সেই দেবী, ডাকিনী হ'তে রাজ্যের অমঙ্গল হ'চ্ছে দেখে, এক দিন ভৈরবীবেশে ত্রিশূল ধারণ ক'রে তাকে বধ করতে গেলেন।

রাম। ইঃ! তার পর?

শ্যাম। তার পর আর কি? মার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে, সেটা তালগাছ-প্রমাণ বিকটাকার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ঘোর গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে কোথায় যে আকাশপথে উড়ে গেল, কেউ আর দেখ্‌তে পেলে না।

রাম। কে বল্‌লে?

শ্যাম। বল্‌লে আর কে? যারা দেখেছে, তারাই বলেছে। রাজা এমনই সেই ডাকিনীর মায়ায় বদ্ধ যে, সেটা গেছে ব'লে চিত্তবিশ্রামের যত দ্বারবান দাস দাসী, সবাইকে ধরে এনে কয়েদ করেছেন। তারাই এই সব কথা প্রকাশ করেছে। তারা বলে, "মহারাজ! আমাদের অপরাধ কি? দেবতার কাছে আমরা কি কর্‌ব?"

রাম। গল্প কথা নয় ত?

শ্যাম। এ কি আর গল্প কথা!

রাম। কি জানি। হয় ত ডাকিনীটা মড়া ফড়া খাবার জন্য রাত্রিতে কোথা বেরিয়ে গিয়েছিল, আর আসে নি। এখন রাজার পীড়াপীড়িতে তারা আপনার বাঁচন জন্য একটা রচে মচে বলচে।

শ্যাম। এ কি আর রচা কথা? তারা দেখেছে যে, সেটার এমন এমন মূলোর মত দাঁত, শোনের মত চুল, বারকোশের মত চোক, একটা আস্ত কুমীরের মত জিব, দুটো জালার মত দুটো স্তন, মেঘগর্জ্জনের মত নিশ্বাস, আর ডাকেতে একেবারে মেদিনী বিদীর্ণ!

রাম। সর্ব্বনাশ! এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার! রাজার মতিচ্ছন্ন ধরেছে বল্‌ছিলে কি?

শ্যাম। তাই বল্‌চি শোন না। এই ত গেল নিরপরাধী বেচারাদের নাহক কয়েদ। তার পর, সেই ডাকিনীটাকে খুঁজে ধরে আন্‌বার জন্য রাজা ত দিক্ বিদিকে কত লোকই পাঠাচ্চেন। এখন সে আপনার স্বস্থানে চলে গেছে, মনুষ্যের সাধ্য কি যে, তাকে সন্ধান ক'রে ধ'রে আনে। কেউ তা পার্‌চে না—সবাই এসে যোড় হাত ক'রে এত্তেলা কর্‌ছে যে, সন্ধান করতে পার্‌লে না।

রাম। তাতে রাজা কি বলেন?

শ্যাম। এখন যাই কেউ ফিরে এসে বল্‌চে যে, সন্ধান পেলে না, অমনই রাজা তাকে কয়েদে পাঠাচ্চেন। এই করে ত হাবুজখানা পরিপূর্ণ। এ দিকে

রাজপুরুষদের এমনই ভয় লেগেছে যে, বাড়ী, ঘর, দ্বার, স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে পালাচ্চে। দেখাদেখি নগরের প্রজা দোকানদারও সব পালাচ্চে।

রাম। তা, দেবী কি করেন? তিনি কটাক্ষ করিলেই ত এই সকল নিরপরাধী লোক রক্ষা পায়।

শ্যাম। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী! তিনি এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ভৈরবীবেশে রাজাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "রাজা! নিরপরাধীর পীড়ন করিও না। নিরপরাধীর পীড়ন করিলে, রাজার রাজ্য থাকে না। এদের কোন দোষ নাই। আমিই সেটাকে তাড়াইয়াছি—কেন না, সেটা হ'তে তোমার রাজ্যের অমঙ্গল হতেছিল। দোষ হয়ে থাকে, আমারই হয়েছে। দণ্ড করিতে হয়, ওদের ছেড়ে দিয়ে আমারই দণ্ড কর।

রাম। তার পর?

শ্যাম। তাই বল্‌ছিলাম, রাজার বড় মতিচ্ছন্ন ধরেছে। সেটা পালান অবধি রাজার মেজাজ এমন গরম যে, কাক পক্ষী কাছে যেতে পাচ্চে না। তর্কালঙ্কার ঠাকুর কাছে গিয়েছিলেন, বড় রাণী কাছে গিয়েছিলেন, গাল খেয়ে পালিয়ে এলেন।

রাম। সে কি! গুরুকে গালি গালাজ? নির্ব্বংশ হবেন যে!

শ্যাম। তার কি আর কথা আছে? তার পর শোন না। গরম মেজাজের প্রথম মোহড়াতেই সেই দেবতা গিয়া দর্শন দিয়া ঐ কথা বললেন। বলতেই রাজা চক্ষু আরক্ত করিয়া তাঁকে স্বহস্তে প্রহার করিতেই উদ্যত। তা না ক'রে, যা করেছে, সে ত আরও ভয়ানক!

রাম। কি করেছে?

শ্যাম। ঠাকুরাণীকে কয়েদ করেছে। আর হুকুম দিয়েছে যে, তিন দিন মধ্যে ডাকিনীকে যদি না পাওয়া যায়, তবে সমস্ত রাজ্যের লোকের সমুখে (সেই দেবীকে) উলঙ্গ ক'রে চাঁড়ালের দ্বারা বেত মারিবে।

রাম। হো! হো! হোহো! দেবতার আবার কি করবে! রাজা কি পাগল হয়েছে! তা, মা কি কয়েদে গিয়েছেন না কি? তাঁকে কয়েদ করে কার বাপের সাধ্য?

শ্যাম। দেবচরিত্র কার সাধ্য বুঝে! রাজার না কি রাজ্যভোগের নির্দ্দিষ্ট কাল ফুরিয়েছে, তাই মা ছল ধরিয়া, এখন স্বধামে গমনের চেষ্টায় আছেন।

রাজা কয়েদের হুকুম দিলেন, মা স্বচ্ছন্দে গজেন্দ্রগমনে কারাগারমধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। শুনিতে পাই, রাত্রে কারাগারে মহাকোলাহল উপস্থিত হয়। যত দেবতারা আসিয়া স্তব পাঠ করেন—ঋষিরা আসিয়া বেদ পাঠ, মন্ত্র পাঠ করেন। পাহারাওয়ালারা বাহির হইতে শুনিতে পায়, কিন্তু দ্বার খুলিলেই সব অন্তর্দ্ধান হয়। (বলা বাহুল্য যে, জয়ন্তী নিজেই রাত্রিকালে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠ করেন। পাহারাওয়ালারা তাহাই শুনিতে পায়।)

রাম। তার পর?

শ্যাম। তার পর এখন আজ সে তিন দিন পূরিল। রাজা ঢেঁট্‌রা দিয়েছেন যে, কাল এক মাগী চোরকে বেইজ্জৎ করিয়া বেত মারা যাইবে, যাহার ইচ্ছা হয়, দেখিতে আসিতে পারে। শুন নাই?

রাম। কি দুর্ব্বুদ্ধি! তর্কালঙ্কার ঠাকুরই বা কিছু বলেন না কেন? বড় রাণী বা কিছু বলেন না কেন? দুটো গালাগালির ভয়ে কি তাঁরা আর কাছে আসিতে পারেন না?

শ্যাম। তাঁরা না কি অনেক বলেছেন। রাজা বলেন, ভাল, দেবতাই যদি হয়, তবে আপনার রক্ষা আপনিই করিবে, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি? আর যদি মানুষ হয়, তবে আমি রাজা, চোরের দণ্ড আমি দিব, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি?

রাম। তা এক রকম বলেছে মন্দ নয়—ঠিক কথাই ত। তা ব্যাপারটা কি হয়, কাল দেখ্‌তে যেতে হবে। তুমি যাবে?

শ্যাম। যাব বৈ কি। সবাই যাবে। এমন কাণ্ড কে না দেখ্‌তে যাবে?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। রাজ্যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। প্রভাত হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা অল্প হইতেই দুর্গ পরিপূর্ণ হইল, আর লোক ধরে না। ক্রমে ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেঁসি পেষাপেষি মিশামিশি হইতে লাগিল। এই দুর্গমধ্যে আর এক দিন এমনই লোকারণ্য হইয়াছিল—সে দিন রমার বিচার। আজ জয়ন্তীর দণ্ড। বিচার অপেক্ষা দণ্ড দেখিতে লোক বেশী আসিল। নন্দা

বাতায়ন হইতে দেখিলেন, কালো চুল মাথার তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না; কদাচিৎ কোন স্ত্রীলোকের মাথায় আঁচল বা কোন পুরুষের মাথায় চাদর জড়ান, সেই কৃষ্ণসাগরে ফেনরাশির ন্যায় ভাসিতেছে। সেই রমার পরীক্ষা নন্দার মনে পড়িল, কিন্তু মনে পড়িল যে, সে দিন দেখিয়াছিলেন যে, সেই জনার্ণব বড় চঞ্চল, সংক্ষুব্ধ, যেন বাত্যাতাড়িত; রাজপুরুষেরা কষ্টে শান্তি রক্ষা করিয়াছিল;—আজ সকলেই নিস্তব্ধ। সকলেরই মনে রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা বড় জাগরূক। সকলেই মনে মনে ভয় পাইতেছিল। আজ এই লোকারণ্য সিংহব্যাঘ্রবিমর্দ্দিত মহারণ্য অপেক্ষাও ভয়ানক দেখাইতেছিল।

সেই বৃহৎ দুর্গপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদুপরি এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠগঠন বিকটদর্শন চণ্ডাল, মূর্ত্তিমান্ অন্ধকারের ন্যায় দীর্ঘ বেত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছে। জয়ন্তীকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া সর্ব্বসমক্ষে বিবস্ত্রা করিয়া সেই চণ্ডাল বেত্রাঘাত করিবে, ইহাই রাজাজ্ঞা।

জয়ন্তীকে এখনও সেখানে আনা হয় নাই। রাজা এখনও আসেন নাই—আসিলে তবে তাহাকে আনা হইবে। মঞ্চের সম্মুখে রাজার জন্য সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে। তাহা বেষ্টন করিয়া চোপদার ও সিপাহীগণ দাঁড়াইয়া আছে। অমাত্যবর্গ আজ সকলেই অনুপস্থিত। এমন কুকাণ্ড দেখিতে আসিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই। রাজাও কাহাকে ডাকেন নাই।

কতক্ষণে রাজা আসিবেন, কতক্ষণে সেই দণ্ডনীয় দেবী বা মানবী আসিবে, কতক্ষণে কি হইবে, সেই জন্য প্রত্যাশাপন্ন হইয়া লোকারণ্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ নকিব ফুকরাইল; স্তাবকেরা স্তুতিবাদ করিল। দর্শকেরা জানিল, রাজা আসিতেছেন।

রাজার আজ বেশভূষার কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই—বৈশাখের দিনান্তকালের মেঘের মত রাজা আজ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি! আয়ত চক্ষু রক্তবর্ণ—বিশাল বক্ষ মধ্যে মধ্যে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত হইতেছে। বর্ষণোন্মুখ জলধরের উন্নমনের ন্যায় রাজা আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিলেন। কেহ বলিল না, "মহারাজাধিরাজকি জয়!"

তখন সেই লোকারণ্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল—দেখিল, সেই সময়ে প্রহরিগণ জয়ন্তীকে লইয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছে।

প্রহরীরা তাহাকে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল। কোন প্রাসাদ-শিখরোপরি উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জয়ন্তীর অতুলনীয় রূপরাশি সেই মঞ্চোপরি উদিত হইল। তখন সেই সহস্র সহস্র দর্শক ঊর্দ্ধমুখে, উৎক্ষিপ্তলোচনে গৈরিকবসনাবৃতা মঞ্চস্থা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই উন্নত, সম্পূর্ণায়ত, ললিত মধুর অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট দেহ; তাহার দেবোপম স্থৈর্য্য—দেবদুর্ল্লভ শান্তি; সকলে বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল, জয়ন্তীর নবরবিকরপ্রোদ্ভিন্ন পদ্মবৎ অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মুখ; এখনও অধরভরা মৃদু মৃদু মধুর স্নিগ্ধ বিনম্র হাস্য—সর্ব্ববিপৎসংহারিণী শক্তির পরিচয়-স্বরূপ সেই স্নিগ্ধ মধুর মন্দহাস্য! দেখিয়া, অনেকে দেবতা জ্ঞানে যুক্তকরে প্রণাম করিল। যখন কতকগুলি লোক দেখিল, আর কতকগুলি লোক জয়ন্তীকে প্রণাম করিতেছে—তখন তাহাদের মনে সেই ভক্তিভাব প্রবেশ করিল। তখন তাহারা "জয় মায়িকি জয়!" "জয় লছ্‌মী মায়িকি জয়!" ইত্যাদি ঘোর রবে জয়ধ্বনি করিল। সেই জয়ধ্বনি ক্রমে ক্রমে প্রাঙ্গণের এক ভাগ হইতে অপর ভাগে, এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গিরিশ্রেণীস্থিত বজ্রনাদের মত প্রক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইতে লাগিল। শেষ সেই সমবেত লোকসমারোহ এককণ্ঠ হইয়া তুমুল জয়শব্দ করিল। পুরী কম্পিতা হইল। চণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল। জয়ন্তী মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "জয় জগদীশ্বর! তোমারই জয়! তুমি আপনি এই লোকারণ্য, আপনিই এই লোকের কণ্ঠে থাকিয়া, আপনার জয়বাদ আপনিই দিতেছ! জয় জগন্নাথ! তোমারই জয়! আমি কে?"

ক্রুদ্ধ রাজা তখন অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মেঘগম্ভীরস্বরে চণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা!"

এই সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার সহসা রাজসমীপে আসিয়া রাজার দুইটি হাত ধরিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! রক্ষা কর! আমি আর কখনও ভিক্ষা চাহিব না, এইবার আমায় এই ভিক্ষা দাও—ইঁহাকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজা। (ব্যঙ্গের সহিত) কেন—দেবতার এমন সাধ্য নাই যে, আপনি ছাড়াইয়া যায়। বেটী জুয়াচোরের উচিত শাসন হইতেছে।

চন্দ্র। দেবতা না হইল—স্ত্রীলোক বটে।

রাজা। স্ত্রীলোকেরও রাজা দণ্ড করিতে পারেন।

চন্দ্র। এই জয়ধ্বনি শুনিতেছেন? এই জয়ধ্বনিতে আপনার রাজার নাম ডুবিয়া যাইতেছে।

রাজা। ঠাকুর! আপনার কাজে যাও। পুঁথি পাজি নাই কি?

চন্দ্রচূড় চলিয়া গেলেন। তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজাজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইয়া লইল—বেত উঁচু করিল—জয়ন্তীর মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিল; বেত নামাইয়া—রাজার পানে চাহিল—আবার জয়ন্তীর পানে চাহিল—শেষ বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"কি!" বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন।

চণ্ডাল বলিল, "মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।"

চণ্ডাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।"

তখন রাজা অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "চণ্ডালকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ কর।"

রক্ষিবর্গ চণ্ডালকে ধরিবার জন্য মঞ্চের উপর আরোহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া, জয়ন্তী সীতারামকে বলিলেন, "এ ব্যক্তিকে পীড়ন করিবেন না, আপনার যে আজ্ঞা, আমি নিজেই পালন করিতেছি—চণ্ডাল বা জল্লাদের প্রয়োজন নাই।" তথাপি রক্ষিবর্গ চণ্ডালকে ধরিতে আসিতেছে দেখিয়া, জয়ন্তী তাহাকে বলিল, "বাছা! তুমি আমার জন্য কেন দুঃখ পাইবে? আমি সন্ন্যাসিনী, আমার কিছুতেই সুখ দুঃখ নাই; বেতে আমার কি হইবে? আর বিবস্ত্র—সন্ন্যাসীর পক্ষে সবস্ত্র বিবস্ত্র সমান। কেন দুঃখ পাও—বেত তোল।"

চণ্ডাল বেত উঠাইল না। জয়ন্তী তখন চণ্ডালকে বলিল, "বাছা! স্ত্রীলোকের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে না—এই তার প্রমাণ দেখ।" এই বলিয়া জয়ন্তী আপনি বেত উঠাইয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা ধরিল। পরে সেই জনসমারোহ সমক্ষে, আপনার প্রফুল্লপদ্মসন্নিভ রক্তপ্রভ ক্ষুদ্র করপল্লব পাতিয়া, সবলে তাহাতে বেত্রাঘাত করিল। বেত, মাংস কাটিয়া লইয়া উঠিল—হাতে রক্তের স্রোত বহিল। জয়ন্তীর গৈরিক বস্ত্র এবং মঞ্চতল তাহাতে প্লাবিত হইল। দেখিয়া লোকে হাহাকার করিতে লাগিল।

জয়ন্তী মৃদু হাসিয়া চণ্ডালকে বলিল, "দেখিলে বাছা! সন্ন্যাসিনীকে কি লাগে? তোমার ভয় কি?"

চণ্ডাল একবার রুধিরাক্ত ক্ষত পানে চাহিল—একবার জয়ন্তীর সহাস্য প্রফুল্ল মুখ পানে চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া, অতি ত্রস্তভাবে মঞ্চসোপান অবরোহণ করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। লোকারণ্যমধ্যে সে কোথায় লুকাইল, কেহ দেখিতে পাইল না।

রাজা তখন অনুচরবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "দোস্‌রা লোক লইয়া আইস—মুসলমান।"

অনুচরবর্গ, কালান্তক যমের সদৃশ এক জন কসাইকে লইয়া আসিল। সে মহম্মদপুরে গোরু কাটিতে পারিত না—কিন্তু নগরপ্রান্তে বক্‌রি মেড়া কাটিয়া বেচিত। সে ব্যক্তি অতিশয় বলবান্‌ ও কদাকার। সে রাজাজ্ঞা পাইয়া মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে লইয়া জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বেত উঁচু করিয়া, কসাই জয়ন্তীকে বলিল, 'কাপ্‌ড়া উতার্‌—তেরি গোশ্‌ত টুক্‌রা টুক্‌রা করকে হাম দোকানমে বেচেঙ্গে।"

জয়ন্তী তখন অপরিম্লান মুখে, জনসমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক। যাহার কন্যা আছে, সেই আপনার কন্যাকে মনে করিয়া, আমাকে সেই কন্যা ভাবিয়া চক্ষু আবৃত করুক। যে হিন্দু, যাহার দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, সেই চক্ষু আবৃত করুক। যাহার মাতা অসতী, যে বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছে, সে যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কাছে আমার লজ্জা নাই, আমি তাহাদের মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করি না।"

লোকে এই কথা শুনিয়া চক্ষু বুজিল, কি না বুজিল, জয়ন্তী তাহা আর চাহিয়া দেখিল না। মন তখন খুব উঁচু সুরে বাঁধা আছে—জয়ন্তী তখন জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। জয়ন্তী কেবল রাজার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমার আজ্ঞায় আমি বিবস্ত্র হইব। কিন্তু তুমি চাহিয়া দেখিও না। তুমি রাজ্যেশ্বর; তোমায় পশুবৃত্ত দেখিলে প্রজারা কি না করিবে? মহারাজ, আমি বনবাসিনী, বনে থাকিতে গেলে অনেক সময়ে বিবস্ত্র হইতে হয়। একদা আমি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলাম—বাঘের মুখ

হইতে আপনার শরীর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বস্ত্র রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমাকেও আমি, তোমার আচরণ দেখিয়া সেইরূপ বন্য পশু মনে করিতেছি, অতএব তোমার কাছে আমার লজ্জা হইতেছে না। কিন্তু তোমার লজ্জা হওয়া উচিত—কেন না, তুমি রাজা এবং গৃহী, তোমার মহিষী আছেন। চক্ষু বুজ।”

বৃথা বলা! তখন মহাক্রোধান্ধকারে রাজা একেবারে অন্ধ হইয়াছেন। জয়ন্তীর কথার কোন উত্তর না দিয়া, কসাইকে বলিলেন, “জবরদস্তী কাপ্‌ড়া উতার লেও।”

তখন জয়ন্তী আর বৃথা কথা না কহিয়া, জানু পাতিয়া মঞ্চের উপর বসিল। জয়ন্তী আপনার কাছে আপনি ঠকিয়াছে,—এখন বুঝি জয়ন্তীর চোখে জল আসে। জয়ন্তী মনে করিয়াছিল, “যখন পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, যখন আর আমার সুখও নাই, দুঃখও নাই, তখন আমার আবার লজ্জা কি? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমার মনের যখন কোন সম্বন্ধ নাই, তখন আমার আর বিবস্ত্র আর সবস্ত্র কি? পাপই লজ্জা, আবার কিসে লজ্জা করিব? জগদীশ্বরের নিকট ভিন্ন, সুখদুঃখের অধীন মনুষ্যের কাছে লজ্জা কি? আমি কেন এই সভামধ্যে বিবস্ত্র হইতে পারিব না?” তাই জয়ন্তী এতক্ষণ আপনাকে বিপন্নই মনে করে নাই—বেত্রাঘাতটা ত গণ্যের মধ্যে নহে। কিন্তু এখন যখন বিবস্ত্র হইবার সময় উপস্থিত হইল—তখন কোথা হইতে এই পাপ লজ্জা আসিয়া সেই ইন্দ্রিয়বিজয়িনী সুখদুঃখবর্জ্জিতা জয়ন্তীকেও অভিভূত করিল। তাই নারীজন্মকে ধিক্কার দিয়া জয়ন্তী মঞ্চতলে জানু পাতিয়া বসিল। তখন যুক্তকরে, পবিত্রচিত্তে জয়ন্তী আত্মাকে সমাহিত করিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল, “দীনবন্ধু! আজ রক্ষা কর! মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এ পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু হে দর্পহারী! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর! নারীদেহ কেন দিয়াছিলে, প্রভু! সব সুখদুঃখ বিসর্জ্জন করা যায়, কিন্তু নারীদেহ থাকিতে লজ্জা বিসর্জ্জন করা যায় না। তাই আজ কাতরে ডাকিতেছি, জগন্নাথ! আজ রক্ষা কর।”

যতক্ষণ জয়ন্তী জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিল, ততক্ষণ কসাই তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সমস্ত জনমণ্ডলী এককণ্ঠে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল—বলিতে লাগিল, “মহারাজ! এই পাপে তোমার

সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।" রাজা কর্ণপাত করিলেন না। নিরুপায় জয়ন্তী আপনার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, ছাড়িতেছিল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। শ্রী থাকিলে বড় বিস্মিতা হইত—জয়ন্তীর চক্ষুতে আর কখনও কেহ জল দেখে নাই। জয়ন্তী রুধিরাক্ত ক্ষত হস্তে আপনার অঞ্চল ধরিয়া ডাকিতেছিল, "জগন্নাথ! রক্ষা কর।"

বুঝি জগন্নাথ সে কথা শুনিলেন। সেই অসংখ্য জনসমূহ হাহাকার করিতে করিতে সহসা আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। "রাণীজিকি জয়! মহারাণীকি জয়! দেবীকি জয়!" এই সময়ে অধোমুখী জয়ন্তীর কর্ণে অলঙ্কারশিঞ্জিত প্রবেশ করিল। তখন জয়ন্তী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী সঙ্গে করিয়া, মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছেন। জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেই সমস্ত পৌরস্ত্রী জয়ন্তীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শকেরা সকলে করতালি দিয়া হরিবোল দিতে লাগিল। কসাই জয়ন্তীর হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু মঞ্চ হইতে নামিল না।

রাজা অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া অতি পরুষভাবে নন্দাকে বলিলেন, "এ কি এ মহারাণী!"

নন্দা বলিলেন, "মহারাজ! আমি পতিপুত্রবতী। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে কখনও এ পাপ করিতে দিব না। তাহা হইলে আমার কেহ থাকিবে না।"

রাজা পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তোমার ঠাঁই অন্তঃপুরে, এখানে নয়। অন্তঃপুরে যাও।"

নন্দা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি যে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছি, এই কসাইটা সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া থাকে কোন্ সাহসে? উহাকে নামিতে আজ্ঞা দিন।"

রাজা কথা কহিলেন না। তখন নন্দা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই রাজপুরীমধ্যে আমার কি এমন কেহ নাই যে, এটাকে নামাইয়া দেয়?"

তখন সহস্র দর্শক এককালে "মার! মার!" শব্দ করিয়া কসাইয়ের প্রতি ধাবমান হইল। সে লম্ফ দিয়া মঞ্চ হইতে পড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল,

কিন্তু দর্শকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, মারিতে মারিতে দুর্গের বাহিরে লইয়া গেল। পরে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া, প্রাণ মাত্র রাখিয়া ছাড়িয়া দিল।

নন্দা জয়ন্তীকে বলিল, "মা! দয়া করিয়া অভয় দাও। মা! আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়া থাকেন। মা! অপরাধ লইও না। একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধূলা দিবে চল, আমি তোমার পূজা করিব।"

তখন রাণী পৌরস্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে জয়ন্তীকে ঘেরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। রাজা কিছু করিতে না পারিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন মহাকোলাহলপূর্ব্বক, এবং নন্দাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দর্শক-মণ্ডলী দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তী ক্ষণকালও অবস্থিতি করিল না। নন্দা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, স্বহস্তে গঙ্গাজলে জয়ন্তীর পা ধুয়াইয়া, সিংহাসনে বসাইতে গেলেন। কিন্তু জয়ন্তী হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, "মা! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। ক্ষণমাত্র জন্য মনে করিও না যে, আমি কোন প্রকার রাগ বা দুঃখ করিয়াছি। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও তোমার বিপদ্ পড়ে, জানিতে পারিলে, আমি আসিয়া, আমার যথাসাধ্য উপকার করিব। কিন্তু রাজপুরীমধ্যে সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই নাই। অতএব আমি চলিলাম।" নন্দা এবং পৌরবর্গ জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া তাঁহাকে বিদায় করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের কথা বাহিরে যায় বটে, কিন্তু কখনও ঠিক ঠিক যায় না। স্ত্রীলোকের মুখে মুখে যে কথাটা চলিয়া চলিয়া রটিতে থাকে, সেটা কাজেই মুখে মুখে বড় বাড়িয়া যায়। বিশেষ যেখানে একটুখানি বিস্ময়ের গন্ধ থাকে, সেখানে বড় বাড়িয়া যায়। জয়ন্তী সম্বন্ধে অতিপ্রকৃত রটনা পূর্ব্বে যথেষ্টই ছিল, নাগরিকদিগের কথাবার্ত্তায় আমরা দেখিয়াছি। এখন জয়ন্তী রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এই সোজা কথাটা যেরূপে বাহিরে রটিল, তাহাতে লোকে বুঝিল যে, দেবী

অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

কাজেই লোকের দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী এবং রক্ষাকর্ত্রী দেবতা, রাজাকে ছলনা করিয়া, এক্ষণে ছল পাইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব রাজ্য আর থাকিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে জনরব উঠিল যে, মুর্শিদাবাদ হইতে নবাবি ফৌজ আসিতেছে। কাজেই রাজ্যধ্বংস যে অতি নিকট, সে বিষয়ে আর বড় বেশী লোকের সন্দেহ রহিল না। তখন নগরমধ্যে বোচ্‌কা বাঁধিবার বড় ধুম পড়িয়া গেল। অনেকেই নগর ত্যাগ করিয়া চলিল।

সীতারাম এ সকলের কোন সংবাদ না রাখিয়া চিত্তবিশ্রামে গিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার চিত্তে ক্রোধই প্রবল—সে ক্রোধ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসক। অন্যকে ছাড়িয়া ক্রোধ শ্রীর উপরেই অধিক প্রবল হইল।

উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সীতারাম কতকগুলি নীচব্যবসায়ী নীচাশয় অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "রাজ্যে যেখানে যেখানে যে সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমার জন্য চিত্তবিশ্রামে লইয়া আইস।" তখন দলে দলে সেই পামরেরা চারি দিকে ছুটিল। যে অর্থের বশীভূতা, তাহাকে অর্থ দিয়া লইয়া আসিল। যে সাধ্বী, তাহাকে বলপূর্ব্বক আনিতে লাগিল। রাজ্যে হাহাকারের উপর আবার হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুর এবার কাহাকে কিছু না বলিয়া তল্পী বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।

পথে যাইতে যাইতে চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজি, কোথায় যাইতেছেন?"

চন্দ্র। কাশী।—আপনি কোথায় যাইতেছেন?

ফকির। মোক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়?

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী প্রসন্নমনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল। দুঃখ কিছুই নাই—মনে বড় সুখ। পথে চলিতে চলিতে মনে মনে ডাকিতে লাগিল—"জয় জগন্নাথ! তোমার দয়া অনন্ত! তোমার মহিমার পার নাই! তোমাকে যে না জানে, যে না ভাবে, সেই ভাবে বিপদ্! বিপদ্ কাহাকে বলে প্রভু? তাহা বলিতে পারি না; তুমি যাহাতে আমাকে ফেলিয়াছিলে, তাহা পরম সম্পদ্! আমি এত দিন এমন করিয়া বুঝিতে পারি নাই যে, আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা; কেন না, আমি বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বৃথা অভিমানে অভিমানিনী, অহঙ্কার-বিমূঢ়া। অর্জ্জুন ডাকিয়াছিলেন, আমিও ডাকিতেছি প্রভু, শিখাও প্রভু! শাসন কর!

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

জয়ন্তী, জগদীশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করিতে শিখিয়াছিল। মনের সকল কথা খুলিয়া বিশ্বপিতার নিকট বলিতে শিখিয়াছিল। বালিকা যেমন মা বাপের নিকট আবদার করে, জয়ন্তীও তেমনই সেই পরম পিতা-মাতার নিকট আবদার করিতে শিখিয়াছিল। এখন জয়ন্তী একটা আবদার লইল। আবদার, সীতারামের জন্য। সীতারামের যে মতি গতি, সীতারাম ত উৎসন্ন যায়, বিলম্ব নাই। তার কি রক্ষা নাই? অনন্ত দয়ার আধারে তাহার জন্য কি একটু দয়া নাই? জয়ন্তী তাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, "আমি জানি, ডাকিলে তিনি অবশ্য শুনেন। সীতারাম ডাকে না—ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে—নহিলে এমন করিয়া ডুবিবে কেন? জানি, পাপীর দণ্ডই এই যে, সে দয়াময়কে ডাকিতে ভুলিয়া যায়। তাই সীতারাম তাঁকে ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে, আর ডাকে না। তা, সে না ডাকুক, আমি তার হইয়া জগদীশ্বরকে ডাকিলে তিনি কি শুনিবেন না? আমি যদি বাপের কাছে আবদার করি যে, এই পাপিষ্ঠ সীতারামকে পাপ হইতে মোচন কর, তবে কি তিনি শুনিবেন না? জয় জগন্নাথ! তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

তার পর জয়ন্তী ভাবিল যে, "যে নিশ্চেষ্ট, তাহার ডাক ভগবান্ শুনেন না। আমি যদি নিজে সীতারামের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা না করি, তবে ভগবান্ কেন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? দেখি, কি করা যায়। আগে শ্রীকে চাই। শ্রী পলাইয়া ভাল করে নাই। অথবা না পলাইলেও কি হইত বলা যায় না। আমার কি সাধ্য যে, ভগবন্নির্দিষ্ট কার্য্যকারণপরম্পরা বুঝিয়া উঠি।"

জয়ন্তী তখন শ্রীর কাছে চলিল। যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। শ্রী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "রাজার অধঃপতন নিকট। তাঁহার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?"

জয়ন্তী। উপায় ভগবান্। ভগবান্‌কে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্‌কে যে দিন আবার তাঁর মনে হইবে, সেই দিন তাঁহার আবার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

শ্রী। তাহার উপায় কি? আমি যখন তাঁহার কাছে ছিলাম, তখন সর্ব্বদা ভগবৎ-প্রসঙ্গই তাঁর কাছে কহিতাম। তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিতেন।

জয়ন্তী। তোমার মুখের কথা, তাই মনোযোগ দিতেন। তোমার মুখ পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন, তোমার রূপে ও কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁর কাণে প্রবেশ করিত না। তিনি কোন দিন তোমার এ সকল কথার কিছু উত্তর করিয়াছিলেন কি? কোন দিন কোন তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? হরিনামে কোন দিন উৎসাহ দেখিয়াছিলে কি?

শ্রী। না। তা বড় লক্ষ্য করি নাই।

জয়ন্তী। তবে সে মনোযোগ তোমার লাবণ্যের প্রতি,—ভগবৎপ্রসঙ্গে নয়।

শ্রী। তবে, এখন কি কর্ত্তব্য?

জ। তুমি করিবে কি? তুমি ত বলিয়াছ যে, তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার কর্ম্ম নাই?

শ্রী। যেমন শিখাইয়াছ।

জ। আমি কি তাই শিখাইয়াছিলাম? আমি কি শিখাই নাই যে, অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগপূর্ব্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান

করিলেই কর্ম্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না?* স্বামিসেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?

শ্রী। তবে আমাকে পলাইতে পরামর্শ দিয়াছিলে কেন?

জ। তুমি যে বলিলে, তোমার শত্রু, রাজা নিয়া বার জন। যদি ইন্দ্রিয়গণ তোমার বশ্য নয়, তবে তোমার স্বামিসেবা সকাম হইয়া পড়িবে। অনাসক্তি ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্মত্যাগ ঘটে না। তাই তোমাকে পলাইতে বলিয়াছিলাম। যার যে ভার সয় না, তাকে সে ভার দিই না। "পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং" ইত্যাদি উপমা মনে আছে ত?

শ্রী বড় লজ্জিতা হইল। ভাবিয়া বলিল, "কাল ইহার উত্তর দিব।"

সে দিন আর সে কথা হইল না। শ্রী সে দিন জয়ন্তীর সঙ্গে বড় দেখা সাক্ষাৎ করিল না। পরে জয়ন্তী তাহাকে ধরিল। বলিল, "আমার কথার কি উত্তর সন্ন্যাসিনী?"

শ্রী বলিল, "আমায় আর একবার পরীক্ষা কর।"

জয়ন্তী বলিল, "এ কথা ভাল। তবে মহম্মদপুর চল। তোমার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, পথে তাহার পরামর্শ করিতে করিতে যাইব।"

দুই জনে তখন পুনর্ব্বার মহম্মদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রী গেল, জয়ন্তী গেল, চন্দ্রচূড় গেল, চাঁদশাহ গেল। তবু সীতারামের চৈতন্য নাই।

বাকি মৃণ্ময় আর নন্দা। নন্দা এবার বড় রাগিল—আর পতিভক্তিতে রাগ থামে না। কিন্তু নন্দার আর সহায় নাই। এক মৃণ্ময় মাত্র সহায় আছে। অতএব নন্দা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এক দিন প্রাতে মৃণ্ময়কেই ডাকিতে পাঠাইল। সে ডাক মৃণ্ময়ের নিকট পৌঁছিল না। মৃণ্ময় আর নাই। সেই দিন প্রাতে মৃণ্ময়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

---

* কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥—গীতা, ১৮।৯

প্রাতে উঠিয়াই মৃণ্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—আগতপ্রায়—প্রায় গড়ে পৌঁছিল। বজ্রাঘাতের ন্যায় এ সংবাদ মৃণ্ময়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ের যুদ্ধের কোন উদ্যোগই নাই। এখন আর চন্দ্রচূড়ের সে গুপ্তচর নাই যে, পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিবে। সংবাদ পাইবামাত্র মৃণ্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।

মুসলমান সেনা আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষ্টন করিল—নগর ভাঙ্গিয়া অবশিষ্ট নাগরিকেরা পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে যেখানে সুন্দরীমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত সীতারাম লীলায় উন্মত্ত, সেইখানে সীতারামের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, "মৃণ্ময় মরিয়াছে। মুসলমান সেনা আসিয়া দুর্গ ঘেরিয়াছে।" সীতারাম মনে মনে বলিলেন, "তবে আজ শেষ। ভোগবিলাসের শেষ; রাজ্যের শেষ; জীবনের শেষ।" তখন রাজা রমণীমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

বিলাসিনীরা বলিল, "মহারাজ, কোথা যান? আমাদের ফেলিয়া কোথা যান?"

সীতারাম চোপদারকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহাদের বেত মারিয়া তাড়াইয়া দাও।"

স্ত্রীলোকেরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হরিবোল দিয়া উঠিল। তাহাদিগের থামাইয়া ভানুমতী নামে তাহাদিগের মধ্যস্থ এক সুন্দরী রাজার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "মহারাজ! আজ জানিলে বোধ হয় যে, সত্যই ধর্ম্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি, তার প্রতিফল নাই? আমাদের কাহারও মা কাঁদিতেছে, কাহারও বাপ কাঁদিতেছে, কাহারও স্বামী কাঁদিতেছে, কাহারও শিশু সন্তান কাঁদিতেছে—মনে করিয়াছিলে কি, সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না? মহারাজ, নগরে না, বনে যাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখাইও না; কিন্তু মনে রাখিও যে, ধর্ম্ম আছে।"

রাজা এ কথার উত্তর না করিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া বায়ুবেগে অশ্ব সঞ্চালিত করিয়া দুর্গদ্বারে চলিলেন। যুবতীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কেহ বলিল,

"আয় ভাই, রাজার রাজধানী লুঠি গিয়া চল। সীতারাম রায়ের সর্ব্বনাশ দেখি গিয়া চল।" কেহ বলিল, "সীতারাম আল্লা ভজিবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভজি গে চল।" সে সকল কথা রাজার কাণে গেল না। ভানুমতীর কথায় রাজার কাণ ভরিয়াছিল। রাজা এখন স্বীকার করিলেন, "ধর্ম্ম আছে।"

রাজা গিয়া দেখিলেন, মুসলমান সেনা এখনও গড় ঘেরে নাই—সবে আসিতেছে মাত্র—তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ধূলি, পতাকা ও অশ্বারোহী সকল নানা দিকে ধাবমান হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতেছে; এবং প্রধানাংশ দুর্গদ্বার-সম্মুখে আসিতেছে। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রায় সিপাহী নাই। বলা বাহুল্য যে, তাহারা অনেক দিন বেতন না পাইয়া ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। যে কয় জন বাকি ছিল, তাহারা মৃণ্ময়ের মৃত্যু ও মুসলমানের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তবে দুই চারি জন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত অত্যন্ত প্রভুভক্ত, একবার নুন খাইলে আর ভুলিতে পারে না, তাহারাই আছে। গণিয়া গাঁথিয়া তাহারা জোর পঞ্চাশ জন হইবে। রাজা মনে মনে কহিলেন, "অনেক পাপ করিয়াছি। ইহাদের প্রাণ দান করিব। ধর্ম্ম আছে।"

রাজা দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা কেহই নাই। সকলেই আপন আপন ধন প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ভৃত্যবর্গ কেহ নাই। দুই এক জন অতি-পুরাতন দাস দাসী প্রভুর সঙ্গে একত্রে প্রাণপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাশ্রুলোচনে অবস্থিতি করিতেছে।

রাজা তখন অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন যে যে পুরীমধ্যে বাস করিত, সকলেই যথাকালে আপন আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন আজ অরণ্যতুল্য, জনশূন্য, নিঃশব্দ, অন্ধকার। রাজার চক্ষুতে জল আসিল।

রাজা মনে জানিতেন, নন্দা কখনও যাইবে না, তাহার যাইবারও স্থান নাই। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে নন্দার সন্ধানে চলিলেন। তখন গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া মুসলমানের কামান ডাকিতে লাগিল—তাহারা আসিয়া গড়

ঘেরিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাকোলাহল, অন্তঃপুর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

রাজা নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন, নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারি পাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, "হায় মহারাজ! এ কি করিলে!"

রাজা বলিলেন, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাই করিয়াছি। আমি প্রথমে পতিঘাতিনী বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার কুহকে পড়িয়া এই মৃত্যুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে—"

নন্দা। সে কি মহারাজ? শ্রী?

রাজা। শ্রীর কথাই বলিতেছি।

নন্দা। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? এত দিন বল নাই কেন, মহারাজ?

নন্দার মুখ সেই আসন্ন মৃত্যুকালেও প্রফুল্ল হইল।

রাজা। বলিয়াই কি হইবে? ডাকিনীই হউক, শ্রীই হউক, ফল একই হইয়াছে। মৃত্যু উপস্থিত।

নন্দা। মহারাজ! শরীরধারণে মৃত্যু আছেই। সে জন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব—তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

রাজা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নাই, এক শত যোদ্ধাও নাই। কিন্তু আমি যুদ্ধে মরিব; তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। আমি এখনই ফটক খুলিয়া মুসলমান সেনামধ্যে একাই প্রবেশ করিব। তোমাকে বলিতে ও হাতিয়ার লইতে আসিয়াছি।

নন্দার চক্ষুতে বড় ভারি বেগে স্রোত বহিতে লাগিল; কিন্তু নন্দা তাহা মুছিল। বলিল, "মহারাজ! আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তুমি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছ, ইহাই আমার বহু ভাগ্য—আর যদি দুদিন আগে হইতে! তুমিও মরিবে মহারাজ! আমিও মরিব—তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু ভাবিতেছি—এই অপোগণ্ডগুলির কি হইবে! ইহারা যে মুসলমানের হাতে পড়িবে।"

এবার নন্দা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রাজা বলিলেন, "তাই তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্ত তোমাকে থাকিতে হইবে।"

নন্দা। আমি থাকিলেই বা উহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

রাজা। নন্দা! এত লোক পলাইল, তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত।

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ? তোমার পুত্রকন্তা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্তা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্ত। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্তা লইয়া কোথায় যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। অনাথা দেখিয়া মুসলমান যদি দয়া করে। না করে, জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। মহারাজ, রাজার ঔরসে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ্ বিপদ্ উভয়ই আছে—তজ্জন্ত আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে, আমার সেই বড় ভাবনা।

রাজা। তবে বিধাতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। ইহজন্মে তোমাদের সঙ্গে এই দেখা।

এই বলিয়া আর কোন কথা না কহিয়া, রাজা সজ্জার্থ অস্ত্রগৃহে গেলেন। নন্দা বালকবালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজার সঙ্গে অস্ত্রগৃহে গেলেন। রাজা রণসজ্জায় আপনাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন, নন্দা বালকবালিকা-গুলি লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখিতে লাগিল।

যোদ্ধ,বেশ পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া, সীতারাম আবার সীতারামের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বীরদর্পে, মৃত্যু-কামনায়, একাকী দুর্গদ্বারাভিমুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

একাকী দুর্গদ্বারে যাইতে দেখিলেন যে, যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাতের জন্ত আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুই জন কে বসিয়া রহিয়াছে। সেই মৃত্যুকামী যোদ্ধারও হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলেন—ত্রিশূল হস্তে, গৈরিকভস্মরুদ্রাক্ষবিভূষিতা, জয়ন্তীই পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে, সেইরূপ ভৈরবীবেশে শ্রী।

রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, তাঁহার আসন্নকালে, সেই বেশে সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, "তোমরা আমার এই আসন্নকালে, এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?"

জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। রাজা দেখিলেন, শ্রী গদ্গদকণ্ঠ, সজললোচন—কথা কহিবে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

রাজা তখন বলিলেন, "শ্রী! তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?"

শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসিনী কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হউক, আর গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

রাজা। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছ—তুমি আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে, নন্দা যাইবে, প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ! যদি এত কাল আমার উপর রাগ করেন নাই, তবে আজ আর রাগ করিবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই আপনার আর আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই আপনার পায়ে মাথা দিয়া,—

এই বলিয়া শ্রী মঞ্চ হইতে নামিয়া, সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?"

সী। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর ত গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সী। তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, "আমি ভিখারিণী, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।"

সী। মা! তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী। তুমি যে আজ আমার দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছ, তাহা মনে করি না, তোমার আশীর্ব্বাদেই বুঝিতেছি, তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল, তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্ন হও। ঐ শোন! মুসলমানের কামান! আমি ঐ কামানের মুখে এখনই এই দেহ সমর্পণ করিব। কি করিলে তুমি প্রসন্ন হও, তা এই সময়ে বল।

জয়ন্তী। আর একদিন তুমি একাই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলে।

রাজা। আজ তাহা হয় না। জলে আর তটে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই, যে আজ একা দুর্গ রক্ষা করিতে পারে।

জয়ন্তী। তোমার ত এখনও পঞ্চাশ জন সিপাহী আছে।

রাজা। ঐ কোলাহল শুনিতেছ? ঐ সেনা সকলের, এই পঞ্চাশ জনে কি করিবে? আমার আপনার প্রাণ আমি যখন ইচ্ছা, যেমন করিয়া ইচ্ছা, পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু বিনাপরাধে উহাদিগের হত্যা করি কেন? পঞ্চাশ জন লইয়া এ যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই।

শ্রী। মহারাজ! আমি বা নন্দা মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাহাদের রক্ষার কিছু উপায় হয় না?

সীতারামের চক্ষুতে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, "নিরুপায়! উপায় কি করিব?"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি কি তাহা জানেন না? জানেন বৈ কি। জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর, সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়িল। কাল কাদম্বিনী বাতাসে উড়িয়া গেল—হৃদয় মধ্যে অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে, সূর্য্যরশ্মি বিকশিত হইতে লাগিল—

চিন্তা করিতে করিতে অনন্তব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশক সেই মহাজ্যোতি প্রভাসিত হইল। তখন সীতারাম মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন, "নাথ! দীননাথ! অনাথনাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না?"

সীতারাম অন্যমনা হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকে জয়ন্তী ইঙ্গিত করিল। তখন সহসা দুইজনে সেই মঞ্চের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া, উর্দ্ধনেত্র হইয়া, ডাকিতে লাগিল—গগনবিহারী, গগনবিদারী, কলবিহঙ্গনিন্দী কণ্ঠে, সেই মহাদুর্গের চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিতে লাগিল,—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ!॥

দুর্গের বাহিরে সেই সাগরগর্জ্জনবৎ মুসলমান সেনার কোলাহল; প্রাচীর ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ নিনাদ মাঠে মাঠে, জঙ্গলে জঙ্গলে, নদীর বাঁকে বাঁকে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে;—দুর্গমধ্যে জনশূন্য, সেই প্রতিধ্বনিত কোলাহল ভিন্ন অন্য শব্দশূন্য—তাহার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তসুরসংবাদিনী অতুলিতকণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, সীতারামের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া, উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব!॥

শুনিতে শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন,—আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, যুক্তকরে, উর্দ্ধমুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন,—তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল। জয়ন্তী ও শ্রী সেই আকাশবিপ্লাবী কণ্ঠে আবার হরিনাম করিতে লাগিল, হরি! হরি! হরি! হরি হে! হরি! হরি! হরি! হরি হে!

এমন সময়ে দুর্গমধ্যে মহা কোলাহল হইতে লাগিল—শব্দ শুনা গেল—"জয় মহারাজকি জয়! জয় সীতারামকি জয়!"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

পাঠককে বলিতে হইবে না যে, দুর্গমধ্যেই সিপাহীরা বাস করিত। ইহাও বলা গিয়াছে যে, সিপাহী সকলই দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, কেবল জন পঞ্চাশ নিতান্ত প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই। তাহারা বাছা বাছা লোক—বাছা বাছা লোক নহিলে এমন সময়ে বিনা বেতনে কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া থাকে না। এখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এ দিকে মুসলমান সেনা আসিয়া পড়িয়াছে, মহা কোলাহল করিতেছে, কামানের ডাকে মেদিনী কাঁপাইতেছে—গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীর ফাটাইতেছে—তবু ইহাদিগকে সাজিতে কেহ হুকুম দেয় না! রাজা নিজে আসিয়া সব দেখিয়া গেলেন। কৈ? তাহাদের ত সাজিতে হুকুম দিলেন না! তাহারা কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া আছে, অন্য পুরস্কার কামনা করে না, কিন্তু তাও ত ঘটিয়া উঠে না—কেহ ত বলে না, "আইস! আমার জন্য মর!" তখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া এক বৈঠক করিল। রঘুবীর মিশ্র তাহার মধ্যে প্রাচীন এবং উচ্চপদস্থ—রঘুবীর তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। বলিল, "ভাই সব! ঘরের ভিতর মুসলমান আসিয়া খোঁচাইয়া মারিবে, সেই কি ভাল হইবে? আইস, মরিতে হয় ত মরদের মত মরি! চল, সাজিয়া গিয়া লড়াই করি। কেহ হুকুম দেয় নাই—নাই দিক! মরিবার আবার হুকুম হাকাম কি? মহারাজের নিমক্ খাইয়াছি, মহারাজের জন্য লড়াই করিব—তা হুকুম না পাইলে, কি সময়ে তাঁর জন্য হাতিয়ার ধরিব না? চল, হুকুম হোক্ না হোক্ আমরা গিয়া লড়াই করি!"

এ কথায় সকলেই সম্মত হইল। তবে, গয়াদীন পাঁড়ে প্রশ্ন তুলিল যে, "লড়াই করিব কি প্রকার? এখন দুর্গরক্ষার উপায় একমাত্র কামান। কিন্তু গোলন্দাজ ফৌজ ত সব পলাইয়াছে। আমরা ত কামানের কাজ তেমন জানি না। আমাদের কি রকম লড়াই করা উচিত?"

তখন এ বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। তাহাতে দুর্ম্মদ সিংহ জমাদ্দার বলিল, "অত বিচারে কাজ কি? হাতিয়ার আছে, ঘোড়া আছে, রাস্তাও গড়ে আছে। চল, আমরা হাতিয়ার বাঁধিয়া, ঘোড়ায় সওয়ার

হইয়া রাজার কাছে গিয়া হুকুম লই। মহারাজ যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।"

এই প্রস্তাব অতি উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। অতি ত্বরা করিয়া সকলে রণসজ্জা করিল—আপন আপন অশ্ব সকল সুসজ্জিত করিল। তখন সকলে সজ্জীভূত ও অশ্বারূঢ় হইয়া আস্ফালনপূর্ব্বক, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্চনা শব্দ উঠাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "জয় মহারাজকি জয়! জয় রাজা সীতারামকি জয়!"

সেই জয়ধ্বনি সীতারামের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যোদ্ধগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, যথায় মঞ্চপার্শ্বে সীতারাম, জয়ন্তী ও শ্রীর মহাগীতি শুনিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া জয়ধ্বনি করিল।

রঘুবীর মিশ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের কি হুকুম? আজ্ঞা পাইলে আমরা এই কয় জন নেড়া মুণ্ডকে হাঁকাইয়া দিই।"

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা কিয়ৎক্ষণ এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিপাহীরা ততক্ষণ নিবিষ্টমনা হইয়া অবিচলিতচিত্ত এবং অস্খলিতপ্রারম্ভ হইয়া সেই সন্ন্যাসিনী-দ্বয়ের স্বর্গীয় গান শুনিতে লাগিল।

যথাকালে রাজা এক দোলা সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। রাজভৃত্যেরা সব পলাইয়াছিল বলিয়াছি। কিন্তু দুই চারি জন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য পলায় নাই, তাহাও বলিয়াছি। তাহারাই দোলা বহিয়া আনিতেছিল। দোলার ভিতরে নন্দা এবং বালকবালিকাগণ।

রাজা সিপাহীদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া, অতি প্রাচীন প্রথানুসারে একটি অতি ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ রচনা করিলেন। রন্ধ্র মধ্যে নন্দার শিবিকা, রক্ষা করিয়া স্বয়ং সূচীমুখে অশ্বারোহণে

দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি জয়ন্তী ও শ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাহিরে কেন? সূচীর রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ কর।"

জয়ন্তী ও শ্রী হাসিল। বলিল, "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া, "জয় জগদীশ্বর! জয় লক্ষ্মী-নারায়ণজী!" বলিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন সেই সন্ন্যাসিনীরা অবলীলাক্রমে তাঁহার অশ্বের সম্মুখে আসিয়া ত্রিশূলদ্বয় উন্নত করিয়া—

জয় শিব শঙ্কর! ত্রিপুরনিধনকর!
রণে ভয়ঙ্কর! জয় জয় রে!
চক্রগদাধর! কৃষ্ণ পীতাম্বর!
জয় জয় হরি হর! জয় জয় রে!

ইত্যাকার জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল। সবিস্ময়ে রাজা বলিলেন, "সে কি? এখনই পিশিয়া মরিবে যে!"

শ্রী বলিল, "মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় কি বেশী?" কিন্তু জয়ন্তী কিছু বলিল না। জয়ন্তী আর দর্প করে না। রাজাও, এই স্ত্রীলোকেরা কথায় বাধ্য নহে বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না।

তার পর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজা স্বহস্তে তাহার চাবি খুলিয়া অর্গল মোচন করিলেন। লোহার শিকল সকলে মহা ঝঞ্ঝনা বাজিল—সিংহদ্বারের উচ্চ গুম্বুজের ভিতরে, তাহার ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল - সেই অশ্বগণের পদধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন যবনসেনাসাগরের তরঙ্গাভিঘাতে সেই দুশ্চালনীয় লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ কবাট আপনি উদ্ঘাটিত হইল—উন্মুক্ত দ্বারপথ দেখিয়া সূচীব্যূহস্থিত রণবাজিগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

এদিকে যেমন বাঁধ ভাঙ্গিলে বন্যার জল, পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের মত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়, মুসলমান সেনা দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া তেমনই বেগে ছুটিল। কিন্তু সম্মুখেই জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখিয়া সেই সেনা-তরঙ্গ,—সহসা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যেন নিশ্চল হইল। যেমন বিশ্বমোহিনী দেবীমূর্ত্তি, তেমনই অদ্ভুত বেশ, তেমনই অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্ব সাহস, তেমনই

সর্ব্বজনমনোমুগ্ধকারী সেই জয়গীতি!—মুসলমান সেনা তাহাদিগকে পুররক্ষাকারিণী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। তাহারা ত্রিশূল-ফলকের দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া, যবন সেনা ভেদ করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূলমুক্ত পথে সীতারামের সূচীব্যূহ অবলীলাক্রমে মুসলমান সেনা ভেদ করিয়া চলিল। এখন সীতারামের অন্তঃকরণে জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন কেবল ইচ্ছা, জগদীশ্বর স্মরণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া মরিবেন। তাই সীতারাম চিন্তাশূন্য, অবিচলিত, কার্য্যে অভ্রান্ত, প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন। সীতারাম ভৈরবীমুখে হরিনাম শুনিয়া, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন, এখন তাঁর কাছে মুসলমান কোন্ ছার!

তাঁর প্রফুল্ল কান্তি, এবং সামান্যা অথচ জয়শালিনী সেনা দেখিয়া মুসলমান সেনা 'মার! মার!' শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্ত্রীলোক দুই জনকে কেহ কিছু বলিল না—সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সীতারাম ও তাঁহার সিপাহীগণকে চারি দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের সৈনিকেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে, কোথাও তিলার্দ্ধ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল না—কেবল অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনেকে মুসলমানের আঘাতে আহত হইল—অনেকে নিহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, অমনই আর এক জন পশ্চাৎ হইতে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের সূচীব্যূহ অভগ্ন থাকিয়া ক্রমশঃ মুসলমান সেনার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিল, সম্মুখে জয়ন্তী ও শ্রী পথ করিয়া চলিল। সিপাহীদিগের উপর যে আক্রমণ হইতে লাগিল, তাহা ভয়ানক; কিন্তু সীতারামের দৃষ্টান্তে, উৎসাহবাক্যে, অধ্যবসায় এবং শিক্ষার প্রভাবে তাহারা সকল বিঘ্ন জয় করিয়া চলিল। পার্শ্বে দৃষ্টি না করিয়া, যে সম্মুখে গতিরোধ করে, তাহাকেই আহত, নিহত, অশ্বচরণবিদলিত করিয়া সম্মুখে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, মুসলমান সেনাপতি সীতারামের গতিরোধ জন্য একটা কামান সূচীব্যূহের সম্মুখ দিকে পাঠাইলেন; ইতিপূর্ব্বেই মুসলমানেরা দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য কামান সকল তদুপযুক্ত স্থানে পাতিয়াছিল, এজন্য সূচীব্যূহের সম্মুখে হঠাৎ কামান আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে নাই। এক্ষণে, রাজা রাণী পলাইতেছে জানিতে পারিয়া, বহু কষ্টে ও যত্নে একটা কামান তুলিয়া লইয়া, সেনাপতি সূচীব্যূহের সম্মুখে পাঠাইলেন।

নিজে সে দিকে যাইতে পারিলেন না; কেন না, দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া অধিকাংশ সৈন্য লুঠের লোভে সেই দিকে যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাকেও সেই দিকে যাইতে হইল—সুবাদারের প্রাপ্য রাজভাণ্ডার পাঁচ জনে লুঠিয়া না আত্মসাৎ করে। কামান আসিয়া সীতারামের সূচীব্যূহের সম্মুখে পৌছিল। দেখিয়া, সীতারামের পক্ষের সকলে প্রমাদ গণিল। কিন্তু শ্রী প্রমাদ গণিল না। শ্রী জয়ন্তী দুই জনে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামানের সম্মুখে আসিল। শ্রী, জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিয়া, কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন করিয়া, চারি দিক্ চাহিয়া ঈষৎ, মৃদু, প্রফুল্ল, জয়সূচক হাসি হাসিল। জয়ন্তীও শ্রীর মুখ পানে চাহিয়া, তার পর গোলন্দাজের মুখ পানে চাহিয়া, সেইরূপ হাসি হাসিল—দুই জনে যেন বলাবলি করিল—"তোপ জিতিয়া লইয়াছি।" দেখিয়া শুনিয়া, গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চীৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ রক্ষা কর!" "শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম সেই উত্থিত তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই, ক্ষিপ্রহস্ত, অদ্বিতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সীতারাম, সেই তোপ ফিরাইয়া আপনার সূচীব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। সীতারামের হাতে তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিরামশূন্য গভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত লৌহপিণ্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমান সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারি দিকে পলাইতে লাগিল। সূচীব্যূহের পথ সাফ! তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমানকটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুঠিতে লাগিল।

এইরূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়ন্তী! সেই গোলন্দাজ কে?"

জয়ন্তী। যাহাকে মহারাজ কাটিয়া ফেলিয়াছেন?

শ্রী। হাঁ, তুমি মহারাজকে কাটিতে নিষেধ করিয়াছিলে কেন?

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। না হয় একটু চোখের জল পড়িবে! তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় না।

জয়ন্তী। চোখের জলই বা কেন পড়িবে?

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধবাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে। সে ব্যক্তি যেই হউক, আমিই তার মৃত্যুর কারণ। আমি তোপের মুখে বুক না দিলে সে অবশ্য তোপ দাগিত। তাহা হইলে মহারাজা নিশ্চিত বিনষ্ট হইতেন, গোলন্দাজকে তখন আর কে মারিত?

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, মহারাজা বাঁচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই হইয়াছে—তবে আর কথায় কাজ কি

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর এ উৎকণ্ঠা কেন?

শ্রী। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে। আমি তোমাকে দেবী বলিয়াই জানি, কিন্তু যখন তুমিও লোকালয়ে লৌকিক লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিলে, তখন আমার সন্ন্যাসবিভ্রংশের কথা কেন বল?

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি। আমি সে স্থানে একটা চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছি—রাত্রেও সে স্থানের ঠিক পাইব। কিন্তু আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বলিয়া দুই জনে খড়ের মশাল তৈয়ার করিয়া তাহা জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। চিহ্ন ধরিয়া জয়ন্তী অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিল। সেখানে মশালের আলো ধরিয়া তল্লাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃত দেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের

রাশীকৃত পাকা চুল ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল; শ্বেত শ্মশ্রু ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল। তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না—গঙ্গারাম বটে।

শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "বহিন্, যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভৎ'সনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এত দিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তাহা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুই বার জীবন লাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাই হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, আবার পাপ করিতে আসিয়াছিল। বোধ হয়, রমার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা জানে না, ছদ্মবেশে ছলনা দ্বারা তাহাকে লাভ করিবার জন্যই মুসলমান সেনার গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল। কেন না, রমা তাহাকে চিনিতে পারিলে কখনই তাহার সঙ্গে যাইবে না মনে করিয়া থাকিবে। বোধ হয়, শিবিকাতে রমা ছিল মনে করিয়া, তোপ লইয়া পথ রোধ করিয়াছিল। যাই হোক, উহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া, উহার দাহ করা যাক আইস।

তখন দুই জনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।

পরিশিষ্ট

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ইতিপূর্ব্বেই পলাইয়া নলডাঙ্গায় বাস করিতেছিলেন। সেখানে একখানি আটচালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ—সে ত জানাই ছিল। গড় টর সব মুসলমানে দখল করে লুঠপাঠ করে নিয়েছে।

রাম। রাজা রাণীর কি হ'লো, কিছু ঠিক্ খবর রাখ?

শ্যাম। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের না কি বেঁধে মুর্শিদাবাদ চালান দিয়েছে। সেখানে না কি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম। আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুন্‌তে পাই যে, তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন। তারপর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকেই কত রকম বলে! আবার কেউ কেউ বলে, রাজা রাণী না কি ধরা পড়ে নাই—সেই দেবতা এসে তাদের বার ক'রে নিয়ে গিয়েছেন। তার পর নেড়ে বেটারা জাল রাজা রাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে শূলে দিয়েছে।

রাম। তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাস মাত্র।

শ্যাম। তা এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা না হয় মুসলমানের রচা। তা যাক্ গিয়ে—আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি, এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা তত্তক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।

সীতারাম

টীকা

প্রথম খণ্ড

'সীতারাম' তিন খণ্ডে বিভক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাসেই এইরূপ খণ্ড বিভাগ আছে। নাটকের অঙ্ক-বিভাগের মত উপন্যাসের কথাবস্তুর প্রারম্ভ, পুষ্টি, পরিণতি ও অবসানের সীমারেখাগুলি সৃষ্টি করিয়া দেখানো হয়ত বঙ্কিমের উদ্দেশ্য। এক একটি খণ্ডের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়কে লেখক নাম দিয়া সুচিহ্নিত করিয়াও দিয়াছেন। বঙ্কিমের নাটকীয় শিল্পের উপরেও প্রচুর অধিকার ছিল। তাঁহার সংলাপগুলি সেদিকে চমৎকার।

'সীতারামের' তিন খণ্ডের নাম ও অর্থ বুঝিবার মত। প্রথম খণ্ডের বঙ্কিম নাম দিয়াছেন 'দিবা—গৃহিণী', দ্বিতীয় খণ্ড—'সন্ধ্যা—জয়ন্তী,' তৃতীয় খণ্ড—'রাত্রি—ডাকিনী।' একত্র মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যায়, এই উপন্যাসের অভ্যুদয় হইতে ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তি 'দিবা, সন্ধ্যা, রাত্রি' এই কাল-মত তিনটি শব্দের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অভ্যুদয়-কালের 'গৃহিণী' কথাটি দ্বারা কাহাকে বঙ্কিম উল্লেখ করিয়াছেন? 'অদৃষ্টক্রমে স্বামি-সহবাস-বঞ্চিতা' 'শ্রী'কে সত্যই 'গৃহিণী' বলা চলে কি? বলা চলে এই জন্য যে, শ্রী গৃহিণী-মনোভাবাপন্না (দ্রষ্টব্য: ১।৬ পরিচ্ছেদ); কার্যত যদিও শ্রী এই খণ্ডে সীতারামের নিকট সুন্দরী (১।৩) ও বিজয়িনী 'চণ্ডী' রূপেই (১।৪) পুনরাবির্ভূতা হইলেন। সমস্ত খণ্ডটি তথাপি সেদিনের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন উদ্যোগী জমিদারের গৃহ-ধর্মের সুরে বাঁধা; শ্রীর জীবনেও সেই সুর ছাড়া এই খণ্ডে অন্য কোনো সুরের ব্যঞ্জনা নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড—'সন্ধ্যা-জয়ন্তী'। ইহা সীতারামের সৌভাগ্যের কাল; কিন্তু জীবনের মধ্যাহ্নকাল নয়,—'সন্ধ্যা'। আঁধার নামিতেছে—তবে এখনো সন্ধ্যার গৈরিক রাগে সর্বদিক রঞ্জিত—তাই হিন্দুরাজ্যের সম্ভাবনা একেবারে মিথ্যা হয় নাই, সীতারামও পুরুষ-সিংহ। এই গৈরিকরাগের উৎস 'জয়ন্তী'—'শ্রী' তাঁহার সহচরী, ছায়া-সমতুল্যা, তাঁহারই শিক্ষা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধা।

কিন্তু 'শ্রী' 'জয়ন্তী' ন'ন, জয়ন্তীর মত তিনি আত্মস্থা ও স্থিরলক্ষ্যাও ন'ন, তাহারও ইঙ্গিত এই খণ্ডে প্রচুর। তাই তৃতীয় খণ্ডে 'রাত্রি' নামিল, নিশান্ধকার ঘনাইয়া আসিল—তাহাতে 'শ্রী' ব্রহ্মচারিণী নিষ্পাপা বৈরাগিনী থাকিলেও হিন্দুরাজ্যের সম্ভাবনার দিক হইতে, লোক-সাধারণের ইষ্টানিষ্টের দিক হইতে, 'সীতারামের' নিজ জীবনের দিক হইতেও রাত্রি-রূপে প্রতিভাত হইলেন। হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হইল, বীর মহাপ্রাণ সীতারাম দানবে পরিণত হইলেন ;— তারপর সীতারাম সপরিবারে 'বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ' হইলেই বা কি (৩।২৩) ?—জয়ন্তী ও শ্রী অন্ধকারে মিশিয়া গেল (৩।২৪)—কারণ হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে,—রাত্রির অন্ধকারে সব ছাইয়া গিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্যারা ১। **পূর্ব্বাঙ্গালায় ভূষণা**—যশোহর জেলার (পূর্ব পাকিস্তানের) মাগুরা মহকুমার মাগুরা সহরের ১৬ মাইল পূবে। 'ভূষণা মোগল যুগে জেলার শাসন-কেন্দ্র ছিল।' তাহারও পূর্বে···এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশের রাজধানী ছিল এইখানে। সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ এখানে সাজোয়াল—প্রধান তহশীলদার ও কার্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া আসেন— "১৬৭০-এর কাছাকাছি" (যদুনাথের 'ঐতিহাসিক ভূমিকা')। বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল মাগুরার মহকুমা-হাকিম ছিলেন—(১৮৬১-৬৩)। **পূর্বাঙ্গালা**—খুলনা জেলা কার্জনি ব্যবস্থায় পশ্চিম বাঙলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু প্রাক্-কার্জন যুগেও কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্র খুলনাকে (ও যশোহরকে) 'পূর্ব বাঙ্গালা' বলিয়াই জ্ঞান করিতেন, তাহা লক্ষণীয়। পশ্চিম বাঙলার অধিবাসীরা সাধারণভাবে ইহাই ঠিক মনে করিতেন। **'ফৌজদার'**— একাধারে তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষ (ও-সি) ও শাসক (ম্যাজিষ্ট্রেট) ছিলেন। কেবল রাজস্বের ভার থাকিত তহশিলদারের (কলেক্টরের) উপর।

প্যারা ২। 'আজি হইতে প্রায় একশত আশী বৎসর পূর্বে'— গ্রন্থাকারে সীতারাম প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে, তাহা হইলে প্রথম পরিচ্ছেদের ঘটনাকাল ১৭০৭। সীতারাম রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যভোগ করেন ১৬৯৯-১৭১২ পর্যন্ত; ১৭১৪এ তাঁহার ধ্বংস ও মৃত্যু ঘটে। (যদুনাথ, 'ঐতিহাসিক ভূমিকা')।

প্যারা ৭। 'কবিরাজ **তার** মাকে দেখিল'—'তার' কথিত বাঙলার শব্দ, লিখিত ভাষায় 'তাহার' হওয়া উচিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্যন্ত কথিত ও লিখিত ভাষার রূপ সুনির্দিষ্ট হইয়া উঠে নাই। বঙ্কিম সংলাপ-রচনায়ও লিখিত ভাষাই ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তায় বহুস্থলে কথিত রূপও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন—একই বাক্যে দুই রূপ মিশাইয়াও ফেলিয়াছেন (দ্রষ্টব্য : পাঁচকড়ির মায়ের কথা)। আজ কিন্তু একই রচনার ভাষায় এইরূপ কথিত ও লিখিত রূপ মিশাইয়া ফেলিলে কোন পরীক্ষার্থী ছাত্রেরই মার্জনা নাই—তাহা স্মরণীয়।

প্যারা ৮। **'পাইকেরা জাতিতে ডোম'**—সেদিনের জমিদারের ইহারাই ছিল পাইক। ইহারা রণকুশল ও দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিল। 'ধর্ম্মমঙ্গলে'র কালু ডোম ইহার প্রমাণ। 'আগে ডোম, বাঘা ডোম, ঘোড়া ডোম' ছড়ায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি যে সমর-যাত্রার বিবরণ পান, তাহাতে ডোমদেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

প্যারা ১১। **'হামরাহি পাইক'**—হামরাহি—সহযাত্রী ; কিন্তু এইখানে 'প্রহরী পাইক।'

প্রথম পরিচ্ছেদে ফকিরের অত্যাচারের কাহিনীটিতে এই গ্রন্থের তৎকালীন পশ্চাৎপট ও সীতারাম-গঙ্গারামের জীবনের ভূমিকা বঙ্কিম রচনা করিয়াছেন।

প্যারা ৯। **কাফের**—আর্‌বী—মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসহীন ; নিন্দার্থে অ-মুসলমানদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়। **বদ্‌বখত্**—ফার্‌সী—মন্দ-ভাগ্য। **বেতমিজ**—ফার্‌সী—জ্ঞানহীন, মূর্খ।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের মতে এইরূপ কাহিনী সমসাময়িক কালের সত্যানুযায়ী (দ্রষ্টব্য : ঐতিহাসিক ভূমিকা)। তথাপি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ইহাতে অল্পাধিক ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু তাহা মার্জনীয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই উপন্যাসের মূল দুইটি ভাব-বস্তুর বীজ উপ্ত হইল। (১) শ্রীকে দেখিয়া সীতারাম সর্বাগ্রে বলেন—'তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!'; (২) সীতারাম শ্রীর মুখে নিজের জীবনাদর্শের সন্ধান পাইলেন, 'হিন্দুকে

হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে'। উপন্যাসের দিক হইতে এই পরিচ্ছেদ অতিশয় মূল্যবান।

প্যারা ৩। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামি-সহবাসে বঞ্চিতা। অর্থাৎ 'আনন্দমঠে'র শান্তি ও 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্লর মতই তাহার অবস্থা (দ্রষ্টব্য : 'চরিত্র চিত্র')। বাঙালীর জীবনযাত্রায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কর্মিষ্ঠ নারীচরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনও বঙ্কিম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বাঙালী নারীর এইরূপ দুর্ভাগ্য তখন (১৮৮৭ সালে) এতই সাধারণ ব্যাপার ছিল যে, এইরূপ উক্তিকে মানিয়া লইতে পাঠকের মোটেই বাধিত না। এখনই বা তাহাতে কতটা বাধে?

প্যারা ৬। দ্বারবান্-ভাণ্ডারী প্রভৃতি মানুষদের এই রেখাচিত্র বঙ্কিমের একাধিক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। মোটামুটি ইহাদের চিত্রাঙ্কনে বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত; এই সব চিত্র তাঁহার চমৎকার দৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক, তাঁহার রসিকতারও খোরাক; বঙ্কিম ধরিয়াই লইয়াছেন—ইহারা 'পশ্চিমা' (ভোজপুর, মগধ, অযোধ্যার লোক); তৎকালীন জমিদারদের বরকন্দাজ, দারোয়ান ইহারাই ছিল। এই অনুমান ঐতিহাসিকের বিবেচনায়ও সত্য—ঐ সব ভোজপুরীদের,—ব্রাহ্মণ ও ছত্রি পশ্চিমাদের বরাবরই বাঙলা দেশে সিপাহি, বরকন্দাজ হিসাবে চাহিদা ছিল। অনুন্নত শ্রেণীর অবাঙালীদের লইয়া পরিহাসের একটা রেওয়াজ তখন বাঙলা সাহিত্যে সৃষ্টি হইতেছিল।

বাঙলার পরিবর্তে যেখানে বঙ্কিম অন্য ভাষা ব্যবহার করিতেছেন, সেই স্থানগুলি লক্ষণীয় : (১) ফকির বলিতেছেন (১।১) আরবী মিশানো হিন্দুস্থানী বা উর্দু, মুসলমান মাত্রেরই চক্ষে ঐরূপ ভাষা (নিতান্ত অকারণে হইলেও) স্বাভাবিক বলিয়া ঠেকিবে। বঙ্কিম হয়তো ভাষা-শুদ্ধ ফকিরকেই বিদ্রূপ করিতে চাহেন। (২) মিশির ঠাকুর (১।২) হিন্দী বলিতেছেন—এখানেও হয়তো ভাষা-শুদ্ধ চরিত্রটি বঙ্কিমের বিদ্রূপ-পাত্র। (৩) ওড়িয়া সাধারণ লোক—(১।১২) হাস্যকর ধারণা হাস্যোদ্রেক করিবার জন্য ওড়িয়া ভাষায় দেওয়া হইয়াছে; ওড়িয়া পণ্ডিতদের কথা দেওয়া হইল বাঙলায় (বাঙালদের ভাষার মত ওড়িয়া ভাষাও বাঙালী লেখকদের একটা হাস্যরচনার Stock in trade—মালমশলা।)

বলা বাহুল্য, কথাবার্তার ভাষা নাট্যশিল্পীর ন্যায় শিল্পসম্মত নিয়মেই বঙ্কিম ব্যবহার করিয়াছেন—যে চরিত্রের মুখে যে স্থানে, যে কালে, যেরূপ ভাষা ব্যবহার করা সাজে, অর্থাৎ যাহার মুখে যে ভাষা শুনিলে **পাঠক মনে করিবেন** উহাই স্বাভাবিক,—বঙ্কিম সে চরিত্রের মুখে সে ভাষাই সে স্থলে জোগাইয়াছেন। এই সাধারণ শিল্প-নিয়মের সঙ্গে প্রাচীন শিল্প-কর্মের একটা রীতি দাঁড়াইয়াছিল—উচ্চবর্গের চরিত্রের মুখে এবং নায়ক প্রভৃতি সম্মানিত চরিত্রের মুখে সাধারণ একটি 'ভদ্রভাষা' ও 'ভদ্রভাব' জোগানো, আর নিম্ন-বর্গের চরিত্রের মুখে সাধারণত নিম্নশ্রেণীর মৌখিক ভাষা জোগানো। নিম্ন-বর্গীয়দের কথন কথন অবতারণা করা হইত সাধারণ রঙ্গরস বা ব্যঙ্গবিদ্রূপের জন্য; তাই ভাবে ও ভাষায় তাহাদিগকে অমার্জিত দেখাইতে হইত; প্রয়োজন মত তাহারই মধ্যে ফুটানো হইত তাহাদের সরলত্ব, প্রভুভক্তি, সাহস প্রভৃতি ভাব। এই মূল সাহিত্য-রীতির ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু মোটের উপর সেক্স্পীয়র হইতে বঙ্কিম পর্যন্ত প্রাচীন সাহিত্যে সাধারণ মানুষের এই চিত্রই আমরা বেশি দেখিতে পাই। সাহিত্যে জনসাধারণ তাহাদের বিশিষ্টতায় পরিগণিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র সম্প্রতি। প্রসঙ্গত তাই ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য : কোনো জাতির সাধারণ মানুষ, শত করা নব্বুই জন, যে ভাষায় কথা বলিত, সে ভাষার রূপ বুঝিতে হইলে তাহাদের মুখে জোগানো এই স্থূল কথাবার্তা হইতেই তাহা উদ্ধার করিতে হইবে। হ্যামলেটের মুখ হইতে তত নয়, বরং সমাধি-খনকদের মুখ হইতে বেশি করিয়া জানিতে পারিব সেক্স্পীয়রের যুগের ইংরেজি ভাষার উচ্চারণরীতি, ব্যাকরণ-গত রূপ। বঙ্কিমের মুরলা, পাঁচকড়ির মা, জীবন ভাণ্ডারী প্রভৃতিদের কথা হইতে জানিতে পারিব বঙ্কিমের সমকালীন বাঙলাভাষার উচ্চারণরীতি, ব্যাকরণগত রূপ কি ছিল; সীতারাম-চন্দ্রচূড়ের কথায় তাহা পাইবার সম্ভাবনা অনেক কম। অবশ্য তখন পর্যন্ত বাঙলার মৌখিক ভাষার লিখন-পদ্ধতি সুস্থির হয় নাই; বঙ্কিমও কখন কখন মৌখিক ও লিখিত রূপ মিশাইয়া ফেলিতেন।

প্যারা ৯। **বেপমানা**:—কম্পমানা; বেপ্+শানচ্ (কর্তৃ)। **"তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!"** প্রথম সংস্করণে—'এত সুন্দরী'—এই পরম মূল্যবান কথা দুইটি ছিল না। বঙ্কিমের সাহিত্যিক দৃষ্টির উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই কথা দুইটির সংযোগ। আর, বঙ্কিমের সাহিত্যিক শ্রমশীলতার ও শিল্পনিষ্ঠারও

প্রমাণ এই যে, তিনি বারে বারে আপনার লেখাকে ঘষিয়া মাজিয়া উন্নত করিতে চাহিয়াছেন; যাহা একবার লিখিয়াছেন তাহা লইয়া বরাবর সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাই 'সীতারামে'র বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ এই জন্য দ্রষ্টব্য) তুলনা করিলে বঙ্কিমের এই পরিমার্জনার ও শিল্পদৃষ্টির বিস্ময়কর পরিচয় লাভ করা যায়। এই টীকার সর্বত্র বিভিন্ন পাঠভেদের উল্লেখের স্থান নাই। কিন্তু কেবল একটি মাত্র স্থলে ছাড়া (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য: শাহ ফকিরের সঙ্গে সীতারামের সাক্ষাৎ, প্রথম সংস্করণের 'ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ',) বঙ্কিমের বিচারবুদ্ধি ও নির্মম পরিবর্জন শক্তির প্রশংসা প্রায় সর্বত্রই করিতে হয়।

'তুমি শ্রী! এত সুন্দরী'—উপন্যাসে শ্রী ও সীতারামের প্রথম পরিচয়েই সীতারামের মুখ হইতে নির্গত হইল এই প্রথম উক্তি। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে,—সীতারামের জীবনে, তাহার পরিবারে, তাহার রাজ্যে—শ্রীর জন্য সীতারামের এই রূপজ মোহ প্রলয় কাণ্ড ঘটাইবে, লেখক তাহাই জানাইয়া দিলেন। (তুলনীয়: বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের অনুরূপ ঘটনা, যথা কপালকুণ্ডলা: 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?')। ইহার পরে যখন শ্রী আবার তেজস্বিনী, সিংহ-বাহিনী, ঐশ্বর্যময়ী মূর্তিতে প্রকাশিত হইবেন, তখন গুণবিমুগ্ধ সীতারামে এই গুণগুলিই মূল রূপান্ধতার সমধিক পোষকতার কারণ হইবে, কিন্তু সীতারামের বিকৃত পারিপার্শ্বিকে তাহা রূপজ মোহের ও চিত্তবিকৃতিরই কারণ হইয়া উঠিবে।

'যায়'—মরণের পথে, আসন্ন সংকটে। তুলনীয়: যা 'দশা', 'যায়-যায়' ইত্যাদি। **হাবুজখানা**—কয়েদখানা, জেলখানা। হাবুজ (আঃ)—কয়েদ। **'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?'**—এমন একটা জলন্ত কথা বঙ্কিমের বহু চিন্তা-ভাবনা-সংঘর্ষ-সঙ্কুল চিত্ত হইতেও আর বেশি বাহির হয় নাই। হিন্দু-জাতীয়তাবাদ রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ও হিন্দুমেলার প্রবর্তকগণের চেষ্টায় প্রথম জন্মলাভ করে। একালের হিন্দু-জাতীয়তাবাদের ও বাঙালী 'পেট্রিয়টিজমে'র মন্ত্রগুরু বঙ্কিম। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই ইহার উন্মেষ হইতে থাকে। আধুনিক কালে এই বাণী হিন্দু মহাসভার প্রধান সংগঠন-মন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দুরাষ্ট্রের বীজমন্ত্রটি সীতারামের মনে বপন করিলেন শ্রী—চন্দ্রচূড় নয়, জয়ন্তী নয়—শ্রী। আপনার ভাই-এর বিপদ হইতেই কি শ্রী এই কথা উপলব্ধি

করিয়াছেন—না নারী-জীবনের তৎকালীন আশঙ্কা হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন ? না, উহা বঙ্কিমেরই এক সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ? এই বৃহৎ তত্ত্বটি শ্রীর মুখে জোগাইয়া প্রারম্ভেই শ্রীর জ্ঞানবুদ্ধি সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করা। শ্রীর চরিত্র-বিচারে এই পরিচ্ছেদ, বিশেষত তাহার এই যুক্তিপূর্ণ, মর্যাদাময় নিবেদনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

প্যারা ১০। 'শ্রী এমন শ্রী ?' ইত্যাদি—সৌন্দর্যমোহসূচক এই কথাগুলি প্রথম সংস্করণে ছিল না। সীতারাম সেখানে শুধু মনে মনে ভাবিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?" কিন্তু বঙ্কিমের পরিণত শিল্পচেতনা সমস্ত জিনিসটিকে নূতন আলোকে বিমণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। তাই শ্রী চলিয়া গেলে সীতারাম আবার ভাবিলেন, 'শ্রী এমন শ্রী ?…আগে শ্রীর কাজ করি, পরে অন্য কথা।'—'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?'—ইহা ভাবিলেন পরে, ইহা যেন কতকাংশে অনুচিন্তন—after-thought। সীতারামের অন্তর্জীবনের দিক হইতে ইহা প্রথমাবধিই গৌণ ; একেবারে মিথ্যা নয়, তবে প্রধানতম চিন্তা নয়। 'শ্রীর কাজ আগে।'—সীতারাম চরিত্রের প্রধান সত্যটি এই পরিচ্ছেদেই বঙ্কিম ইঙ্গিত করিয়াছেন—শ্রীর রূপমোহই তাহাতে প্রধান, হিন্দুরাজ্যের আদর্শ সে তুলনায় গৌণ। দুঃসাহসী বীর যাহাকে বলে, সীতারাম তাহা ন'ন, বিরোধে, বিদ্রোহে স্বভাবত ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহেন না। তিনি উদার, উদ্যোগী মানুষ, কিন্তু কলহবিমুখ, বিবেচনাশীল, উন্নতিকামী। হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার মত মানুষ কি এই সীতারাম ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড় ঃ—যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুমান চন্দ্রচূড় দেওয়ান যদুনাথ গাঙ্গুলী (উপাধি মজুমদার) হইতে পারেন। কিন্তু এই চরিত্রের মূল একটি বঙ্কিম নির্দেশ করিয়াছেন—তাঁহার সমকালীন দাঙ্গাবাজ দুর্ধর্ষ কোনো কোনো অধ্যাপক পণ্ডিত। অন্য মূলটি আসলে বঙ্কিম স্বয়ং—যিনি পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া নূতন করিয়া হিন্দুসমাজ ও হিন্দু-সংস্কৃতি গঠনের স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। চন্দ্রচূড় তাঁহার মনঃপূত চরিত্র ; কিন্তু উপযুক্ত শিল্পবোধ থাকাতে বঙ্কিম তাঁহাকে লইয়া ভাবাবেগ প্রদর্শন করেন নাই, ইহা তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই চতুর্থ পরিচ্ছেদ প্রথম খণ্ডের কেন্দ্রস্থল—ঘটনাস্রোত এইবার পাথর ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল, আর তাহা চাপা পড়িবে না। বঙ্কিমের যে কোনো উপন্যাস পড়িতে গেলেই মনে পড়িবে—ঘটনার এই অব্যাহত গতির কথা। এই জাতীয় অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত এক-একটি অবস্থা (situation) অঙ্কনে,—বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত। যেমন প্রথম দিকে বধ্যভূমির জনতার চিত্র, তেমনি সুনিপুণ সীতারাম, কাজি সাহেব ও শাহ সাহেবের কথোপকথন (নাটকোচিত আবেগ—tension—তাহাতে প্রচুর),—লঘু হস্তের হাস্যরসাত্মক হাল্কা টান ক্রমশ ঘন ও দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। তারপর সীতারামের বন্ধনাদেশে ঘটনা যখন জমিয়া উঠিয়াছে, tension তীব্র, পরিস্থিতি অতি সঙ্কটময়, তখন এক মুহূর্তে যেন আকাশ ফাটিয়া গেল—ঘটনাস্রোত পৃথিবী ছাড়িয়া একবারে দিগ্‌দেশে ছড়াইয়া পড়িল শ্রীর অদ্ভুত অভাবনীয় রূপান্তরে। রোমান্‌সের অপ্রত্যাশিত বিস্ময়-ঘন অদ্ভুত রস বঙ্কিম পরিবেশন করিয়াছেন নাটকোচিত ঘটনা-বর্ণনায় ও মহা-কাব্যোচিত বীররসের মিশ্রণে।

প্যারা ১। ‘ফরদা জায়গা’—উন্মুক্ত জায়গা। ফর্‌দ্ (আরবী)—উন্মুক্ত।

প্যারা ১১। কাজি সাহেবের সহিত সীতারামের কথোপকথনে আমরা সীতারাম চরিত্রের মহত্বের দিকটি প্রথম পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পাই—সম্মানিত, উদ্যোগী পুরুষ তিনি ; কিন্তু রাজভক্ত, আর তেমনি উদার, সত্যবাক্ ও ধর্মানুরক্ত।

কথোপকথনের ভাষা উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই ভাষা বঙ্কিমের চক্ষে দরবারী ভাষার সমতুল্য ; ইহা ফার্‌শী নয়, আর্‌বী ফার্‌শী মিশানো বাঙলা। ফকিরই শুধু হিন্দুস্থানী বলিতেছেন, কিন্তু কাজি সাহেব ও সীতারাম বলিতেছেন এই ‘দরবারী বাঙলা’। আর্‌বী-ফার্‌শী শব্দগুলি মুসলমানের হিন্দুস্থানী কথাবার্তায় এখনো সুপ্রচলিত।

‘মেজাজ শরীফ’—মেজাজ বিশুদ্ধ ; **‘মেজাজে মবারকের’**—পবিত্র মেজাজের ; **‘উমর’**—বয়স ; **‘বাল সফেদ’**—চুল শাদা ; **‘কাজা’ পৌঁছিলে**—মৃত্যু হইলে। **‘একবালে’**—প্রতাপে ; **‘দৌলতখানা’**

—গরীবখানা—ঘরদুয়ার। **'বদ্‌বখ্‌ত্‌'** (ফার্‌সী)—হতভাগা; **'বেতমিজ'** (ফার্‌সী)—মূর্খ; **'মেহেরবান'** (ফার্‌সী)—দয়ালু; **'কদরদান'** (ফার্‌সী) —গুণগ্রাহী, পরোপকারী।

এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম্ম—শরণাগতকে রক্ষা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা—ইহা হিন্দুর ধর্ম বটে। কিন্তু উহা কি অন্য কাহারও ধর্ম নয়? **'জয় কাজি সাহেবকা'**—পরেও এই হিন্দী 'কা' 'কী' বিভক্তি-যোগে জয়ঘোষণা এই গ্রন্থে আরও কয়েকবার পাওয়া যাইবে। 'গান্ধীজী কী জয়' শুনিয়া অনেকে মনে করিতেন, একালের হিন্দুস্থানীদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া বাঙালী 'গান্ধীজীর জয়' না বলিয়া বলে 'গান্ধীজী কী জয়।' বঙ্কিমের এই সব কথা হইতে বুঝিতে দেরী হইবে না—১৮৮৪ হইতেই এইরূপ আধা-হিন্দুস্থানী প্রত্যয়-যোগে জয়ঘোষণার রেওয়াজ বাঙলা দেশে চলিয়া আসিতেছে। অথবা, বাঙ্গালা বিভক্তি দিয়া উহার চাইতে জোরাল শব্দ বঙ্কিমও ভাবিতে পারেন নাই। **'রাজা ঔশীনর'** ইত্যাদি:—উশীনর—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিশেষ। উশীনরের পুত্র এই অর্থে অণ্‌ প্রত্যয় করিয়া ঔশীনর। ইঁহার নাম শিবি। রাজা শিবির উপাখ্যানটি এই:—রাজা শিবির পরীক্ষা হইবে। শরণাগতকে রক্ষা করা রাজধর্ম। অগ্নি আর ইন্দ্র শিবিকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন; অগ্নি কপোত-রূপী, ইন্দ্র শ্যেন-রূপী। কপোতকে তাড়া করিয়া আসিতেছে শ্যেন অর্থাৎ বাজ-পক্ষী। কপোত আসিয়া শিবির শরণ লইল; পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া আসিল শিকারী বাজ। রাজা কিন্তু শরণাগত কপোতকে ছাড়িয়া দিবেন না—কিন্তু বাজপাখীই কি তাহার আহার্য হইতে বঞ্চিত হইবে? ঔশীনর শিবি তখন স্থির করিলেন, সেই কপোতের ওজনে মাংস নিজের দেহ হইতে কাটিয়া দিবেন। তুলাদণ্ডে কপোতকে একদিকে রাখিয়া রাজা ঔশীনর নিজ উরু হইতে মাংস কাটিয়া দিতে লাগিলেন। যত কাটেন, কপোতের ওজনের মাংস যেন কিছুতেই দেওয়া হয় না—কপোত এত ভারী। শেষে রাজা যখন নিজেকেই দিতে যাইতেছেন, তখন দেবতারা আত্মপ্রকাশ করিলেন। ঔশীনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন—শরণাগতকে সত্যই তিনি প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতে পারেন। (দ্রষ্টব্য: মহাভারত ৩।১৩১)। এই ক্ষেত্রে ঔশীনরের অনুরূপ এই পরমধর্ম পালনই সীতারামেরও সঙ্কল্প।

প্যারা ১২। **'সরায়'**—শরা (আর্‌বী), বিধান।

গঙ্গারাম কাপুরুষও নহে, অধার্মিকও নহে; সাহস ও ক্ষিপ্রতা তাহারও যথেষ্ট আছে, এই পরিচ্ছেদে তাহা আমরা জানি। কিন্তু মোহবশে গঙ্গারাম সবই খোয়াইল—তখনো রহিল তাহার দুঃসাহস ও দুরাশা।

প্যারা ২৬। 'এই মার-মার শব্দ···সভয়ে চিনিলেন, শ্রী।' —যে অপূর্ব দৃশ্যটি বঙ্কিমের পরিণত লেখনী এখানে চিত্রিত করিয়াছে, তাহার তুলনা বঙ্কিম-সাহিত্যেও দুর্লভ। যে শ্রীকে এখানে আমরা দেখিলাম—সীতারাম দেখিলেন,—তাহা কিন্তু শ্রীর সাধারণ রূপ নয়; অন্তরের ও বাহিরের অভাবনীয় সংকটে শ্রী তখনকার মত প্রায় আত্মবিস্মৃত। তাই উত্তেজনার শেষে শ্রী ভূতলে পড়িয়া সম্পূর্ণ মূর্চ্ছিত হইলেন না, 'মূর্চ্ছিতপ্রায়' হইলেন। অতএব বলা চলে—এই রূপ শ্রীর সাধারণ রূপ না হইলেও তাঁহার মধ্যে এই অসাধারণ মহিমময়ী তেজস্বিতা সুপ্ত ছিল—ঘটনার সমাবেশে তাহা জাগ্রত হইতে পারিত। সীতারামও তাহাই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এই অসামান্যতা আর এই দিকে প্রকাশ পাইল না, চক্ররেখায় যে দিকে ঘুরিয়া গেল, তাহাতে তিনি জোয়ান অব্ আর্ক হইলেন না, হইলেন সংশয়-সংকোচগ্রস্তা একজন 'নান্' বা বৈরাগিনীমাত্র; আর হইলেন সীতারামের বিকার, অধর্ম, শোচনীয় ট্র্যাজিডির প্রধানতম কারণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ব সংস্করণে এই পরিচ্ছেদ এইরূপে শেষ হয় নাই। সীতারাম এই দৃশ্যটির কথা ভাবিতে লাগিলেন; অবশেষে তাঁহার হৃদয় শান্ত শীতল হইল—যখন তিনি বুঝিলেন 'ধর্মই ধর্ম-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের উপায়' (বড় হরফে লেখা)। সীতারামের জবানীতে ইহা বঙ্কিমেরই জবানবন্দী। অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিশ্চয়ই এই অংশ পাঠ করিবেন, এবং রসগ্রাহী পাঠক নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন—বঙ্কিম প্রত্যক্ষভাবে এই তত্ত্বব্যাখ্যার লোভ সংবরণ করিয়া আপনার শিল্প-দৃষ্টি অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছেন। উপন্যাসের ভাব-বস্তুর কেন্দ্র 'ধর্মরাজ্য' না হইয়া, হইয়া উঠিয়াছে ব্যক্তি-জীবন,—'শ্রী এত সুন্দর!'

প্যারা ১। 'ফত্তে'—জয়। **'চোরা গরুর অপরাধে কপিলার বন্ধন'**—ইহার অন্য রূপ—'চোরা গোরুর সঙ্গে কপিলার বন্ধন', ইহার অর্থ—দোষীর সংসর্গে থাকিলে নিরপরাধ ব্যক্তিও দোষীর সহিত কষ্ট পায়। এই অর্থে

এখানে অর্থসঙ্গতি স্পষ্ট। বশিষ্ঠের কপিলা ধেনুর সহিত এই প্রবাদের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না; অন্তত অর্থসঙ্গতি নাই। কেহ কেহ মনে করেন—'কপিলা' কপিলমুনি অর্থে প্রযুক্ত এবং চোরা গোরু নয়, চোরা ঘোড়া। ইন্দ্রদেব সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব চুরি করিয়া ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির নিকট রাখিয়া আসেন। অশ্বরক্ষকগণ মুনির নিকট অশ্ব দেখিয়া তাঁহাকেই অশ্ব-চোর মনে করে এবং তাঁহার লাঞ্ছনা করে। এ কাহিনী সকলেরই সুবিদিত।

অংশটি সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের চিত্র হিসাবে চমৎকার। একটু বাড়াবাড়ি থাকিলেও এই হিসাবে পরিবর্জিত 'নবম পরিচ্ছেদ'ও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আসলে বঙ্কিম সেখানে সেকালের নবাবী আমলের সিপাহীদের কার্যধারা বর্ণনায় একালের পুলিশের চোরডাকাত ধরিবার ধরণ-ধারণ চিত্রিত করিয়াছেন। সে পরিচ্ছেদের আসল কথা সীতারামের জেলভাঙ্গা; বঙ্কিম তাহা বর্জন করিয়া ভালই করিয়াছেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ এই খণ্ডের ও গ্রন্থের একটি মূল গ্রন্থিকে গোচর করিয়া দিয়াছে—কেন শ্রী স্বামি-সহবাস-বঞ্চিতা। কারণ, কোষ্ঠীর গণনানুসারে সে 'প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী' হইবে, আর স্ত্রীলোকের 'প্রিয়' তাহার স্বামী। এই কোষ্ঠীর গণনা ও উহার ব্যাখ্যা সীতারাম, শ্রী, জয়ন্তী, পরে মহাপুরুষ গঙ্গাধর স্বামী সকলেই বিনা প্রশ্নে মানিয়া লইয়াছেন। অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, 'প্রিয়' অর্থে প্রিয়তম নয়, সহোদর গঙ্গারাম। অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাইবার জন্য গ্রীক্ রাজা লেয়াস্ ও রাণী জোকাষ্টা পুত্র ঈদিপাসকে বিসর্জন করিয়া যেমন অদৃষ্টের বিধানকেই অব্যর্থ করিয়া তুলিলেন, তেমনি ইঁহারাও কোষ্ঠী ও তাহার যুক্তিযুক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া সীতারামের জীবনের ট্র্যাজিডিকেই ঘনাইয়া আনিলেন। কিন্তু ইহাতে কি এই কথাই প্রমাণিত হয় না যে—এই জাতক-বিচার ও কোষ্ঠী বিচার করিয়া ভবিষ্যৎকে ঠেকানো যায় না—আসলে জানাও যায় না?—ভবিষ্যৎকে আরও তাহাতে আবর্তসঙ্কুল করিয়া তোলাই সার হয়। বরং সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পুরুষকারের সাহায্যেই জীবন-পথে অগ্রসর হওয়া মানুষের কর্তব্য। এই কর্তব্য-বোধ সজাগ থাকিলে শ্রী ও সীতারামের জীবনে এমন ভাবে বিপর্যয়ের মেঘান্ধকার ঘনাইয়া আসিত না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রী-চরিত্রের মর্যাদাময় ও প্রীতিময় দিকটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। শ্রী দয়া চাহেন না, তিনি বিবাহিতা স্ত্রী, 'সর্বস্বের অধিকারিণী'—যে কোনো সত্যকারের আধুনিক স্ত্রীও ইহার অপেক্ষা বেশি কিছু দাবী করিতে পারিত না। কিন্তু শুধু কি এইটুকুই সত্য? না। হিন্দু-স্ত্রীর আদর্শে শ্রী স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য প্রাণত্যাগ করিতেও মনস্থ করিয়াছেন। শ্রীর চরিত্রে পাতিব্রত্যের এই দিকটিও সমান প্রবল। সেই আদর্শেরই বশে সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখি তিনি 'প্রিয় প্রাণ' রক্ষার মানসে আপনার কর্তব্য তৎক্ষণাৎ স্থির করিয়া ফেলিলেন—'কখনো আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না বা তুমি কখনো আমার নামও শুনিবে না।' ঘটনাচক্রে কার্যত এই কথা অক্ষরে অক্ষরে অনুসৃত হয় নাই—কিন্তু শ্রী মোটের উপর তাঁহার সত্য রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতই কি শ্রী স্বামীর প্রতি অনুরাগকে পরেও একেবারে বিসর্জন দিতে পরিয়াছিলেন? দেবী চৌধুরাণীর মনে প্রফুল্লই ছিল প্রবলা, দেবী নয়। শ্রীর মনেও এই স্বামিপ্রেমই কি প্রবলতর ছিল না? আসলে বঙ্কিমের মনে নারীর এই আদর্শই স্বাভাবিক, এবং সম্ভবত অধিকতর অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আধুনিক 'মনস্তত্ত্ব-প্রধান উপন্যাস' লইয়া যাঁহারা বেশি বাড়াবাড়ি করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, উপন্যাস যদি চরিত্র-প্রধান হয়, তাহাতে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য থাকা নূতন কিছু নয়। ইংরেজীতে রিচার্ডসন, ফিল্‌ডিংকে ভুলিলে চলিবে না; আমাদের পক্ষে বঙ্কিমই কি ভুলিবার মত? এই অষ্টম পরিচ্ছেদটি সীতারামের মনোভাবের বর্ণনা, অর্থাৎ মনস্তত্ত্বমূলক। শুধু তাহাই নয়। প্রথমত লক্ষণীয়—এই মনস্তত্ত্ব বাহির হইতে বিশ্লেষিত হয় নাই, লেখকের ব্যাখ্যাতেও নয়, ইহার পদ্ধতি 'ভিতর হইতে উদ্‌ঘাটন'। সীতারামের ভাবনাধারাই এই পরিচ্ছেদে প্রধানত দেখান হইতেছে। অবশ্য একালের লেখকেরা এই পদ্ধতিটায় উত্তরাধিকার-সূত্রে আরও কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার্য। বঙ্কিমের সংলাপের ভাষার মত এই মনস্তত্ত্ব-বর্ণনাও কাঁচা-পাকা। দ্বিতীয়ত লক্ষণীয়—আধুনিক অনেক উপন্যাসে যে 'চেতনা-প্রবাহ' ('Stream of Consciousness') দেখিয়া আমরা

চমকিত, বিভ্রান্ত ও বিমুগ্ধ হই (যেমন, বাঙলা সাহিত্যে—'আবর্ত,' 'রাত্রি', 'সে ও আমি' প্রভৃতি), বঙ্কিমের এই পরিচ্ছেদে তাহারও একটা চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই (প্যারা ৭)। "কই, যাকে ডাকি, তা ত পাই না···প্রিয়ার উপর বড় প্রিয়া, হৃদয়ের অধিকারিণী।"—উত্তম পুরুষের উক্তি হইতে প্রথম পুরুষের উক্তিতে এই গতায়াত কি পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য ? বঙ্কিমের হাতে যেমন এই পদ্ধতি বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করে নাই, তেমনি বর্তমান কালের অনেকের হাতে পদ্ধতিটি কোথাও একটা কৌশল, অথবা কোথাও একটা দুর্বোধ্য মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য বঙ্কিম 'চেতন-মনের' সুসংবদ্ধ ভাবধারা লইয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—নির্জ্জান মনের কথা ভাবেন নাই, অবচেতন মনের তথাকথিত অসংলগ্ন ভাষা ও অবাধ ভাবনার ('ফ্রি এসোসিয়েশনে'র) কথা বলিবার জন্যও চেষ্টা করেন নাই।

তপ্তকাঞ্চন শ্যামাঙ্গী—শ্যামা শব্দের এক অর্থ তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা নারী।

দ্রষ্টব্য— 'শীতে সুখোষ্ণসর্বাঙ্গী
গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা
সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥

প্যারা ২। রচনা-রীতির দিক হইতে সমস্ত পরিচ্ছেদটি উল্লেখযোগ্য ; এই প্যারাটি আরও চমৎকার। বুঝিতে কষ্ট হয় না, অথচ ভাবে ভাষায় রসসমৃদ্ধ।

প্যারা ৩। চমৎকার মানসিক ভাবধারার চিত্র।

প্যারা ৪। সীতারাম-চরিত্রের মূল আকাঙ্ক্ষাটিকে লেখকই আবার পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন।

প্যারা ৮-৯। পরিচ্ছেদটির সুরটি এই দুই অনুচ্ছেদে একটু ম্লান হইয়া গিয়াছে—অন্য পরিচ্ছেদে এই অংশটি সংযোজিত করিলেই ভালো হইত।

নবম পরিচ্ছেদ

দুর্ভাগ্য বাঙলা দেশের ও বাঙলা সাহিত্যের—এই পরিচ্ছেদের পূর্বে প্রথম সংস্করণে যে সুদীর্ঘ 'ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদটি' (দ্রষ্টব্যঃ বঃ সাঃ পঃ—২য় সং, পৃঃ

১৮৫ অনু) ছিল, তাহা বঙ্কিম পরে পরিবর্জন করেন। গল্পের দিক হইতে উহার কিছু মূল্য ছিল : সীতারাম শ্যামপুরে এক উদার মুসলমান ফকিরের সাক্ষাৎ পাইলেন ; এই চাঁদশাহ্ ফকিরের মুখেও ধর্মরাজ্যের ব্যাখ্যা ও হিন্দুধর্মরাজ্য স্থাপনের প্রেরণা পাইলেন। এই আখ্যানাংশ নাই, কিন্তু ফকির এই গ্রন্থে সীতারামের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ হিসাবে এখনো রহিয়াছেন (২।৯, ৩।৩)।

বঙ্কিমের স্বহস্তে চিত্রিত এই উদার ধর্মাত্মা মুসলমান ফকিরের চিত্রটি থাকিলে বঙ্কিম যে মূলত মুসলিমদ্বেষী ন'ন—এই সত্যটির স্বপক্ষে আরো কিছু যুক্তি মিলিত। তাই এই সংস্করণে পরিচ্ছেদটি পরিশিষ্টরূপে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, সীতারাম এক ফকিরের অনুগত ভক্তরূপে রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখিয়াছিলেন, ইহাও প্রচলিত জনশ্রুতি ; হয়তো তাহাই সত্য ছিল। বঙ্কিম তাহা এই ক্ষেত্রে পরে গ্রহণ করেন নাই। নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই সীতারাম মুসলমানদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন ও রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখিলেন। ইহাতে 'হিন্দুরাষ্ট্রের' গৌরবও রক্ষিত হইল না, ফকিরের সদ্গুণও চাপিয়া যাওয়া হইল। এই পরিচ্ছেদটি বর্জন না করিলে ইতিহাসেরও অমর্যাদা হইত না। রসগ্রাহী পাঠক হয়তো ধর্মরাজ্যের দীর্ঘ আলোচনায় প্রীত হইতেন না। কিন্তু বঙ্কিমের শিল্পকলার প্রচারণা তো বহুস্থানেই অনাবশ্যক স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদে সীতারামের রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের বর্ণনা—Public life এর চিত্র। ভালো চিত্র—দোষ যাহা রহিয়াছে—তাহা উপরেই বলা হইয়াছে।

এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে সীতারামের পারিবারিক জীবনের দিক—Private life : এবার দেখি সীতারামের জীবনের শূন্যতা, ব্যক্তিজীবনের ভিত্তি-ভূমির দুর্বলতার দিক। যে রমার রূপে, প্রেমে শ্রীর অভাব হয়তো কতকটা মিটিতে পারিত, সে রমা (সেদিনের হিন্দু স্ত্রীর মতই ভীত-স্বভাবা) একটা "ঘ্যান-ঘেনানি, প্যান-পেনানি" স্ত্রী হইয়া সীতারামের ব্যক্তি জীবনকে আরও শূন্যময় করিয়া দিল ; আর শ্রীর সেই "মহিমময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তিকে" (প্যাঃ ৯) সীতারামের পক্ষে আরও দুর্বার আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিতে লাগিল।

এই ঘটনা-গ্রন্থি ও ভাব-গ্রন্থি নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই সূত্রে বঙ্কিম 'প্রেম কি', (প্যাঃ ৯—১০) বলিয়া যে কাব্যময় চিন্তারাশি উপস্থিত

করিলেন তাহা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের রচনা নয়, ‘কমলাকান্ত’ রচয়িতা বঙ্কিমের রচনা, এবং উহা বঙ্কিমের পরিণত মনের প্রেম-বিষয়ক বিচার। প্রেম নামক দুর্দমনীয় বাসনার অস্তিত্ব বঙ্কিম ভালো করিয়াই জানিতেন, তাহাকে আপনার হিন্দু-আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য করিবার একটা চেষ্টা তিনি এখানে করিয়াছেন; কিন্তু কোন নিশ্চিত সমাধানে পৌঁছিতে পারিয়াছেন কি?

‘প্রেম কি, তাহা আমি জানি না।’—আশ্চর্য মনে হইবে এই উক্তি তাঁহার মুখে, যিনি জীবনারম্ভেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন আয়েষা-ওস্‌মান-জগৎসিংহকে, বিমলা-বীরেন্দ্রসিংহকে; যাহার প্রত্যেকটি প্রেম-চিত্র (প্রতাপ-শৈবলিনীর মত, কিংবা রোহিণী-গোবিন্দলাল-ভ্রমরের মত) বাঙালী শিক্ষিত সমাজের আলোচনার সুপরিচিত কাহিনী হইয়া গিয়াছে। জীবনের শেষ দিকে আসিয়া সেই বঙ্কিম বলিলেন, ‘প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে,’ ‘তাহা আকাশ কুসুমের মত শোনা একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক-যুবতীর মনোরঞ্জনের জন্য কবিগণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।’ এই বিস্ময়কর উক্তির একটা কারণ, বঙ্কিম এখানে প্রেম বলিতে ‘রোম্যান্টিক লভ্’ (Romantic love) বুঝিয়াছেন; ভালবাসা, সুখ-দুঃখের সাহচর্যের মধ্য দিয়া যাহা জন্মে, বাঙালী ঘরের সেই পরিচিত ‘প্রেম’ হইতে উহাকে একেবারে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন। প্রেম বলিতে বঙ্কিম বুঝাইতে চান ‘দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না’—শুধু এমন একটা দাবানল (Passion), যাহা তিনি সংসারে সচরাচর দেখিতে পান না। অথচ সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কাব্য হইতে পাশ্চাত্যের কাব্যে গানে সর্বত্রই এমন প্রেমের ‘দেখিল আর মজিল’ কথা আমরা শুনিতে পাই। তাহা কি তবে মিথ্যা? ‘কেবল কবিগণ কর্তৃক সৃষ্ট’? বঙ্কিম নিজেও যখন প্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন, তখন কি একটা সাহিত্যিক দস্তুরই (Convention) মাত্র রক্ষা করিয়াছেন? ‘যুবক যুবতীর মনোরঞ্জনের জন্য’ উহা উদ্ভাবনা করিয়াছেন? তাহা হইলে তাঁহার সে রচনা অত্যন্ত প্রাণহীন তুচ্ছ বস্তু হইত, এতকাল পর্যন্ত বাঙালী সাধারণের নিকট তাহা গ্রাহ্য হইত না।

এ কথা সকলেই জানেন—‘রোম্যান্টিক লভ্’ (‘শকুন্তলা’ হইতে আয়েষা-জগৎসিংহ পর্যন্ত, কিংবা এই শ্রী-সীতারাম পর্যন্ত যাহার পরিচয় পাই) দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর ঘটে না। কিন্তু ইহাও সকলেই তবু বুঝি—এই প্রেম আছে। রূপমোহ হিসাবে তো তাহা আছেই, দীর্ঘতরকালস্থায়ী দাবানল হিসাবেও

তাহা দুই চারিক্ষেত্রে জ্বলিয়া উঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার সেই দুর্দমনীয় রূপ হয়ত সামাজিক ও ব্যবহারিক কারণে দমিত হয়;—কিন্তু তাই বলিয়া সেখানেও তাহা নাই, এমন কথা বলা চলে না। রোম্যান্‌সের একটা বড় সত্যই তো ইহা—সচরাচর দৃষ্ট বাস্তবকে আপাতদৃষ্টিতে ছাড়িয়া গিয়া বাস্তবের অন্তর্নিহিত সত্যকে ছাঁকিয়া তোলা, সেই অপরিচিতকে সাধারণের সমক্ষে পরিচিত করা, প্রতিষ্ঠিত করা। বঙ্কিমও নিজ উপন্যাসে তাহাই করিয়াছিলেন।

মানব-চরিত্রবেত্তা বঙ্কিম তবে কি একটা অর্ধসত্যের আশ্রয় লইয়া বলিতে চাহিলেন,—এই প্রেম নূতনের গুণ, 'সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দমনীয় হইয়া পড়ে'? সত্য বটে, পরিচয়ে মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যায় না, যেমন, এণ্টোনিও-ক্লিওপেট্রার প্রেম। তাহা ছাড়া, যাহাকে আগে সাধারণ ভাবে চিনিতাম, তাহাকে লইয়াও 'দুর্দমনীয় বাসনা' জন্মিতে পারে না—এমনও নয়। তাহা হইলে রোহিণী-গোবিন্দলাল, কুন্দ-নগেন্দ্রনাথের কথা কি মিথ্যা? বঙ্কিমের পাতারই অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তাই বিদেশী দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। 'নূতনের মোহকে' স্বীকার করিয়া নূতনকে 'অনন্তের অংশ' বলিয়া বঙ্কিম এই সূত্রে এই প্রেমকে একটা ব্যাখ্যার আবরণ দিয়া মানিয়া লইতে চাহিলেন। শেষ অনুচ্ছেদে বঙ্কিম নিতান্ত অসঙ্গতভাবে সমগ্র আলোচনাটির উপরে আকস্মিক যবনিকা ফেলিয়া দিলেন। বলা যাইতে পারে,—কাব্যরসের দিক হইতে লেখাটি বঙ্কিম যেন সমাপ্ত করিয়াছেন একেবারে Anticlimaxএ। [প্রঃ ১। বঙ্কিম ভালবাসা ও স্নেহ হইতে প্রেমকে কিরূপে পৃথক্ করিয়াছেন? এই পার্থক্য কি যুক্তিসহ? প্রঃ ২। নূতনের মোহরূপী প্রেমকে বঙ্কিম কি ভাবে স্বীকার করিয়াছেন? এই স্বীকৃতির অর্থ কি?]

'রমা বড় ছোট মেয়ে। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু, সকলই দুর্জ্ঞেয়, বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়, ইত্যাদি।' রমা চরিত্রের এই দিকটি এই পরিচ্ছেদে চমৎকার বর্ণিত; উহা যে সীতারামের পক্ষে ক্লান্তিকর হইয়া উঠিল, তাহাও অতি নিপুণতার সঙ্গে বঙ্কিম বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙালীর সংসারে এই ধরণের 'ভীরু' (Timid) স্ত্রীচরিত্রের অভাব নাই। 'নিশ্চেষ্ট সরলতার' চিত্র বঙ্কিম আঁকিয়াছেন কুন্দনন্দিনীতে, তিলোত্তমাতেও। রমার সহিত কুন্দর চরিত্র তুলনীয়। আবার লক্ষণীয়—কুন্দর অপেক্ষা রমা

অস্বাভাবিক ভীতিতে (Morbid fear-এ) অধিকতর কাতর,—কুন্দর মত রমা নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণে নিঃশেষিত হয় নাই। স্বামী পুত্রের মমতায় রমার 'এই ভয়' বেপরোয়া হইল; আবার উহার কুৎসিত ফলাফল দেখিয়া সেই মমতার বলেই রমা সমস্ত ভয় জয় করিয়া আপনাকে লোক-সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিল। (রমার এই সাহসও স্বভাবগত নয়, Morbid fear-এরই একটা প্রতিক্রিয়া। স্বভাবগত সাহস ও সচেতন কর্তব্যপালনের চিত্র নন্দা; চরিত্র হিসাবে রমার বিপরীত দিক; কিন্তু সে 'উদ্যোগিনী' নয় 'উদ্যোগী' সীতারামের উপযুক্ত 'সহধর্মিণী' নয়।)

'একাদশ বৃহস্পতির লাগা'—যখন বৃহস্পতি কাহারও জন্মপত্রিকায় একাদশ ঘরে আসে, তখন তাহার চরম সৌভাগ্যের উদয় হয়,—ইহাই গ্রহ-বিচারকদের মত।

'কখনো ইল্‌সে গুড়ুনি ইত্যাদি।'—চমৎকার বাক্যভঙ্গিতে ভয়-বিকল রমার কমবেশি নানারূপ কাঁদা-কাটা, অনুনয়-বিনয়ের ইহা বর্ণনা: (ক) 'ইল্‌সে গুড়ুনি': গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে বর্ষাকালে ইলিস মাছ সর্বাপেক্ষা বেশি ধরা পড়ে। এই জন্য এই বৃষ্টিকে বলে 'ইল্‌সে গুড়ুনি'—এখানে অর্থ—গুঁড়ি গুঁড়ি চোখের জল ফেলা। (খ) 'কালবৈশাখী'—বৈশাখ মাসে (প্রায়ই অপরাহ্ণে) যেমন দম্‌কা ঝড় ও আকস্মিক বৃষ্টি আসে, তেমনি অকস্মাৎ যে কান্নাকাটির ঝড় রমা সৃষ্টি করিত, তাহাকেই বলা হইয়াছে 'কালবৈশাখী।' (গ) 'কার্ত্তিকে ঝড়'—কার্ত্তিক মাসে বাঙলা দেশে যে প্রচণ্ড ঝড় (বা সাইক্লোন) বহে, তাহা তত অকস্মাৎ আসে না, অল্পকালও স্থায়ী হয় না, আর ঘর বাড়ি, গাছপালা বহু জিনিষই তাহা উড়াইয়া লয়। তেমনি-তর দুর্দান্ত রাগ, ক্ষোভ, অশ্রু-সংবলিত রমার কাণ্ডকেই এখানে বলা হইয়াছে 'কার্ত্তিকে ঝড়'।

'স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি, সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্যসুখ।' পরিণত বুদ্ধিতে বঙ্কিম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য।

'রাজ্যস্থাপনের উদ্যোগে সীতারাম শ্রীকে হয়ত ভুলিতে পারিতেন না। কিন্তু সেই রূপজ মোহকে সংযত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ব্যর্থতার জন্য রূপসী রমারই দায়িত্ব সমধিক।'

নন্দার চরিত্রের সূত্র এখানে নির্দিষ্ট হইয়াছে। নন্দা কি কর্মবীরু

সীতারামের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিত না? ভাগ্যবান্ পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী হইবার মত স্ত্রী নন্দা; কিন্তু উদ্যোগী কর্মবীরের সহকর্মিণী হইবার মত সে নয়—ইহাই বোধ হয় বঙ্কিমের বক্তব্য। অর্থাৎ শ্রী শুধু যে রমার মত সুন্দরী ছিল তাহাই নয়,—নন্দার মত সুগৃহিণী ছিল তাহাও নয়,—এই দুই গুণ ছাড়াইয়াও শ্রীর আরও গুণ ছিল—সে তেজস্বিনী, উদ্যোগিনী, সাহসিনী। সীতারামের রাষ্ট্রস্থাপনের যোগ্য সহকর্মিণী হইবার মত নারী।

'কিন্তু সহধর্মিণী কই?'……বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সংগ্রামে সিংহবাহিনী কই?'—এই কয়টি কথা রঘুবংশের—'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ' (৮/৬৭) শ্লোকটি স্মরণ করাইয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, এই কর্মময় যুগে স্ত্রীর আদর্শ কি হইবে বঙ্কিম এখানে তাহাই বলিয়াছেন।

বঙ্কিমের ভাষায় এখানে না থাকুক, কিন্তু সমস্ত যুক্তিপ্রণালী যে ভাবে এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিম সাজাইয়াছেন তাহাতে কি পাঠকের মনে এই আভাস থাকিয়া যায় না—সীতারাম শ্রীকে মনে না করিয়া পারিতেন না? কারণ শ্রীকে দর্শন মাত্রই তাঁহার মনে প্রথম উদিত হইয়াছিল এই ভাব—শ্রী এত 'সুন্দরী' (রূপ) আর তারপর তিনি দেখিয়াছিলেন শ্রী এত 'মহিমময়ী' (গুণ)। তাঁহার অর্ধচেতন মনে শ্রীর জন্য কামনা সুদৃঢ় রূপে বাসা বাঁধিয়াছিল। তবু কর্ম-উৎসাহে তাহা চাপা পড়িতে পারিত; পারিল না সীতারামের পারিবারিক জীবনের ভিত্তি কাঁচা বলিয়া। এত সত্ত্বেও নন্দা-রমার মত দুই পত্নী লইয়া সীতারামের দিন চলিত, চলিল না শ্রীকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া—তাঁহার রূপে গুণে সীতারামের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল বলিয়া।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৈতরণী—পুরাণমতে বৈতরণী নদী পার হইয়া স্বর্গে উত্তীর্ণ হইতে হয়। উড়িষ্যার এই নদীটি তাই হিন্দুরা গোরুর ল্যাজ ধরিয়া পার হন—বিশ্বাস আছে স্বর্গে তাহা হইলে পৌঁছিতে আর কোন বাধা থাকিবে না।

সপ্তমাতৃকামূর্ত্তি: কার্তিকেয়কে স্তন্যদান করেন কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি ছয় জন মাতৃকা। ব্রাহ্মী, বারাহী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি অষ্টশক্তিকে অষ্ট মাতৃকা বলে। আবার শচী, মেধা, স্বাহা প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার কথাও আছে। এখানে মাতৃকাদের সাতটি মূর্তি ছিল বলিয়াই বঙ্কিম সপ্তমাতৃকার উল্লেখ

করিয়াছেন। বর্ণনা হইতে বুঝা যায়,—ইঁহারা ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রাহ্মী, ছায়া, বারাহী ও চামুণ্ডা।

শ্রী ও জয়ন্তী : এই আলোচনায় দুইটি আশ্চর্য স্ত্রী-চরিত্রকে বঙ্কিম একত্র উপস্থিত করিয়াছেন। বুদ্ধিমার্জিত কৌতুকের সহিত সমবেদনার মিশ্রণে জয়ন্তী-চরিত্র প্রথম হইতে উজ্জ্বল। সন্ন্যাসিনী-সুলভ গাম্ভীর্য বা কাঠিন্য জয়ন্তীর চরিত্রে নাই, বরং জীবন-রসের রসিকা পরিণত-বুদ্ধি মমতাময়ী বান্ধবী রূপেই জয়ন্তীকে আমরা প্রথমাবধি দেখি। (১।১৪) 'সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী ?' এই উক্তি মানিতে বেগ পাইতে হয় না যখন দেখি জয়ন্তী মান লজ্জা ভয় প্রভৃতি হইতে একেবারে বিমুক্তা নয়—তাহার সমস্ত সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যে লৌকিক শ্রী ও শোভনতা বোধও রহিয়া গিয়াছে।

জয়ন্তীর রূপ বর্ণনায় বঙ্কিম আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তিনটি বাক্যে। "ঘসা ফানুসের ভিতর আলোর মত রূপের আগুণ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।"—এমন কাব্যদৃষ্টি বঙ্কিমেও দুর্লভ।

'বেলপাতার পোকার মত'—বেলপাতা শিবপূজায় লাগে। কিন্তু পোকায় কাটা পাতা বাছিয়া ফেলাই নিয়ম, পোকার ত কথাই নাই। শ্রী এখানে নিজেকে মনে করে তেমনি পোকা, জয়ন্তী যেন পূজার অক্ষত 'বেলপাতা,' পবিত্র ও সুন্দর।

মধু-মন্মথ : বসন্ত (মধুঋতু) ও মদন, শ্রী ও জয়ন্তীর সন্ন্যাসী বেশে রূপ। মনকে মথন করে বলিয়া মদনের এক নাম মন্মথ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

'সঞ্চারিণী দীপশিখা'—কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ কাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গের ৬৭তম শ্লোক দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গটি এই : স্বয়ংবর সভায় ইন্দুমতী সঞ্চারিণী দীপশিখার ন্যায় যে যে রাজাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন ; সেই সেই রাজা রাজপথপার্শ্বস্থিত অট্টালিকার ন্যায় একবার উজ্জ্বল হইয়া পরক্ষণেই ঘনান্ধকারে নিমগ্ন হইলেন।

সাধারণ ভাবে ওড়িয়া ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে হাস্যোদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে : কিন্তু উড়িষ্যাবাসী পণ্ডিতদের গম্ভীর কথা দেওয়া হইয়াছে বাঙলায়,— শ্রদ্ধা উদ্রেক করিবার জন্য।

'কি পরি মাই কিনিয়া মানে ইত্যাদি' : পরী মেয়েমানুষরা কি যাইতেছেন ?

'এ মানুষেরা দেবতা হইবে', হুঁ, হুঁ, যা, যা সেখানে ভ্রাতৃবধূ (সুভদ্রা) আছে, তোদের মেরে ফেলবে (কারণ ইহারা রুক্মিণী, সত্যভামা)।

বৃহস্পতি-শুক্র ইত্যাদি—বঙ্কিম গ্রহ গণনা সম্পর্কে কতটা উৎসুক ছিলেন—এই সব উক্তিতে তাহা বুঝা যায়। এমন কি উপন্যাসের পাদ-টীকায় বাক্য উদ্ধৃত করিতেও তাঁহার দ্বিধা নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমের আর একটি অতিপরিচিত লেখা এই পরিচ্ছেদের উদয়গিরি ললিতাগিরির বর্ণনা। ইহা প্রথমত উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, তখনো (১৮৮৭) ভারতীয় ভাস্কর্যকলা শিক্ষিত ভারতবাসীর চক্ষে মোটেই শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়ত, এই ভাস্কর্যের প্রতি শ্রদ্ধার পিছনে শিল্পানুরাগ অপেক্ষাও বেশি প্রবল ছিল বঙ্কিমের ভারতীয় মর্যাদাবোধ—বিশেষত তাঁহার 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ'—'তখন হিন্দুকে মনে পড়িল' ইত্যাদি (১।১৩)। কিন্তু তাঁহার শিল্পবোধও খাঁটি—'ইন্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুলে পুতুল গড়া' শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁহার বিক্ষোভ এবং এই ভাস্কর্যের প্রতি শ্রদ্ধা উহার প্রমাণ। দ্রষ্টব্য—"পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়াছে"।

সুইনবার্ণ : Charles Algernon Swinburne (১৮৩৭-১৯০৯); ইংরেজ কবি। বঙ্কিমের সমসাময়িক। ছন্দঃ-ঐশ্বর্যে সুইনবার্ণ অতুলনীয়, কিন্তু কাব্যরসে তত সমুত্তীর্ণ ন'ন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' সে তুলনায় অনেক সমাদরের বস্তু।

মিল : John Stuart Mill বঙ্কিমের সমসাময়িক ইংরেজ দার্শনিক, উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রধান প্রবক্তা। বঙ্কিম তাঁহার 'হিতবাদ' utilitarianism (ব্যবহারিক সার্থকতাবাদ) জড়বাদী বলিয়া 'উদর দর্শন' নাম দিয়া 'কমলাকান্তে' বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু মিল, বেন্থাম, কোঁৎ, বিশেষত সীলির লেখা বঙ্কিম ও সমকালীন বাঙালী চিন্তাশীলদেরও প্রভাবিত করিত।

হরিদ্বর্ণ—হরিদ্রাবর্ণ হইবে, কারণ পীতাম্বরী সাটীর সহিত তুলনা; হরিৎ অর্থ সবুজ। এইরূপ ভুল মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সকল লেখকেই দেখা যায়। চেল—চেলী—পট্টবস্ত্র। চীর—বস্ত্রভেদ।

'তন্বী শ্যামা ইত্যাদি'—কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘ, ২১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য। যক্ষপ্রিয়াগণের সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনা। শ্যামা—পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মধ্যে ক্ষামা—কৃশোদরী।

প্যারা ৭। গঙ্গাধর শাস্ত্রী: বঙ্কিমের উপন্যাসের এই মুনি-ঋষি-জাতীয় ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসীরা আধুনিক পাঠকদের নিকট হয়তো একটা সমস্যার বস্তু। কিন্তু বঙ্কিম যে এই সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই (প্রশ্ন: বঙ্কিমের উপন্যাসে অতি-প্রাকৃত ও অলৌকিক বিদ্যায় বিশ্বাসের আনরা কতটা পরিচয় পাই?)। কিন্তু এই গঙ্গাধর স্বামী কি ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করিয়া জানিতেন? অন্ততঃ উহার রহস্য তিনি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন নাই। তাই সীতারামের ট্র্যাজিডি এমন ভয়ঙ্কর হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

'মো মুণ্ডেরে চরড় দিবারে হউ।'—আমার মাথায় চরণ দান করুন্।'

টিকে ঠিয়া হৈকিরি ইত্যাদি'—একবার স্থির হইয়া আমার দুঃখ শুনুন।

শ্রী ও জয়ন্তীর কথাবার্তার মধ্য দিয়া এখানে আমরা উভয়ের চরিত্রের আরও সুন্দর পরিচয় পাই। বঙ্কিমের চক্ষে নারীর এক আদর্শ 'প্রফুল্ল',—দেবী চৌধুরাণী সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহিণী হইল; অপর আদর্শ 'জয়ন্তী'; প্রথম সংস্করণের একেবারে শেষ কয়টি বাক্যে বঙ্কিম পাঠকদের নিকট তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। বঙ্কিম পরবর্তী সংস্করণে শুধু রসবোধের প্রয়োজনেই কথা কয়টি ছাঁটিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসের আদর্শ 'জয়ন্তী',—গৃহিণীর আদর্শ যেমন প্রফুল্ল। যিনি বিরাগিণী হইয়াও মমতাময়ী, সর্বত্যাগিনী হইয়াও সংসারের হিতকারিণী কর্মযোগিনী, আর বাক্যে আলাপে বুদ্ধিতে রসিকতায় এমন আনন্দময়ী তিনিই আদর্শ সন্ন্যাসিনী। 'এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী?'—বঙ্কিম প্রথমখণ্ড এই প্রশ্নে শেষ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ সন্ন্যাসিনী সম্বন্ধে কোনো সংশয়ই আর কাহারও মনে থাকিবার

নয়। আর এই খণ্ড এই ভাবে শেষ করিয়া তাঁহার আখ্যানের কেন্দ্রীয় কথাবস্তুকে জোর দিয়া বুঝাইয়াছেন—সীতারামের 'দুষ্কর্ম' ও শ্রীর 'অকর্মের' পার্শ্বে তিনি দেখাইয়াছেন 'জয়ন্তীর' কর্ম। ইহাই আদর্শ কর্ম। নাটকের প্রথম অঙ্কের মত একটি নাটকীয় সম্পূর্ণতা এই প্রথম খণ্ডে এইভাবে রূপ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

নাটকোচিত রীতিতে **দ্বিতীয় খণ্ডের** ঘটনা চূড়ান্তে উঠিতেছে, এমন নয়; প্রকৃতপক্ষে সীতারামের জীবনকাব্যের জটিলতা প্রায় দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছে (দ্রষ্টব্য: টীকা ১।১)। এই দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্কিম প্রথম সংস্করণে এই কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—যেমন 'সীতারামের হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করা হইল না'—শ্রীর অভাবে (দ্রষ্টব্য: বঃ সাঃ পঃ সং পৃঃ ১৮৯)। এখনকার এই পরিচ্ছেদের ২য় অনুচ্ছেদ ও ৩য় অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যের পরেও প্রথম সংস্করণের একটি দীর্ঘ অংশে আবার তিনি তাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় অবস্থার বিবরণ দিতে বসিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে বঙ্কিম এই সমস্ত বাহুল্য বোধে বর্জন করিয়াছেন। ঠিকই করিয়াছেন। কারণ তাঁহার এই উদ্দেশ্য এই গ্রন্থে এতই সুস্পষ্ট যে তাহা বারে বারে বলিলে উপন্যাসের রসহানিই ঘটিত। বরং এখন শ্রীর অনুসন্ধানের কথা দিয়া দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ করায় তাঁহার আখ্যানটিতে সীতারামের ব্যক্তিজীবনের দিকটি পিছনে পড়িয়াও পিছনে পড়িয়া গেল না। প্রথম সংস্করণের পূর্বাপরই জোরটা ছিল সীতারামের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উপর; তৃতীয় সংস্করণে সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিবার জন্য কাহিনীর মোড়টি বঙ্কিম অনেকটা ঘুরাইয়া দিয়াছেন—সীতারামের শ্রীর জন্য উন্মাদনার উপর। (দ্রষ্টব্য: ৩।১।১—বঙ্কিমের শিল্পবুদ্ধি)।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম পরিচ্ছেদের রাজনৈতিক অবস্থা ও রাজ্যগঠন প্রয়াস বর্ণনা স্মরণীয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলার এই বিবরণ মিথ্যা মনে হইবে না।

প্যাঃ ৫। ‘রামচন্দ্রেরও দুর্মুখ ছিল’—রামচন্দ্র দুর্মুখ রাখিতেন প্রজামঙ্গলের উদ্দেশ্যে, প্রজাদের অন্তরের কথা জানিবার জন্য। দুর্মুখ—ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকে রামচন্দ্র-নিযুক্ত চরের নাম; সীতা-সম্বন্ধীয় জনাপবাদ ইনিই রামচন্দ্রকে নিবেদন করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় খণ্ডটিতে রমা ও গঙ্গারামের কাহিনীই প্রধান বস্তু হইয়া উঠিল—সীতারামের প্রধানতম গ্রন্থি যেমন সীতারাম-শ্রীর সম্পর্ক; দ্বিতীয় গ্রন্থি তেমনি গঙ্গারামের পতন। সেই পতনের মূলে রমার ভুল; সেই ভুলকে আশ্রয় করিয়া গঙ্গারামের মোহাবেশ (২।৪, ২।৫, ২।৭ ইত্যাদি), আর শেষ পর্যন্ত কৃতঘ্নতা—“পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, তবু আমি রমাকে ছাড়িব না।” (২।৭)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে সরলা, শঙ্কিতস্বভাবা (দ্রঃ ১।১০) রমা ক্রমবিচলিত-চিত্তে মুসলমানদের অহেতুক ভয়ে ও পুত্রের মমতায় কেবলই ভুলের দিকে চলিল। এই মনস্তত্ত্ব বর্ণনার জন্যই পরিচ্ছেদটি উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগরত্যাগের এই বর্ণনা—গুজবের রূপ ও প্রসার,—উপভোগ্য জিনিস। যাঁহারা জাপানী বোমাবর্ষণের পরে কলিকাতা ত্যাগের দৃশ্য দেখিয়াছেন তাঁহারা তখনকার দৃশ্য ও দৈনন্দিন গুজব স্মরণ করিতে পারেন।

প্যাঃ ৯। ‘আমরা বাঙালী মানুষ’ ইত্যাদি। বাঙালী অন্তঃপুরিকার মারফৎ যে মনোভাবটি এখানে বঙ্কিম সাহিত্যিক-নিষ্ঠার বশে উত্থাপন করিলেন, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ ও গবেষণায় তাহা ক্ষালণ করাই ছিল বঙ্কিমের এক প্রধান লক্ষ্য (দ্রষ্টব্য : ভূমিকা)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদটি মুরলার দৌত্য। মুরলা-জাতীয় চরিত্রের অভাব বঙ্কিমে নাই (তুলনীয় : বিষবৃক্ষের হীরা)। কুটনী-জাতীয় চরিত্র (ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ‘মালিনী’) বাঙালী লেখকদের একটা পরিচিত ‘টাইপ’।

‘খ্যাংরা মেরে’ : ঝাটা মারিয়া, ‘খেংরিয়ে’ ইত্যাদি নাম ধাতুও আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের অধঃপতনের সূত্রপাত এই পরিচ্ছেদেরই শেষ দুইটি বাক্যে বলা হইয়া গেল—অথচ এই পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গঙ্গারাম বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী। 'তথাপি একটা গুরুতর দোষের কাজ হইয়া গেল', আর রমার শেষ কথা 'তুমি আমার প্রাণদান করিলে' ইত্যাদি।

প্যাঃ ৪। বঙ্কিম কুমারসম্ভবের (৩।৭০) মদনশরসন্ধান শ্লোকটি প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—গঙ্গারামের মনে অজ্ঞাতে কামসঞ্চার হইয়াছে।

প্যাঃ ৫। 'বাদীর মনেও যা, বিধির মনেও তা'—চন্দ্রচূড়-তোরাব খাঁর পত্রালাপের বিষয়ে তোরাব খাঁর দিক হইতে দেখিলে তাহাই মনে হয়—কি যে চন্দ্রচূড়ের (বাদীর) মনে, তাহা ছাড়া কে জানিবে? তাহা জানা গেল এখন—মৃণ্ময় (ইতিহাসের 'মেনা হাতী') ও গঙ্গারামের নিকট চন্দ্রচূড় ঠাকুর যখন তাহার কর্ম ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের বিকারের দিকটি এই পরিচ্ছেদে প্রথম প্রদর্শিত হইল। 'গঙ্গারাম চোখ বুজিয়া পিছল পথে পা দিয়াছে।' দুশ্চরিত্রা মুরলার চক্ষে গঙ্গারামের পরিণাম সুস্পষ্ট। তাহার মুখ দিয়াই বঙ্কিম জানাইলেন—গঙ্গারামের দুর্লংঘ্য নিয়তি এবার প্রকট হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদের মধ্যে রমার জাগরণ ও আত্মোদ্ধার এবং গঙ্গারামের ক্রম-অবনতি ও অধঃপতনের চিত্র বঙ্কিম প্রায় সমাধা করিয়াছেন। বাকী রহিল এখন শুধু বাস্তব ঘটনা-প্রবাহের, আপন কৃতঘ্নতার, কামনা-পঙ্কিল দুরাশায় গঙ্গারামের নূতন নূতন ঘূর্ণি সৃষ্টি করা। বুঝা গেল,—রমা উদ্ধার পাইবে (দ্রষ্টব্য : অনু ৯); কিন্তু উদ্ধার পাইবে না গঙ্গারাম। 'পৃথিবীতে যত পাপ থাকে সব আমি করিব; তবু আমি রমাকে ছাড়িব না।' (প্যাঃ ১১)। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে (অনু ৩) 'একে ভালবাসা বলে না' বলিয়া যে বক্তৃতাটি করিয়াছেন তাহা বর্জন করিলে রসভঙ্গ হইত না। বিশেষত একেবারে 'ধরি

মাছ, না ছুঁই পানি চলে না', (অনু ৫)-প্রভৃতি চমৎকার ব্যাখ্যা যখন লেখক জোগাইয়া দিয়াছেন।

প্যাঃ ৮। 'জরুর': ভুল হিন্দী প্রয়োগ; হওয়া উচিত 'জরুরত'—প্রয়োজন। 'পুষিদা': গোপন (ফাঃ পোশিদা)।

প্যাঃ ৯। 'স্ত্রীলোকের বিশেষত হিন্দুর মেয়ের একটা বুদ্ধি আছে, ইত্যাদি'—এই অতি সত্য ব্যাখ্যাটুকু জোগাইবামাত্র রমা-চরিত্রের সমস্ত অসঙ্গতি এক মুহূর্তে পরিষ্কার হইয়া যায়। অবশ্য ঘটনা-বিপর্যয়ের দিক হইতে ক্ষতি অপূরণীয়।

প্যারা ১০। 'যে ফল নৈবিদ্যতে দেয় ইত্যাদি। নৈবেদ্যের ফলের আঁটি যেমন পরিত্যাজ্য, এখন গঙ্গারামের তেমনি অবস্থা—সে এখন নিষ্প্রয়োজনীয়। রমার ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে—যতক্ষণ ভয়ার্তা ছিল ততক্ষণই গঙ্গারাম ছিল 'নৈবিদ্যের' ফলের মত পূজনীয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেকদিন পরে আবার শ্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম। শ্রী পরিবর্তিত হইয়াছে—তাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, স্বামীর কণ্ঠও আর মনে নাই। একটা নিষ্কাম ধর্মবোধ আসিয়াছে, সে এখন আর আপনার শুভাশুভের কথা ভাবে না, এমন কি 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হইবার ভয়েও ভীতা নয় ('কে কাকে মারে বহিন?' ইত্যাদি)। কিন্তু ইহা কতটা গভীর? এখনো সে স্বামীর সুখ-দুঃখের জন্য একটু দ্বিধায় পড়ে। জয়ন্তীর কিন্তু ভাবনা কাহারও সুখ-দুঃখ নয়—শুভসাধন। জয়ন্তীর (বঙ্কিমের সন্ন্যাসিনীর মুখপাত্র) ইহাই ধর্ম—ইহাই কর্মযোগ।

প্যারা ৩। 'কথাবার্তায় কে কাকে মারে বহিন?'—প্রভৃতি শ্রীর উক্তিতে শ্রীর নিষ্ক্রিয় দিকটি ফুটিয়া উঠে। (বঙ্কিম ইহারই জন্য শ্রীর জীবনে দেখিয়াছিলেন 'অকর্ম') অপর পক্ষে জয়ন্তী নারায়ণে সর্বসমর্পণ করিয়াও সক্রিয়।

'ত্রিশূল মন্ত্রপূত'—পাদটীকা দিয়া বঙ্কিম magnetized কথাটি প্রয়োগ করায় বোঝা যায়,—তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা নিজের অলৌকিকত্ব-বিশ্বাসের একটা যুক্তি দেখাইতে চান।

প্যারা ৪। শেষ অনুচ্ছেদে 'বঙ্কিমী ঢঙ্' দেখা যাইতেছে। গায়ে পড়িয়া এরূপ কথা বলা আজ আর কোনো লেখকের পক্ষে আমরা সহ্য করি না। অবশ্য এখানে বঙ্কিম রসিকতার ছাঁদেই কথা বলিয়াছেন।

দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ

এইবার রমার চরিত্রের দৃঢ়তার দিক্ পরিস্ফুট হইতেছে।

'পৌষমাস'—মুরলার এই পরিহাসের অর্থ—'দেনা পাওনা যেমন পৌষালি ফসল উঠিলে স্থির হয়, তেমনি গঙ্গারামের ইচ্ছাও পৌষমাসে পূর্ণ হইবে।' অর্থাৎ সে সময় আর হইবে না।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এই দুই পরিচ্ছেদে আমরা কর্মকুশলা সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী ও তাঁহার অনুগামিনী শ্রীর কর্মতৎপরতা দেখি।

এমন সঙ্কটের মুহূর্তে যখন সীতারামকে আবার দেখি, দেখি তিনি যেন উদাসীন; হিন্দুরাজ্যস্থাপনের অধিকারই আয়ত্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উৎসাহ নাই, পুরীরক্ষায় পর্যন্ত তাঁহার আগ্রহ নাই—'তাতেই বা কি? যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব?' এমন পুরুষ কি কোনো রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে—বিশেষত হিন্দুর রাষ্ট্র?

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে দুইটিতে যুদ্ধের দৃশ্য। ঘটনার দিক হইতে উপন্যাসের এখানে একটি চরম শিখর, সীতারামের বীরত্বের দিক হইতে চূড়ান্ত পরিচয়ের কাল। কিন্তু তথাপি জয়ন্তীর পার্শ্বে এই সীতারামকেও তত উজ্জ্বল মনে হয় না। ধীমান্ চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে এই ক্ষেত্রে হতবুদ্ধি ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করিতে হয়। হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী দেবীর দিকেই তিনি চাহিয়া আছেন। হিন্দুরাজ্যস্থাপনের এই মন্ত্রণাদাতা অপেক্ষা সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী অনেক বেশি আত্মস্থা, কর্মকুশলা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের লঘুহস্তে অঙ্কিত পার্শ্বচিত্র (জমাদার ও গঙ্গারামের কথাবার্তা; সিপাহী ও সীতারামের আচরণ) এই যুদ্ধের বীরত্বকে ও গুরুত্বকে আর একটি নাটকীয় অবকাশ ('relief') দান করিয়াছে।

পৃঃ ৪। 'আগে নেড়েরা বিদায় হোক্।'—কথাটি নাটকীয় রীতিতে সীতারামের মুখে এই সময়ে চলিতে পারে। 'নেড়ে': মুণ্ডিতমস্তক; প্রথমত ইহা বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরই বুঝাইত (দ্রষ্টব্য: হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে'), পরে তেমনি কারণে মুসলমানদের বুঝায়। অন্যদিকে তুলনীয়: 'নেড়ানেড়ী'।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সীতারামের দিল্লীতে দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য লাভের যে সংবাদ উক্ত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। দ্বাদশ ভৌমিক (ঈশা খাঁ ও চাঁদ রায় কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণমাণিক্য প্রভৃতি) অবশ্য প্রায় ১০০ শত বৎসর পূর্বে মানসিংহের দ্বারা বশীভূত হন। তবু নিজ নিজ এলাকার উপর তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ তাহা লোপ করেন। তৎপূর্বে সীতারাম রায় সনদ পাইলেন, দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে এই কার্যের ভারও পাইলেন। অবশ্য এই অধিকার কার্যত প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্বেই বোধ হয় সীতারামেরও পতন ঘটে।

এই পরিচ্ছেদে যুদ্ধান্তের শান্তিপর্বে চন্দ্রচূড় ঠাকুর আপনার হিন্দুরাজ্যের স্বপ্নটি আবার সীতারামের সম্মুখে বিস্তার করিয়া ধরিতে বসিয়াছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় খণ্ডের ঘটনাকে শান্ত পরিসমাপ্তিই দিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে দিয়াছে জয়ন্তীর মারফৎ তাঁহার লক্ষ্যের সন্ধান—রাজর্ষিই শ্রেষ্ঠ মানুষ। আর শ্রীর আত্মসংশয়—'সোলা জলে ভাসে বটে', ইত্যাদি। শ্রী কোথাও আত্মছলনা করে নাই, সাহসিনী হইলেও সে নিজ শক্তির পরিমাপ বুঝে। এই খণ্ডে শ্রী জয়ন্তী-চালিতা; কিন্তু আসল নেতৃত্ব জয়ন্তীরই।

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ডে 'রাত্রি—ডাকিনী।' এই খণ্ডের নাটকীয় সার্থকতা (দ্রষ্টব্য টীকা ১।১) আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু দুই-একটি পরিচ্ছেদে ভিন্ন দ্বিতীয় খণ্ডের মত নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান এখানে নাই—অথচ এই খণ্ডে ঘটনাবাহুল্য প্রচুর, আর আখ্যান এখানেই তাহার আসল ট্র্যাজিক বা শোকাবহ পরিণতিতে পৌঁছিল।

এই খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে বঙ্কিম অতি সংক্ষেপে ইতিহাসের ও উপন্যাসের সম্পর্ক পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য: যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক ভূমিকা 'সীতারাম'—সাঃ পঃ সংস্করণ)। এই উক্তিটি সেই দিক হইতে অমূল্য।

এই পরিচ্ছেদটিতে দেখি রাজ্ঞী নন্দার রাজ্ঞী-সুলভ ও গৃহিণী-সুলভ গুণ, (কিন্তু তিনি সাহসিনী সিংহবাহিনী ন'ন); রমার চরিত্রের দৃঢ়তার দিকের বিকাশ, আর সীতারামের চরিত্রের প্রজারঞ্জনের দিক।

আদর্শ হিন্দু রাজার মত সীতারাম রমাকে পরিত্যাগ করিলেন না কেন? নন্দার যুক্তিতে (প্রথম পরিচ্ছেদ—সীতারামের সঙ্গে কথাবার্তা) যাহা আসল সত্য, তাহা বঙ্কিম বুঝিয়াও নির্দেশ করেন নাই। নন্দার যুক্তি এই—'দেবতার বেলা ছেলেখেলা চলে, মানুষের বেলা তাহা পাপ।' লোকাপবাদে রামচন্দ্র সীতাকে বর্জন করিতে পারেন, কিন্তু আমরা যে মানুষ, পরম ব্রহ্ম নই। আসলে উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মের প্রতি শত অনুরাগ সত্ত্বেও ইংরেজি-শিক্ষিত বঙ্কিম বুঝিয়াছেন সীতার মনুষ্যত্বের প্রতি রামচন্দ্র মনুষ্যোচিত শ্রদ্ধা দেখান নাই। রাম রাজোচিত কর্তব্যই পালন করিতে তৎপর। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত পুরুষ বঙ্কিম মানুষ হিসাবেই মানুষের মর্যাদা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেইজন্যই নভেলের 'চরিত্র' সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন; এই দেশে মানুষের সেই মানবীয় চেতনা, ব্যক্তিত্বের ধারণা জন্মাইতেও সাহায্য করিয়াছেন। পরোক্ষে এই সামাজিক প্রগতি সাধন করিলেও বঙ্কিম প্রত্যক্ষে পুরাতন ব্যবস্থাকে একেবারে পাল্টাইতে চাহেন নাই। তাই পরিষ্কার করিয়া রামচন্দ্রের আদর্শকে উড়াইয়া দিলেন না, পাশ কাটাইয়া গেলেন। এইভাবে বঙ্কিম রমার একটা পরীক্ষার অবকাশ করিয়া দিলেন এবং এই খণ্ডের একটি প্রধান নাটকীয়-দৃশ্য রচনার সুযোগ পাইলেন। (৩।৩)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে নন্দাই নায়িকা বটে, কিন্তু আসল নেতৃত্বভার বঙ্কিম আবার জয়ন্তীর উপরই সমর্পণ করিয়াছেন। জনতার মতামতের অস্থিরতা প্রদর্শনে স্বভাবতই বঙ্কিম সেক্স্পীয়রের অনুবর্তী। এই দৃশ্যে রমার যে শক্তির প্রকাশ

দেখা যায়, তাহা অসাধারণ, রমা-চরিত্রের তাহা স্বাভাবিক পরিণতি নহে। স্বভাবত রমা যে ভীতু, তাহা এই দৃশ্যেও নানা সূত্রে মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনা-চক্রে তাহার চারিত্রিক বিশুদ্ধি ও স্বভাবগত বিশ্বস্ততা এখানে এই অস্বাভাবিক সাহস ও দৃঢ়তার স্ফুরণ করিয়াছে। যে কয়েকটি অপূর্ব-বাণী বঙ্কিম এখানে তাঁহার মুখে দিয়াছেন, আমরা তাহাতে চমকিত না হইয়া পারি না। 'রাজার রাণীতে কখনো মিথ্যা বলে না।… ইত্যাদি' (প্যাঃ ১৬); 'মহারাজ! আপনার রাজ্য আছে—আমার রাজ্য এই শিশু ইত্যাদি' (প্যাঃ ২১)। অবশ্য রমার কলঙ্কমোচন হইল জয়ন্তীর মন্ত্রপূত (magnetised) ত্রিশূলের জোরে—শুধু আপন গুণেই নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা উপলক্ষে জয়ন্তী তাঁহার ধর্মমত ব্যাখ্যা করিলেন—'ধর্মের উদ্ধার জন্য ত্রিশূলাঘাতে অধর্মাচারীর প্রাণবিনাশেও দোষ বিবেচনা করি না।' বলা বাহুল্য, ইহাই গীতার ধর্ম, অহিংসার মূলতত্ত্ব। ইহা আনুষ্ঠানিক অহিংসাবাদ নয়, নিষ্কাম কর্ম অর্থ নিঃস্বার্থ মনে দুর্বৃত্ত-দমন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের কামনা ও রূপজ প্রেম অবস্থান্তরের ফলে বিপদের মুখে বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে এবং সমাজ-দ্রোহী ক্রূরতাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। মনো-বিশ্লেষণের মতে 'লভ্' ও 'হেট্' একই আবেগধারার দুই পিঠ। তাই গঙ্গারামের মত 'এখন রমার তেমন আন্তরিক শত্রু আর কেহ নহে'—ইহার অর্থ গঙ্গারাম আর রমার প্রতি আসক্ত নহে, এই কথাটি আপাত-দৃষ্টিতে মাত্র সত্য। 'আসক্তি' এখানে পীড়নেচ্ছায় পর্যবসিত হইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

'সে সীতারাম আর নাই'—(প্যাঃ ৩)—কিন্তু এত করিয়া বারবার বঙ্কিমের পক্ষে তাহা বলিবারই কি প্রয়োজন ছিল? দুর্ভাগ্যক্রমে এ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমের লিপিকুশলতারও তেমন পরিচয় নাই। সংস্কৃতবহুল ভাষায় সাধারণত বঙ্কিম যে রচনা-গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেন, এখানে তাহা সৃষ্টি হয় নাই—একটা ভাষার জড়তাই যেন রহিয়া গিয়াছে (প্যাঃ ৯)। মূঢ় সীতারাম মহিষী

খুঁজিতেছিল—দেবী লইয়া কি করিবে!' 'দেবী' হইয়া নারীর সাধ মেটে না, বঙ্কিম এই সত্য বা অর্দ্ধসত্য 'দেবী চৌধুরাণীতে' বলিতে চাহিয়াছেন; দেবী লইয়া পুরুষের সাধও মিটে না, এই সত্যই কি সীতারামের অন্যতম প্রতিপাদ্য? কিন্তু সীতারাম কি শুধু মহিষী চাহিতেছিলেন? তাহা হইলে নন্দা নিশ্চয়ই অনেকাংশে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারিত। না, তাহাও নয়; সীতারাম শ্রীকে না পাইয়া আরও শ্রীর জন্য উন্মাদ হইয়াছিলেন—তাহাতেই এই ট্র্যাজিডি আরও অনিবার্য ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদটি হৃদয়াবেগ-হীন। সীতারাম ও শ্রীর কথাবার্তায় উভয়ের মুখে বঙ্কিম যে যুক্তি জোগাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টিকারী অন্তর্দৃষ্টি দেখিতে পাই; কিন্তু আরও বেশি দেখিতে পাই—তাঁহার বুদ্ধিবাদী তত্ত্বসন্ধানী মনকে। শ্রীর ভালবাসার তত্ত্ব-ব্যাখ্যা, ধর্ম-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ('ঈশ্বর-প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম'; তবে যে কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়া।'), বিবাহতত্ত্বের ব্যাখ্যা ('কেবল ধর্মার্থেই বিবাহ'), প্রভৃতি সন্ন্যাসিনী শ্রীর মুখে বে-মানান নয়, বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব ও অনুশীলন-তত্ত্বের তাহা সার-সংগ্রহ; কিন্তু তথাপি বঙ্কিম জানেন—ইহার আক্ষরিক পালনে ধর্মও সংরক্ষিত হয় না, হিন্দুরাষ্ট্রই বরং ভাঙ্গিয়া যায় (প্রথম সংস্করণে বঙ্কিম তাই ইহাকে শ্রীর 'অকর্ম' বলিয়াছিলেন)। কিন্তু শ্রীও কি সেই 'ধর্মতত্ত্ব' সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছে? শেষ পর্যন্ত তাহারও ত ভরসা চিরকালের বাঙালী মেয়ের মত 'আমার নিকট বিষ আছে,—আবশ্যক হইলে খাইব।' সেই সীতারাম নাই; 'এ শ্রীও সীতারামের শ্রী নয়'—কিন্তু সে জয়ন্তীও নয়। সে যে সম্পূর্ণ নির্বিকারচিত্ত নয়, তাহার প্রমাণ ষোড়শ পরিচ্ছেদে জয়ন্তীর তিরস্কারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'আগুন তো জ্বলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল' (প্যাঃ ৪)—সেই বিবরণ প্রয়োজন, কিন্তু ঘর যে পুড়িবে তাহা এত করিয়াই বঙ্কিম বারে বারে বলিয়াছেন যে, এখন আর চমকিত হইবার কোনো কারণই দেখি না। একটি স্পষ্ট কথা তবু তিনি জানাইলেন—'শ্রী হইতে সীতারামের সর্বনাশ হইল।'

প্যারা ১। 'পাগল লিয়রের মত দর্পণ খুঁজিয়া বেড়ায়, দর্পণে নিঃশ্বাসের দাগ ধরে কি না।' বলা বাহুল্য সেক্‌স্‌পীয়রের অমর ট্র্যাজিডি কিং লিয়র-এর কথা ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তুলনীয়: King Lear—Act V, Scene III, lines 259-263. কর্ডেলিয়ার মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া পাগল লীয়ার বলিতেছেন—

She's gone for ever!
I know when one is dead and when one lives;
She's dead as earth. Lend me a looking glass;
If that her breath will mist or stain the stone,
Why, then she lives.

বঙ্কিম উপন্যাসের ট্র্যাজিক পরিণতির কথা বলিতে বলিতে নিঃসন্দেহে সেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজিডির নায়কদের ভাগ্য, চরিত্র ও পরিণামের কথা বারে বারে স্মরণ করিয়াছেন। বঙ্কিম বুঝিতে হইলে ইংরেজি সাহিত্য মনে রাখিতে হইবে। তাই সীতারামের সহিতও তুলনীয় কোনো কোনো দিকে 'ম্যাক্‌বেথ (যদুনাথ সরকারের ঐঃ ভূঃ—সাঃ পঃ সংস্করণ), কোনো কোনো দিকে 'এ্যাণ্টোনি এ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা,' আবার নিয়তিবাদের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার জন্য গ্রীক সফোক্লিসের ঈদিপাস-বিষয়ক ত্রি-নাট্য।

প্যারা ১। 'বাহিরের শ্রী যাই হোক ইত্যাদি'—'ভিতরের শ্রী' 'বাহিরের শ্রী' প্রভৃতি শব্দ-যোজনায় বঙ্কিম কথাটা তত পরিষ্কার করিয়া দেন নাই। আসল কথা—সীতারাম ভাবিতে পারেন না শ্রীর পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি মনে করেন পরিবর্তনটা বাহিরের, শ্রী অন্তরে-অন্তরে ('ভিতরের শ্রী') অপরিবর্তিতা—বাহিরের পরিবর্তনটা কিছুই নয়। কিন্তু বঙ্কিম বলিলেন—সীতারামও যেমন সেই সীতারাম নাই, শ্রীও সেই শ্রী নাই—অবস্থাবৈগুণ্যে উভয়েই পরিবর্তিত।

'মানুষ যে কতবার মরে, তাহা আমরা বুঝি না।...ইত্যাদি।'—মন্তব্যটি অতি যথার্থ। বঙ্কিমচন্দ্র, অন্ততঃ প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র 'মনুষ্য' চরিত্রকে একটা স্থাণু নিশ্চল বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না, এমন কি শুধুমাত্র প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার মধ্যেই বিধি-সঙ্গত চক্রে তাহা চলে, তাহাও স্বীকার করেন না। মানুষের এই পরিবর্তমান সত্তাই সত্তার স্বাধীনতা—ইহা না বুঝিলে কেহ উপন্যাস লিখিতে পারেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

গ্রীক নাটকের কোরাস্ 'আদর্শ দর্শক'। 'রামচাঁদ, শ্যামচাঁদ নামায় নিরীহ গৃহস্থ লোক' বঙ্কিমের 'আদর্শ গৃহস্থ'। তাহাদের মুখ দিয়াই বঙ্কিম সমকালীন জনসাধারণের মতামত, ভুল-ত্রুটি-জড়িত সহজ বিচার এখানে পেশ করিয়াছেন (৩।১৭)। কিন্তু এই গৃহস্থদ্বয় আসলে বঙ্কিমের সমকালীন নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থদেরও প্রতিভূ। তাই, 'আমাদের গৃহস্থঘরের কারই বা ছাড়া'— মোটামুটি এই কথাটি কি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের সাধারণ মর‍্যালিটির একটি ইঙ্গিত দান করে না?

দশম পরিচ্ছেদ

আগেকার সীতারাম নাই, তাহা জানি। তখন তাহার পুরী-উদ্ধারে, রাজ্যস্থাপনেও উৎসাহ ছিল না। এখন দেখি রাজ্যত্যাগেও তাহার উৎসাহ নাই। তাহার ভোগলালসা অত্যন্ত প্রবল।

একাদশ—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

একাদশ, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে একদিকে বঙ্কিমের কবিরাজদের লইয়া চাপা হাস্য, অন্যদিকে রমার শোকাবহ মৃত্যু, সীতারামের তেমনি শোচনীয় অধোগতি। কিন্তু ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে পৌঁছিয়া সীতারামের আত্মগ্লানি (guilt sense) কি বিকৃত রূপে অপরের উপর শোধ লইয়া আপনাকে তৃপ্ত করিতে চাহিল, তাহা যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বঙ্কিম বলিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে পাব্‌লিক এফেয়ার্স আবার বলিতে হইল—রাজ্য ভাসিতেছে, রাজ-চরিত্রের বিকৃতি দেখা যাইতেছে।

'টাকার অভাব' বলিয়া রাজ্যশাসনের গোড়ার কথা যে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, তাহা বঙ্কিম বলিয়াছেন। বঙ্কিমের যুগে তখনো 'মানি-ইকোনমি'র দিন এই দেশে সমাগত হয় নাই। তবে, সীতারামের রাজ্যক্ষয় কোনো সমাজ-বিপ্লবের সূচক নয়, উহা 'চুরি' অর্থাৎ কুশাসনেরই ফল; সেই কুশাসনেই টাকার অভাব,—তাঁহার রাজ্যনাশ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সীতারামের অধঃপতন ও হিন্দুরাজ্যনাশের জন্য শ্রী কতটা দায়ী, এই পরিচ্ছেদে (প্যাঃ ৩) বঙ্কিম তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। অপূর্ব ভাষায় বঙ্কিম সীতারামের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন দুইটি বাক্যে: "তা, যদি শ্রী সন্ন্যাসিনী হইয়া রহিল···অথচ সে সীতারামের স্ত্রী!" এখানে সীতারামের জন্য আমাদের চিত্তেও যে সমবেদনার সঞ্চার হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্কিম তাহাকে আরও গাঢ় হইবার সুযোগ দেন নাই। তাই সীতারামকে যতটা আমরা অপরাধী বলিয়া মনে করি, ততটা দুর্ভাগা বলিয়া মমতার দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। অবশ্য সবই নিয়তির খেলা বলিয়া শেষ পর্যন্ত সকলকে নিষ্কৃতি দিই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদে অবশেষে জয়ন্তীর আবির্ভাব। তাহাকে ছাড়া এই গ্রন্থ চলে না।

প্যারা ৫। কালিদাস-কৃত রঘুবংশকাব্যের উনবিংশ সর্গে ভোগবিলাস-মত্ত রঘুবংশীয় রাজা অগ্নিবর্ণের রাজকার্যে ঔদাসীন্য এবং পতনের বর্ণনা আছে। **'শত্রু রাজা লইয়া বার জন'**—বাকী এগার জন শত্রু কাহারা? 'একাদশ দ্বার' বলিয়া একটা কথা আছে। সেগুলি হইতেছে—নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, নাভি, শিশ্ন (যোনি), পায়ু ও ব্রহ্মরন্ধ্র। এখানে ছয় রিপু ও পঞ্চেন্দ্রিয় এই এগারটিকে লক্ষ্য করা হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ-শ্যামচাঁদ 'নিরীহ গৃহস্থ', কিন্তু বঙ্কিম জানেন এই নিরীহ গৃহস্থেরা তামাসা পাইলে তাহা দেখিতে ঝুঁকিয়া পড়ে—যতই তামাসাটা অন্যায় বা বিসদৃশ হউক। (তুলনীয়, রবীন্দ্রনাথের নাটকের 'জনতার' অনুরূপ ব্যবহার। সেক্‌সপীয়রের 'জনতা' অবশ্য আরও অস্থিরচিত্ত।)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রমার পরীক্ষার মত এই খণ্ডে জয়ন্তীর পরীক্ষার পরিচ্ছেদটি একটি প্রধান নাটকীয় দৃশ্য—কিন্তু ঘটনা ও চরিত্রের দিক হইতে এই দৃশ্যের সহিত

উহার কত পার্থক্য! তবে সেদিনের দৃশ্যে যদি রমা সমুত্তীর্ণা হইয়া থাকেন জয়ন্তীর সহায়তায়; আজ জয়ন্তী সমুত্তীর্ণা হইলেন রাজ্ঞী নন্দা ও পৌরস্ত্রীগণের সহায়তায়। এই দৃশ্য একদিক হইতে তাই জয়ন্তীর সন্ন্যাসিনী চরিত্রের সীমা-রেখা নির্দেশ করিয়া দিতেছে ('কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া…জয়ন্তীকেও অভিভূত করিল।' প্যাঃ ৯),—ইহার ফলে (৩।২০) জয়ন্তী-চরিত্রের আরও গভীরতর ও সুন্দরতর বিকাশ সম্ভব হইল। অন্য দিক হইতে নন্দা-চরিত্রের মর্যাদাময় শক্তিময় দিকটি এই পরিচ্ছেদ প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। প্রশ্ন এই—এই নন্দা যদি রাজমহিষী হইবার যোগ্যা নয়, তবে যোগ্যা কে? শ্রী? —সে সন্ন্যাসিনী হইয়াও না পারিয়াছে রাজাকে সংযত করিতে, না পারিয়াছে কাহাকেও রক্ষা করিতে।

একটি ছোট জিনিস লক্ষণীয়। চণ্ডাল বেত ফেলিয়া দিল; সীতারাম তখন দুষ্কর্মের জন্য পাইলেন—একজন মুসলমান কসাইকে। স্বভাবতই সন্ন্যাসিনীর সম্বন্ধে চণ্ডালের ভয় ভক্তি থাকিবার কথা, আর মুসলমান কসাই-এর তাহা না থাকাই সম্ভব।

জয়ন্তীর কথা ও প্রার্থনায় যথোচিত মর্যাদা ও মাধুর্য রক্ষা পাইয়াছে,—তাহা সত্য। কিন্তু 'লোকারণ্য' করিতেছিল কি? এমন মুহূর্তেও নিষ্ক্রিয় হইয়া ছিল? তামাসা দেখিতেছিল?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারামের দুর্দমনীয় বাসনা 'সর্বব্যাপক সর্বগ্রাসক' ক্রোধে পরিণত হইল। ভাগ্যক্রমে সংক্ষেপেই বঙ্কিম এই কদর্য অত্যাচারের কাহিনী শেষ করিয়াছেন। আর উহার উপর চাঁদশাহ্ ফকিরের মন্তব্যই উৎকৃষ্ট বিচার—হিন্দু বঙ্কিম এখানে শিল্পীর মত 'নাটকীয় সুবিচার' (dramatic justice) সাধন করিয়াছেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী চরিত্রের পূর্ণতম বিকাশ ও বঙ্কিমের আদর্শভূত সন্ন্যাসিনীর আদর্শ এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিম চিত্রিত করিয়াছেন। বঙ্কিমের বাক্-সংযমের গুণে ইহা তত্ত্ব-বহুল হইয়া রস নাশ করে নাই। এই পরিচ্ছেদের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই ভাব ও ভাষার মাধুর্য পাঠককে আকৃষ্ট করে। জয়ন্তীর মনোভাব—

তাহার পরীক্ষা তাহার বিপদ নয়, বরং 'পরম সম্পদ', পাপিষ্ঠ সীতারামের জন্য জয়ন্তীর আবদার ; 'পাপীর দণ্ডই এই যে দয়াময়কে ডাকিতে ভুলিয়া যায়',—এই বোধে সীতারামের উদ্ধারের জন্য নিজের চেষ্টা—আর শেষে শ্রীকে অনাসক্ত কর্মের উপদেশ—এই সব কয়টি ভাবই এখানে সুন্দর ও সংযতভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। স্মরণীয় এই যে, বঙ্কিমেরই মুখপাত্র এখানে জয়ন্তী।

'পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং' কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য হইতে গৃহীত। সমস্ত বাক্যটি এই—পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিনঃ॥ (৫।৪)—সুকুমার শিরীষ পুষ্প ভ্রমরের পদভর সহিতে পারে, পক্ষীর ভর সহে না। প্রসঙ্গ এই:—উমাকে তাঁহার মা মেনকা বলিতেছেন—"ঘরে বসিয়া দেবতা পূজা কর, বুঝি ; অরণ্যের তপশ্চর্যা তোমার সহিবে কেন?" এখানে অলঙ্কার উপমা নয়, দৃষ্টান্ত।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে ইহাই প্রধানতম অংশ—২৩শ পরিচ্ছেদের যুদ্ধদৃশ্য ঘটনা-বহুল হইলেও আসলে চরম ক্ষণ নয়। চরম ক্ষণ এই পরিচ্ছেদে—প্রথমত ভাগ্যহীনা বিলাসিনীদের যে অভিশাপ ভানুমতী উচ্চারণ করিল (প্যাঃ ৫), আসলে তাহাই মানুষের চক্ষে যথার্থ সুবিচার। হয়ত দুর্দিনে সীতারামের সহজেই মনে পড়িবার কথা—'ধর্ম আছে।' (প্যাঃ ৬)। কিন্তু ভানুমতীর এই অভিযোগ মনে রাখিলে আমরা কি সীতারামকে নিষ্কৃতি দিতে পারি? কিন্তু সীতারাম একটু একটু করিয়া তবু আমাদের মনে সমবেদনা আবার উদ্রেক করিলেন। কারণ, তাঁহার নিয়তিনিষ্পিষ্ট গাম্ভীর্য ও মর্যাদা এখন পুনরায় প্রকাশিত হইল ; উহার সহিত আসিয়া যুক্ত হইল মহিষী নন্দার আশ্চর্য মর্যাদাবোধ ('তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ? পাছে কেহ তোমায় কাপুরুষ বলে আমার সেই বড় ভাবনা!'), পুত্রকন্যার জন্য, সীতারামের জন্য মমতাবোধ। তাহাতে সীতারামের উপর আমাদের বিরাগ যেন বেদনায় পরিণত হইল। তৃতীয়ত,—যখন শ্রী সীতারামের নিকট আপনাকে নিবেদন করিল—সীতারাম এই চরম মুহূর্তে আবার স্বীকার করিলেন, 'তুমিই আমার মহিষী।' (প্যাঃ ১৮)। আর শেষে সীতারামের সত্যই 'অগতির গতি'কে মনে পড়িল। সকল ক্ষোভ মিটাইয়া যখন তারপর শ্রী ও জয়ন্তীর

কণ্ঠে গীতার প্রার্থনা উদ্‌গীত হয়,—তখন স্বীকার করি—একটা প্রকাণ্ড জীবন-নাট্য যথোচিত পরিসমাপ্তিতে পৌছিতেছে। ইহার পরে সীতারাম বাঁচিলেই বা কি, না বাঁচিলেই বা কি? 'তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল।'—হউক, আপত্তি নাই। তাঁহার জীবন একটা ট্র্যাজিক্ পরিণামে এখন পৌছিয়াছে—উহা আর শুধু ক্লেদ-পঙ্কিল ঘৃণার বস্তু নাই। উহা ভোগ-বাসনার ট্র্যাজিডি হইলেও কেবল তাহাই নহে।

দ্বাবিংশতিতম—ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের বর্ণনা—কিন্তু সমস্ত ঘটনা এত জমিয়া উঠিয়াছে যে, পাঠক তাহা ছাড়িতে পারেন না। অসম্ভব হইলেও বঙ্কিমের কোনো যুদ্ধবর্ণনাই কম চিত্তাকর্ষক নয়।

প্যারা ৭। ইহারই মধ্যে ছোট্ট একটি মন্তব্য: 'জয়ন্তী আর দর্প করে না' (প্যারা ৭)—জয়ন্তী চরিত্রের গভীরতার জ্ঞানের আভাস।

প্যারা ১১। গোলন্দাজের মৃত্যু, শ্রী ও জয়ন্তীর প্রয়াস—সার্থক বর্ণনা।

প্যারা ১২। 'এইরূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল।' এই বাক্যে এই অধ্যায় শেষ করিয়া বঙ্কিম উপন্যাসের পাব্‌লিক্ এফেয়ার্সের দিকটির গুরুত্ব আবার সম্মুখে তুলিয়া দিলেন। ইহার প্রয়োজন ছিল। কারণ বড় বেশি সীতারামের কথায় আমরা জড়াইয়া গিয়াছিলাম; উহার প্রেক্ষাপটে একটু দৃষ্টি না পড়িলে এখন সে কাহিনীও চোখে ঠিক ধরা পড়িত না।

চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এইবার উপন্যাসের আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন—শেষ পর্যন্ত সকলে দেখিল 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' অর্থ স্বামি-প্রাণঘাতিনী নয়, সহোদরের প্রাণঘাতিনী। "বিধিলিপি এতদিনে ফলিল।"—আর যে বিধিলিপি এড়াইবার জন্য এত চেষ্টা—আর সে চেষ্টায় এমন শোকাবহ ভয়ঙ্কর ধ্বংসকাণ্ড—তাহা এই চেষ্টাতেই অনিবার্য হইয়া উঠিল। পূর্বেই বলিয়াছি—সীতারাম পড়িয়া এ কালের পাঠক

বিধিলিপিকে অলংঘ্য মনে না করিয়া বরং মনে করিবে,—এই জাতকবিচারে সন্ন্যাসীদের দ্ব্যর্থবোধক কথাবার্তায় (তুলনীয়—গ্রীক দৈববাণী, 'ওরেকল' প্রভৃতির উক্তি) কাহারও কর্ণপাত না করিয়া পুরুষকারের সহিত আপন কর্তব্যপালনই সমুচিত।

নিশ্চয়ই জাতকপত্রে অবিশ্বাস বা নিয়তিতে অনাস্থা বঙ্কিমের ঈপ্সিত নয়। কিন্তু এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত শ্রীর মুখ দিয়া (অবশ্য বুঝা যায়—ইহাতে জয়ন্তীরও সায় আছে) তাঁহার জীবনে উপলব্ধ একটি বড় সত্য জানাইয়াছেন :—'সন্ন্যাসিনী হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে।' বঙ্কিম হিন্দু সমাজ ও হিন্দু রাষ্ট্রের কল্পনায়ও ইহা ভুলিতে পারেন নাই—আমরা ইহাতে আশ্বস্ত বোধ করি। এই মানদণ্ডের দ্বারাই শুধু সীতারাম-শ্রী নয়, জয়ন্তীও আমাদের বিচার্য।

'মানুষ' তাহার নিজ সমাজগত প্রয়াসের দ্বারা আরও কত সত্যকারের মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে—man will re-make himself. সে নিয়তি-চালিত নয়, বিধাতার দাসও নয়। যে বাস্তব অবস্থায় সে জন্মে, জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহা তাহার করায়ত্ত নয় বটে, কিন্তু আপন ব্যবস্থার দ্বারা সে সেই অবস্থারও পরিবর্তন সাধন করে, আংশিকভাবে নিজের জীবনযাত্রাকেও নিয়মিত করে—ইহাও মানবজীবনের একটি গভীর সত্য। তাত্ত্বিক বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে এ তত্ত্বের কোন আলোচনা বা উল্লেখ করেন নাই।

পরিশিষ্ট—১

আদর্শ গৃহস্থদ্বয়ের মারফৎ বঙ্কিম এইবার তাঁহার নিজের কৈফিয়ৎ পেশ করিয়াছেন :—ইতিহাসে সীতারামের পরিণাম সম্বন্ধে কি জানা যায়, আর তাহা বঙ্কিম কেন গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু আসল কৈফিয়ৎটা বঙ্কিম এইখানে চাপিয়া গিয়াছেন—গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, 'সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি।…গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক নহে।' আর এই 'পরিশিষ্টে'ও তিনি বর্তমান অংশের পরে প্রথম সংস্করণে তাহা আবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন : "এবং ফলদাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, পাঠকেরা সীতারামের দুষ্কর্ম্ম এবং শ্রীর অকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া জয়ন্তীর কর্ম্মানুকারী হউন।

এখন, যাও জয়ন্তী। প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুই জনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ কর।"

বলা বাহুল্য, ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এই অংশ বর্জন করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন—এ যেন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়া লেখা হইল "Q. E. D."। কিন্তু বঙ্কিমের মতাদর্শ বুঝিবার পক্ষে, বিশেষত সীতারাম ও রচনার উদ্দেশ্য বুঝিবার পক্ষে, যত্নশীল পাঠকের নিকট এই অংশটুকু প্রয়োজনীয়। মানবচরিত্রের মধ্য দিয়া সনাতন ধর্মের তত্ত্বটি প্রতিফলিত করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য—ইতিহাসের সত্য প্রতিফলিত করা নয়, নিছক রসসৃষ্টিও নয়।

পরিশিষ্ট—২

বর্তমান সংস্করণের প্রথম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদটি ছিল প্রথম সংস্করণের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। প্রথম সংস্করণে তাহার পূর্বে আর একটি পরিচ্ছেদ ছিল। তাহা এইরূপ ঃ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্যামপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর দর্শনে সস্ত্রীক হইয়া চলিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির নিকটস্থ এক জঙ্গলে ভূমিমধ্যে প্রোথিত ছিল। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে ভূমি খননপূর্ব্বক, তাহার পুনর্বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রাচীন দেবদেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। অদ্য প্রথম সীতারাম তদ্দর্শনে চলিলেন। সঙ্গে শিবিকারোহণে নন্দা ও রমা চলিলেন।

যে জঙ্গলের ভিতর মন্দির, তাহার সীমাদেশে উপস্থিত হইয়া তিন জনেই শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন, এবং এক জন মাত্র পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া তিন জনে জঙ্গলমধ্যে পদব্রজে প্রবেশ করিলেন। কাননের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। অতিশয় শ্যামলোজ্জ্বল পত্র-রাশিমধ্যে স্তবকে স্তবকে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। শ্বেত হরিৎ কপিল পিঙ্গল রক্তনীল প্রভৃতি নানা বর্ণের ফুল স্তরে স্তরে ফুটিয়া গন্ধে চারি দিক্ আমোদিত করিতেছে। তন্মধ্যে নানা বর্ণের পাখী সকল বসিয়া নানা স্বরে কূজন করিতেছে। পথ অতি সঙ্কীর্ণ। গাছের ডালপালা ঠেলিতে হয়, কখন কাঁটায় নন্দা রমার আঁচল বাঁধিয়া যায়, কখন ফুলের গোছা

তাহাদিগের মুখে ঠেকে, কখন ডাল নাড়া পেয়ে ভোমরা ডাল ছেড়ে তাদের মুখের কাছে উড়িয়া বেড়ায়, কখন তাহাদের মলের শব্দে ত্রস্তা হইয়া চকিতা হরিণী শয়ন ত্যাগ করিয়া বেগে পলায়ন করে। পাতা খসিয়া পড়ে, ফুল ঝরিয়া যায়, পাখী উড়িয়া যায়, খরা দৌড়িয়া যায়। যথাকালে তাঁহারা মন্দিরসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা পথপ্রদর্শককে বিদায় দিলেন।

দেখিলেন, মন্দির ভূগর্ভস্থ, বাহির হইতে কেবল চূড়া দেখা যায়। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিবার সোপান প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং অন্ধকার নিবারণের জন্য দীপ জ্বলিতেছিল। তাহাও সীতারামের আজ্ঞাক্রমে হইয়াছিল। কিন্তু সীতারামের আজ্ঞাক্রমে সেখানে ভৃত্যবর্গ কেহই ছিল না; কেন না, তিনি নির্জ্জনে ভার্য্যাদ্বয়সমভিব্যাহারে দেব দর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

সোপান সাহায্যে তাঁহারা তিন জনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দেবমূর্ত্তিসমীপে এক জন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাবা তুমি?"

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির।"

সীতারাম। মুসলমান?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ! সর্ব্বনাশ!

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান!

ফকির। দোষ কি বাবা! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল?

সীতা। হইল বৈ কি। তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা!

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর, তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন!

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইঁহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন? এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন?

ফকির। বাবা! ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উঁহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

একটি স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র একটা উত্তর দিতে পারিত—কিন্তু সীতারাম স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন, "এইরূপ আমাদের দেশাচার।"

ফকির বলিল, "বাবা! শুনিতে পাই, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই এক জনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান; উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারখারে যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমান রাজ্য যাইবে; তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও

আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্তরে যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময়ে আবার আসিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।

সীতা। দেখিতেছি, আপনি বিজ্ঞ। অবশ্য আসিবেন।

ফকির তখন চলিয়া গেল। সীতারামের দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে, সে আবার ফিরিয়া আসিল। সীতারাম তাহার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। সীতারাম দেখিলেন, সে ব্যক্তি জ্ঞানী। ফারসী আরবী উত্তম জানে, তাহার উপর সংস্কৃতও উত্তম জানে, এবং হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও পড়িয়াছে। দেখিলেন যে, যদিও তাহার বয়স এমন বেশী নয়, তথাপি সংসারে সে মমতাশূন্য বৈরাগী এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া নন্দা রমাও লজ্জা ত্যাগ করিয়া, একটু দূরে বসিয়া তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা সকল শুনিতে লাগিলেন।

বিদায়কালে সীতারাম বলিলেন, "আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা অতি ন্যায্য। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আমি এ উপদেশের বিপরীতাচরণ করিলে, আপনি নিকটে থাকিলে আমাকে সে সকল কথা আবার মনে করিয়া দিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকট থাকিলে, আমার রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।"

ফকির। তুমি একটি কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে, আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে?

সীতা। শ্যামপুর নাম আছে—সেই নামই থাকিবে।

ফকির। যদি উহার মহম্মদপুর নাম দিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হই।

সীতা। এ নাম কেন?

ফকির। তাহা হইলে আমি খাতির জমা থাকিব যে, তুমি হিন্দু মুসলমানে সমান দেখিবে।

সীতারাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ফকির তখন বলিল, "আমি ফকির, কোন গৃহে বাস করিব না। কিন্তু তোমার

নিকটেই থাকিব। যখন যেখানে থাকি, তোমাকে জানাইব। তুমি খুঁজিলেই আমাকে পাইবে।"

গমনকালে ফকির তিন জনকে আশীর্ব্বাদ করিল। সীতারামকে বলিল, "তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হউক।" নন্দাকে বলিল, "তুমি মহিষীর উপযুক্ত; মহিষীর ধর্ম্ম পালন করিও। তোমাদের হিন্দু শাস্ত্রে স্বামীর প্রতি যেরূপ আচরণ করার হুকুম আছে, সেইরূপ করিও—তাহাতেই মঙ্গল হইবে।" রমাকে ফকির বলিল, "মা, তোমাকে কিছু ভীরু-স্বভাব বলিয়া বোধ হইতেছে। ফকিরের কথা মনে রাখিও; কোন বিপদে পড়িলে ভয় করিও না। ভয়ে বড় অমঙ্গল ঘটে; রাজার মহিষীকে ভয় করিতে নাই।"

তারপর তিন জনে গৃহে গমন করিলেন।